মরনজয়ী

নসীম হিজাযী

মরণজয়ী

নসীম হিজাযী

অনুবাদ

সৈয়দ আবদুল মান্নান

BCBS

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সো সাইটি লিঃ

ঢাকা—চট্টগ্রাম

ইসলামী বিধান কায়েম করার সংগ্রামে
'জান্-কবুল মুজাহিদীনের উদ্দেশ্যে—

আর যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত, যদিও তোমরা তা অনুভব করো না।

আল্-কুরআন ঃ সুরা-২ ঃ ১৫৪

সূর্য কতোবার পূর্ব দিকে উদিত হয়ে পশ্চিম দিগন্তে অস্ত গিয়েছে। চাঁদ তার মাসিক সফর শেষ করেছে হাজারো বার। সিতারার দল লাখো বার রাতের অন্ধকারে দীপ্তি ছড়িয়ে ভোরের আলোয় আত্মগোপন করেছে। মানব-বাগিচায় বারংবার এসেছে বসন্ত, আবার এসেছে শরৎ। জান্নাত থেকে নির্বাসিত মানবতার নতুন বাসভূমি হয়েছে এমন এক সংগ্রামক্ষেত্র, যেখানে প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান রয়েছে অবিরাম সংগ্রামে লিপ্ত। দুনিয়ায় এসেছে বিপ্লবের বিভিন্ন রূপ। তাহ্যিব ও তমদ্দুনের হয়েছে নব রূপায়ন। হাজার হাজার কওম অধোগতির নিম্নতম স্তর থেকে উঠে এসে ঝড় ও ঘূর্ণিবায়ুর মতো ছড়িয়ে পড়েছে সারা দুনিয়ার বুকে, কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে উত্থান-পতনের সম্পর্ক এমনি মযবুত যে, তারা কেউ এখানে চিরস্থায়ী হয়ে থাকেনি। যে সব কওম তলোয়ারের ছায়ায় বিজয়-ডংকা বাজিয়ে জেগে উঠেছিলো, তারাই আবার বাদ্য গীতের সুর মূর্ছনায় বিভোর হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। উপরে নীল আসমানকে প্রশ্ন করঃ তার অন্তহীন বিস্তৃত বুকের উপর আঁকা রয়েছে অতীতের কতো যুগযুগান্তরের হাজারো কাহিনী; কতো কওমের উত্থান-পতন সে দেখেছে; সে দেখেছে কতো শক্তিমান বাদ্শাহকে তাজ ও তখ্ত হারিয়ে ফকীরের লেবাস পরতে, দেখেছে কতো ফকীরকে শাহী তাজ পরিধান করতে। হয়তো বারংবার একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি দেখে সে হয়ে আছে নির্বিকার-উদাসীন। কিন্তু আমরা নিশ্চিত বলতে পারি, আরবের মরুচারী যাযাবরদের উত্থান ও পতনের দীর্ঘ কাহিনী আজো তার মনে পড়ে। সে কাহিনী আজকের এ যুগ থেকে কতো স্বতন্ত্র! যদিও কাহিনীর কোনো অংশই কম চিত্তাকর্ষক নয়, তথাপি আমাদের সামনে রয়েছে আজ তার এমন এক উজ্জ্বল অধ্যায়, যখন পূর্ব-পশ্চিমের উপত্যকাভূমি, পাহাড় ও মরু-প্রান্তর মুসলমানদের বিজয় অশ্বের পদধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠেছে, তাদের প্রস্তর বিদীর্ণকারী তলোয়ারের সামনে ইরান ও রুমের সুলতানের মস্তক হয়েছে অবনমিত। এ ছিলো সেই যুগ, যখন তুর্কীস্থান, আন্দালুস ও হিন্দুস্থান মুসলমানদের আহ্বান জানিয়েছে তাদের বিজয়-শক্তির পরীক্ষার জন্য।

বসরার প্রায় বিশ মাইল দূরে একটি উর্বর সবুজে ঢাকা বাগিচার মাঝখানে একটি ছোট্ট বস্তি। তারই একটি সাদাসিধা বাড়ির আঙ্গিনায় একটি মধ্য বয়স্কা নারী সাবেরা আসরের নামায পড়ছেন। আর একদিকে তিনটি বালক-বালিকা খেলাধুলায় ব্যস্ত। দু'টি বালক আর একটি বালিকা। বালক দু'টির হাতে ছোট্ট ছোট্ট কাঠের ছড়ি। বালিকা নিবিষ্ট মনে দেখছে তাদের কার্যকলাপ। বড় ছেলেটি ছড়ি ঘুরিয়ে ছোট ছেলেটিকে বলছে, 'দেখো নয়ীম, আমার তলোয়ার!'

ছোট ছেলেটি তার ছড়ি দেখিয়ে বললো, 'আমারো আছে তলোয়ার। এসো, আমরা লড়াই করি।'

'না, তুমি কেঁদে ফেলবে।' বড় ছেলেটি বললো।

'না, তুমিই কেঁদে ফেলবে।' ছোটটি জওয়াব দিলো।

'তাহলে এসো।' বড়টি বুক ফুলিয়ে বললো।

নিষ্পাপ বালকেরা একে অপরের উপর হামলা শুরু করলো। মেয়েটি পেরেশান হয়ে তামাশা দেখতে লাগলো। মেয়েটির নাম উযরা, ছোট ছেলেটির নাম নয়ীম আর বড়টি আবদুল্লাহ্। আব্দুল্লাহ্ নয়ীম থেকে তিন বছরের বড়। তার ঠোঁটের উপর লেগে আছে এক টুকরা মিষ্টি হাসি, কিন্তু নয়ীমের মুখ দেখে মনে হয়, যেনো সে সত্যি সত্যি লড়াইয়ের ময়দানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। নয়ীম হামলা করছে, আর আব্দুল্লাহ ধীরভাবে প্রতিরোধ করছে। আচানক নয়ীমের ছড়ি তার বাযুতে লেগে গেলো। আব্দুল্লাহ্ এবার রাগ করে হামলা করলো। এবার নয়ীমের কব্জীতে চোট লাগলো, আর তার হাতের ছড়িটা ছিটকে পড়ে গেলো।

আব্দুল্লাহ্ বললো, 'দেখো, এবার কেঁদে ফেলো না।'

'আমি না, তুমি কেঁদে ফেলবে।'

নয়ীম রাগে লাল হয়ে তার কথার জওয়াব দিয়ে যমিন থেকে একটা ঢিল তুলে নিয়ে মারলো আব্দুল্লাহ্‌র মাথায়। তারপর নিজের ছড়িটা হাতে তুলে নিয়ে ছুটলো ঘরের দিকে। আব্দুল্লাহ্ মাথায় হাত দিয়ে ছুটলো তার পিছু পিছু। কিন্তু এরই মধ্যে নয়ীম গিয়ে সাবেরার কোলের মধ্যে লুকোবার চেষ্টা করছে।

'আম্মি! ভাই আমায় মারছে।' নয়ীম বললো।

আব্দুল্লাহ রাগে ঠোঁট কামড়াচ্ছিলো, কিন্তু মাকে দেখে সে চুপ করে গেলো।

মা প্রশ্ন করলেন, 'আব্দুল্লাহ, ব্যাপার কি! বলো তো!'

সে জওয়াবে বললো, 'মা! ও আমায় পাথর মেরেছে।'

'কেন লড়াই করছিলে বেটা!' নয়ীমের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে সাবেরা বললেন।

'আমরা তলোয়ার নিয়ে লড়াই করছিলাম। ভাই আমার হাতে ঘা দিয়েছে আর আমি তার বদলা নিয়েছি।'

'তলোয়ার কোথায় পেলে তুমি?'

'এই দেখুন আম্মি!' নয়ীম তার ছড়িটি দেখিয়ে বললেন, এটা কাঠের তৈরি, কিন্তু আমার একটা লোহার তলোয়ার চাই। এনে দেবেন? আমি জিহাদে যাবো।'

বাচ্চা ছেলের মুখে জিহাদের কথা শোনার খুশী সেই মায়েরাই জানতো, যারা তাদের জিগরের টুকরাকে ঘুমপাড়ানি গান শুনিয়ে বলতোঃ

ওগো কাবার প্রভু, যাদু আমার-বাছা আমার
হোক বীর মুজাহিদ,
মানবতার বাগিচায় তোমার বন্ধুর লাগানো তরুমূলে
সিঞ্চন করুক যৌবনের রক্তধারা।'

নয়ীমের মুখে তলোয়ার ও জিহাদের কথা শুনে সাবেরার মুখ খুশীর দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তাঁর দেহে মনে জাগলো অপূর্ব আনন্দ-শিহরণ। আনন্দের আবেশে তার চোখ বন্ধ হয়ে এলো। অতীত ও বর্তমান মুছে গেলো তাঁর চোখের সামনে থেকে। কল্পনায় তিনি তার নওজোয়ান বেটাকে দেখতে লাগলেন মুজাহিদবেশে খুবসুরত ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে লড়াইয়ের ময়দানে। তাঁর প্রিয় পুত্র দুশমনের সারি ভেদ করে

এগিয়ে যাচ্ছে বীর পদভারে। দুশমনের ঘোড়া আর হাতী তার নির্ভীক হামলার সামনে দাঁড়াতে না পেরে আগে আগে সরে যাচ্ছে। তাঁর নওজোয়ান বেটা তাদের অনুসরণ করে ঘোড়া নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে গর্জন মুখর দরিয়ার বুকে। বারবার সে এসে যাচ্ছে দুশমনের নাগালের ভিতরে। তারপর শেষ পর্যন্ত আঘাতে আঘাতে ক্লান্ত হয়ে কলেমায়ে শাহাদৎ পড়ে নির্বাক হয়ে যাচ্ছে। তাঁর চোখে ভাসছে, যেনো জান্নাতের হুরদল শারাবন তহুরার জাম হাতে দাঁড়িয়ে আছে তার প্রতীক্ষায়। সাবেরা 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেউন' পড়ে সিজদায় মাথা নত করে দো'আ করলেনঃ

'ওগো যমিন-আসমানের মালিক! মুজাহিদের মায়েরা যখন হাযির হবেন তোমার দরবারে, তখন আমি যেনো কারুর পেছনে না থাকি। এই বাচ্চাদেরকে তুমি এমন যোগ্যতা দান করো, যেনো তারা পূর্বপুরুষদের গৌরবময় ঐতিহ্য কায়েম রাখতে পারে।'

দো'আ শেষ করে সাবেরা উঠে দুই পুত্রকে কোলে টেনে নিলেন।

মানবজীবনে এমন হাজারো ঘটনা ঘটে, যা বুদ্ধির সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র ছাড়িয়ে দীলের রাজ্যের অন্তহীন প্রসারের সাথে সম্পর্ক খুঁজে বেড়ায়। দুনিয়ার যে কোনো ঘটনাকে যদি আমরা বুদ্ধির কষ্টিপাথরে যাচাই করি, তাহলে কতো মামুলী ঘটনাও আমাদের কাছে রহস্যময় হয়ে দেখা দেয়। অনুভূতি ও আবেগকে আমরা বুঝতে চেষ্টা করি নিজস্ব অনুভূতি ও আবেগ দিয়ে। তাই তাদের যেসব কার্যকলাপ আমাদের মানসিক আবেগ থেকে উচ্চ পর্যায়ের মনে হয়, তা আমাদের চোখে বিসদৃশ লাগে। আজকালকার মায়েদের কাছে প্রাচীন যুগের বাহাদুর মায়ের আশা-আকাংখা কতো বিস্ময়কর প্রতীয়মান হয়। আপনার জিগরের টুকরাকে আগুন ও খুনের ভিতরে খেলতে দেখার আকাংখা তাদের চোখে কত ভয়ানক। আপন বাচ্চাকে বিড়ালের ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়ায় যে মায়েরা, সিংহের মোকাবিলা করবার স্বপ্ন তারা কি করে দেখবে।'

আমাদের কলেজ, হোটেল আর কফিখানার পরিবেশে পালিত হয় যে সব নওজোয়ান, তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি কি করে জানবে পাহাড়ের উচ্চতা ও সমুদ্রের গভীরতা লংঘনকারী মুজাহিদদের দীলের রহস্য? বরাবের সুর-মূর্ছনার সাথে সাথে ঝিমিয়ে পড়ে যেসব নাযুক মেযাজ মানুষ, তীর ও নেযার মোকাবিলায় এগিয়ে যাওয়া জোয়ানদের কাহিনী তাদের কাছে কতো বিস্ময়কর! নীড়ের আশেপাশে উড়ে বেড়ায় যেসব পাখী, কি করে পরিচিত হবে তারা আকাশচারী ঈগলের উড়ে বেড়ানোর সাথে!

সাবেরার শৈশব যৌবনের যিন্দেগী কেটেছে এক অতি সাধারণ পরিবেশের ভিতর দিয়ে। তাঁর শিরায় শিরায় বয়ে চলেছে আরবের সেই শাহসওয়ারদের খুন, যাঁরা কুফর ও ইসলামের গোড়ার দিকের লড়াইয়ে দেখিয়েছেন তাঁদের তলোয়ারের শক্তি। তাঁর দাদা ইয়ারমুকের লড়াই থেকে এসেছিলেন গাজী হয়ে, তারপর শহীদ হয়েছিলেন কাদ্‌সিয়ার ময়দানে। ছোটবেলা থেকেই গাজী ও শহীদ শব্দগুলো তাঁর কাছে পরিচিত।

আধো আধো বুলি দিয়ে তিনি যখন হরফ উচ্চারণ করবার চেষ্টা করতেন, তখন তাঁর মা তাঁকে প্রথমে শিখিয়েছেন 'আব্বা গাজী', তারপর আরো কিছুকাল পরে শিখিয়েছেন 'আব্বা শহীদ'। এমনি এক পরিবেশে প্রতিপালিত হয়েছিলেন বলেই যৌবনে ও বার্ধক্যে তাঁর কাছ থেকে আশা করা যেতো এক কর্তব্যনিষ্ঠ মুসলিম নারীর গুণরাজি। ছোট বেলায় তিনি শুনেছেন কতো আরব নারীর শৌর্যের কাহিনী। বিশ বছর বয়সে তাঁর শাদী হয়েছিলো আব্দুর রহমানের সাথে। নওজোয়ান স্বামী ছিলেন মুজাহিদের যাবতীয় গুণে গুণান্বিত। বিশ্বস্ত বিবির মুহব্বত তাঁকে ঘরের চার দেওয়ালের ভিতর বেঁধে রাখেনি, হামেশা তাঁকে দিয়েছে জিহাদের অনুপ্রেরণা।

আব্দুর রহমান যখন শেষ বারের মতো জিহাদের ময়দানে রওয়ানা হলেন, আব্দুল্লাহ তখন তিন বছরের শিশু, আর নয়ীমের বয়স তিন মাসেরও কম। আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহকে তুলে বুকে চেপে ধরলেন, তারপর নয়ীমকে সাবেরার কোল থেকে নিয়ে আদর করলেন। মুখের উপর নিষণ্ণতার ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠছিলো। কিন্তু তখখুনি তিনি হাসি টেনে আনবার চেষ্টা করলেন। জীবনসাথীকে লড়াইয়ের ময়দানে যেতে দেখে খানিকক্ষণের জন্য সাবেরার দীলের মধ্যে ঝড় বইতে লাগলো, কিন্তু কষ্টে তিনি চোখের কোনে উছলে-ওঠা অশ্রুধারা সংযত করে রাখলেন।

আব্দুর রহমান বলে উঠলেন, 'সাবেরা! আমার কাছে ওয়াদা করো, যদি আমি লড়াইয়ের ময়দান থেকে ফিরে না আসি, তাহলে যেনো আমার পুত্রেরা আমার তলোয়ারে জং ধরতে না দেয়।'

'আপনি আশ্বস্ত হোন।' সাবেরা জওয়াবে বললেন, 'বাচ্চারা আমার কারুর পেছনে পড়ে থাকবে না।'

'খোদা হাফিজ' বলে আব্দুর রহমান ঘোড়ার রেকাবে পা রাখলেন। তাঁর বিদায়ের পর সাবেরা সিজদায় মাথা রেখে দো'আ করলেন, 'ওগো যমিন-আসমানের মালিক! ওঁর কদম মযবুত রেখো।'

স্বামী-স্ত্রী যখন চেহারা ও চালচলনে একে একে অপরের কাছে আকর্ষণের পাত্র হয়ে ওঠে, তখন তাদের মধ্যে মুহব্বতের আবেগপূর্ণ সীমায় পৌছা কিছু অস্বাভাবিক নয়। সাবেরা ও আব্দুর রহমানের সম্পর্ক ছিলো বেশক দেহ ও মনের সম্পর্কের মতো। বিদায়-বেলায় তাদের সুকোমল স্পর্শকাতর অন্তরের আবেগ সংবরণ করে রাখা কিছুটা বিস্ময়কর মনে হয়। কিন্তু কোন্ আযীমুশান মকসাদ হাসিল করবার জন্য এইসব লোক দুনিয়ার সকল লোভলালসাকে, সকল-আশা আকাংখাকে কোরবান করতেন? কোন্ সে মকসাদ তিনশ তের জন সিপাহীর একটি মুষ্টিমেয় দলকে টেনে আনতো হাজার সিপাহীর মোকাবিলা করতে? কোন্ সে আবেগ মুজাহিদ দলের অন্তরে দরিয়া ও সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বার, উত্তপ্ত অনন্তপ্রসার মরু অতিক্রম করবার আর আকাশচুম্বী পর্বতচূড়ায় পদচিহ্ন এঁকে যাবার শক্তির সঞ্চার করেছিলো?

এক মুজাহিদই দিতে পারে এসব প্রশ্নের জওয়াব।

আব্দুর রহমানের বিদায়ের পর সাত মাস চলে গেছে। একই বস্তির আরো চারজন লোক ছিলো তাঁর সাথী। একদিন আব্দুর রহমানের এক সাথী ফিরে এলো এবং উট থেকে নেমে সাবেরার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলো। তাকে দেখে বহুলোক তার আশেপাশে জমা হলো। কেউ কেউ জিগ্‌গেস করলো আব্দুর রহমানের কথা, কিন্তু সে কোন জওয়াব না দিয়ে সোজা গিয়ে ঢুকলো সাবেরার বাড়ির ভিতরে।

সাবেরা নামাযের জন্য ওযু করছিলেন। তাকে দেখে তিনি উঠে এলেন। লোকটি এগিয়ে এসে কয়েক কদম দূরে দাঁড়িয়ে গেলো।

সাবেরা তাঁর দীলের কম্পন সংযত করে প্রশ্ন করলেন, 'উনি আসেননি?'

'উনি শহীদ হয়ে গেছেন।'

'শহীদ'! সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে সাবেরার আঁখিকোণ থেকে গড়িয়ে পড়লো কয়েক ফোটা অশ্রু।

লোকটি বললো, 'শেষ মুহূর্তে যখন তিনি যখমে কাতর, তখন নিজের রক্ত দিয়ে তিনি এ চিঠিখানা লিখে আমার হাতে দিয়েছিলেন।'

সাবেরা স্বামীর শেষ চিঠিখানা খুলে পড়লেনঃ 'সাবেরা, আমার আয়ু পুরো হয়েছে। এই মুহূর্তে আমি যিন্দেগীর শেষ শ্বাস গ্রহণ করছি। আমার কানে এসে লাগছে এক অপূর্ব সুর-ঝংকার। আমার রূহ দেহের কয়েদখানা থেকে আযাদ হয়ে সেই সুরের গভীরতায় হারিয়ে যাবার জন্য অধীর হয়ে উঠেছে। যখমে ক্লান্ত হয়ে আমি এক অপূর্ব শান্তির স্পর্শ অনুভব করছি। আমার রূহ এক চিরন্তন আনন্দের সমুদ্রে সঞ্চরমাণ। এখানকার আবাস ছেড়ে আমি এমন এক দুনিয়ায় চলে যাচ্ছি, যার প্রতি কণিকা এ দুনিয়ার তামাম রঙের ছটা আপনার কোলে টেনে নিয়েছে।

আমার মৃত্যুতে অশ্রুপাত করো না। আমার লক্ষ্যবস্তু আমি অর্জন করেছি। আমি তোমার কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছি, মনে করো না। স্থায়ী সৌভাগ্যের এক কেন্দ্রভূমিতে এসে আবার মিলিত হবো। সেখানে সকাল-সন্ধ্যা নেই, সেখানে বসন্ত ও শরতের তারতম্য নেই। যদিও সে দেশ চাঁদ সিতারার বহু উর্ধে তথাপি মরদে মুজাহিদ সেখানে খুঁজে পায় তার শান্তির নীড়। আব্দুল্লাহ ও নয়ীমকে সেই গন্তব্য দেশের পথের সন্ধান দেওয়া তোমার ফরয। আমি তোমায় অনেক কিছুই লিখতাম, কিন্তু আমার রূহ দেহের কয়েদখানা থেকে আযাদ হবার জন্য বেকারার। প্রভুর পদপ্রান্তে পৌছবার জন্য অন্তর আমার অধীর। আমি তোমায় আমার তলোয়ার পাঠিয়ে দিচ্ছি। বাচ্চাদের এর কদর ও কীমৎ বুঝিয়ে দিও। আমার কাছে তুমি যেমন ছিলে এক কর্তব্যনিষ্ঠ স্ত্রী, আমার বাচ্চাদের কাছে তুমি হবে তেমনি কর্তব্যনিষ্ঠ মা। মাতৃস্নেহ যেনো তোমার উচ্চাকাংখার পথে প্রতিবন্ধক না হয়। তাদেরকে বলবে মুজাহিদের মৃত্যুর সামনে দুনিয়ার যিন্দেগী অবাস্তব-অর্থহীন।'

তোমার স্বামী।'

দুই

আব্দুর রহমান শহীদ হবার পর তিন বছর কেটে গেছে। একদিন সাবেরা তাঁর ঘরের সামনে আঙিনায় এক খেজুর গাছের তলায় বসে আব্দুল্লাহকে সবক পড়াচ্ছিলেন। নয়ীম একটা কাঠের ঘোড়া তৈরী করে তাকে ছড়ি নিয়ে এদিক ওদিক তাগিয়ে বেড়াচ্ছিলো। হঠাৎ বাইরে থেকে কে যেন ঘা মারলো তাদের দরযায়। আব্দুল্লাহ জলদী উঠে দরযা খুলে মামুজান বলে আগন্তুকের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

কে? সাঈদ? সাবেরা ভিতর থেকে আওয়ায দিলেন।

সাঈদ একটি ছোট বালিকার হাত ধরে আঙিনায় প্রবেশ করলেন। সাবেরা ছোট ভাইকে সাদর আহ্বান জানিয়ে মেয়েটিকে আদর করে প্রশ্ন করলেন, এ উযরা তো নয়! এর চেহারা সুরত তো বিলকুল ইয়াসমিনেরই মতো।

হাঁ বোন, এ উযরা। আমি ওকে আপনার কাছে রেখে যেতে এসেছি। আমার ফারেস যাবার হুকুম হয়েছে। সেখানে খারেজীরা বিদ্রোহ ছড়াবার চেষ্টা করছে। আমি সেখানে পৌছে যেতে চাই খুব শিগগীর। আগে ভেবেছিলাম, উযরাকে আর কারুর সাথে পাঠিয়ে দেবো আপনার কাছে, পরে নিজেই এখান হয়ে যাওয়া ভালো মনে করলাম।

এখান থেকে কখন রওয়ানা হবার ইরাদা করেছো? সাবেরা প্রশ্ন করলেন।

আজ চলে গেলেই ভালো হয়। আজ আমাদের ফউজ বসরায় থাকবে, কাল ভোরে আমরা ওখান থেকে ফারেসের পথে রওয়ানা হবো।

আব্দুল্লাহ মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে কথা শুনছিলো। নয়ীম এতক্ষণ কাঠের ঘোড়া নিয়ে খেলছিলো, এবার সেও এসে দাঁড়ালো আব্দুল্লাহর পাশে। সাঈদ নয়ীমকে টেনে নিলেন কোলের মধ্যে। তাকে আদর করে আবার তিনি বোনের সাথে আলাপ করতে লাগলেন। নয়ীম আবার খেলাধুলায় ব্যস্ত হলো, কিন্তু খানিকক্ষণ পর কিছু চিন্তা করে সে আব্দুল্লাহর কাছে এলো এবং উযরার দিকে ভালো করে তাকাতে লাগলো। কি যেনো বলতে চাচ্ছিলো সে, কিন্তু লজ্জা তাকে বাধা দিচ্ছিলো। খানিক্ষণ পর সে সাহস করে উযরাকে বললো, তুমিও ঘোড়া নেবে?

উযরা শরমে সাঈদের পেছনে লুকালো।

'যাও বেটী!' সাঈদ উযরার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, তোমার ভাই-এর সাথে খেলো।

উযরা লাজুক মুখ নিয়ে এগিয়ে গিয়ে নয়ীমের হাত থেকে একটা ছড়ি নিয়ে নিলো। তারা দু'জনে আঙিনার অপর পাশে গিয়ে নিজ নিজ কাঠের ঘোড়ায় সওয়ার হলো। তাদের মধ্যে ভাব জমতে দেরী হলো না।

নয়ীমের কার্যকলাপে আব্দুল্লাহ খুশী হতে পারছিলো না। সে বার বার তার দিকে তাকিয়ে দেখছিলো। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে নয়ীম তার নতুন সাথীর সাথে এতটা ভাব জমিয়ে ফেলেছে যে, আব্দুল্লাহ তাদের দিকে তাকিয়ে আবার অপর দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো। আব্দুল্লাহ যখন তাকে মুখ ভ্যাংচাতে লাগলো তখন সে আর বরদাশত করতে পারলো না।

দেখুন আম্মিজান, আব্দুল্লাহ আমায় মুখ ভ্যাংচাচ্ছে।

মা বললেন, আব্দুল্লাহ ওকে খেলতে দাও।

আব্দুল্লাহ গম্ভীর হয়ে গেলে নয়ীম এবার তাকে মুখ ভ্যাংচাতে শুরু করলো। বিরক্ত হয়ে আব্দুল্লাহ মুখ ফিরিয়ে নিলো অপর দিকে।

উযরার কাহিনী সাবেরার কাহিনী থেকে কিছু আলাদা নয়। দুনিয়ায় এসে কিছু বুঝবার মতো বয়স হবার আগেই সে হারিয়ে ফেলেছে পিতা মাতার স্নেহের ছায়া।

উযরার বাপ ছিলেন ফুস্‌তাতের বিশিষ্ট লোকদের একজন। বিশ বছর বয়সে ইরানী মেয়ে ইয়াসমিনের সাথে হলো তাঁর শাদী।

ইয়াসমিনের শাদীর পর প্রথম রাত্রি। প্রিয়তম স্বামীর কোলের কাছে থেকে সে গড়ে তুলছিলো নতুন আশা-আকাংখার নয়া দুনিয়া, কামরার মধ্যে জ্বলছিলো কয়েকটি মোমবাতি। ইয়াসমিন আর যহীরের চোখে ছিলো নেশার ঘোর, কিন্তু সে নেশা ঘুমের নেশা থেকে আলাদা।

ইয়াসমিন, সত্যি সত্যি বলো তো, তুমি খুশী হয়েছো? যহীরের মুখে প্রশ্ন।

দুলহিন অনন্ত সুখের আবেশে আধো নিমীলিত চোখ দু'টি একবার উপরে তুলে আবার নীচু করলো।

যহীর আবার একই প্রশ্ন করলেন। ইয়াসমিন স্বামীর মুখের দিকে তাকালো। লজ্জা ও আনন্দের গভীর আবেগে আত্মহারা হয়ে এক মুগ্ধকর হাসি টেনে এনে সে হাত রাখলো স্বামীর হাতের উপর। তার এ বাকহীন জওয়াব কতো বেশী অর্থপূর্ণ! এ সেই মুহূর্ত, যখন রহমতের ফেরেশতার কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে আনন্দ-গীতি আর ইয়াসমিনের কম্পিত দীল যহীরের দীলের কম্পনের জওয়াব দিচ্ছে। মুখের কথা যেনো হারিয়ে ফেলেছে তার বাস্তবতা। যহীর আবার একই প্রশ্ন করলেন।

'আপন দীলকে প্রশ্ন করো।' ইয়াসমিন জওয়াব দিলো।

যহীর বললেন, আমার দীলের মধ্যে তো আজ খুশীর তুফান উদ্বেল হয়ে উঠছে। আমার মনে হয় যেনো আজ সৃষ্টি সব কিছুই আনন্দের সুরে মুখর। আহা! এর-ঝংকার যদি চিরন্তন হতো!'

'আহা'! ইয়াসমিনের মুখ থেকে অলক্ষ্যে বেরিয়ে এলো। এক মুহূর্ত আগে তার যে কালো কালো ডাগর চোখ দু'টি ছিলো আনন্দ-আবেগে উজ্জ্বল, ভবিষ্যতের চিন্তায় তা হঠাৎ অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। যহীর প্রিয়তমা পত্নীর চোখে অশ্রু দেখে কেমন যেনো আপন ভোলা হয়ে গেলেন।

'ইয়াসমিন! ইয়াসমিন! কেঁদে ফেললে তুমি? কেন?'

'না'। ইয়াসমিন হাসবার চেষ্টা করে জওয়াব দিলো। অশ্রুভেজা হাসি যেনো তার রূপের ছটা বাড়িয়ে দিলো আরো বহুগুণ।

'না কেন? সত্যি সত্যি তো কাঁদছো তুমি। ইয়াসমিন, কি মনে পড়লো তোমার? তোমার চোখের আঁসু দেখা যে আমার বরদাশতের বাইরে'।

'একটা কথা আমার মনে এসেছিলো।' ইয়াসমিন মুখের উপর হাসির আভা টেনে আনার চেষ্টা করে জওয়াব দিলো।

'কি কথা?' যহীর প্রশ্ন করলেন।

'এমন কিছু নয়। হালীমার কথা মনে পড়েছিলো আমার। বেচারীর শাদীর পর এক বছর না যেতেই ওর স্বামী দুনিয়া থেকে বিদায় নিলো।'

যহীর বললেন, 'এ ধরনের মওতের কথা ভেবে আমি ঘাবড়ে উঠি। বেচারা রোগে বিছানায় পা ঘসে ঘসে জান দিলো। এক মুজাহিদের মওত কতো ভালো! কিন্তু আফসোস, সে সৌভাগ্য ওর হোল না। বেচারার নিজেরও কোনো কসুর ছিলো না এতে। ছেলেবেলা থেকেই ও ছিলো নানারকম ব্যাধির শিকার। ওর মওতের ক'দিন আগে আমি যখন ওর অবস্থা জানতে গেলাম, তখন ও এক অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে পড়ে রয়েছে। আমায় ও পাশে ডেকে বসালো। আমার হাতটা হাতের মধ্যে নিয়ে বললো, 'তুমি খুবই খোশ কিসমৎ। তোমার বাযু লোহার মত মযবুত। ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে তুমি জংগের ময়দানে দুশমনের তীর ও নেযার মোকাবিলা কর, আর আমি এখানে পড়ে পা ঘসে ঘসে মরছি। দুনিয়ায় আমার আসা না আসা সমান। ছোটবেলায় আমার চোখে ছিলো মুজাহিদ হবার স্বপ্ন, কিন্তু যৌবনে এসে বিছানা ছেড়ে কয়েক পা চলাও হোল আমার পক্ষে কষ্টকর।' কথাগুলো বলতে বলতে ওর চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। আমি ওকে কতো সান্ত্বনা দিলাম, কিন্তু ও ছোট ছেলের মতো কাঁদতে লাগলো। জিহাদে যাবার আকাংখা বুকে নিয়েই ও চলে গেছে, কিন্তু ওর দেহের ভিতরে ছিলো এক মুজাহিদের দীল। মওতকে ওর ভয় ছিলো না, কিন্তু এ ধরনের মওত ও চায়নি।'

যহীরের কথা শেষ হলে দু'জনই গভীর চিন্তায় অভিভূত হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলো।

ভোরের আভাস তখন দেখা দিচ্ছে। মুয়াযযিন দুনিয়ার মানুষের গাফলতের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়ে নামাযে শরীক হবার খোদায়ী হুকুম শুনিয়ে দিচ্ছে। তারা দু'জনই সেই হুকুম তামিল করবার জন্য তৈরী হচ্ছে, অমনি কে যেনো দরযায় আঘাত দিলো। যহীর দরযা খুলে দেখলেন, সামনে সাঈদ মাথা থেকে পা পর্যন্ত লৌহ-আবরণে ঢেকে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে রয়েছেন। সাঈদ ঘোড়া থেকে নামলেন এবং যহীর এগিয়ে গিয়ে তাঁর বুকে বুক মিলালেন।

সাঈদ আর যহীর ছেলেবেলা থেকে পরস্পরের দোস্ত। তাঁদের দোস্তি তাঁদেরকে সহোদর ভাইয়ের চাইতেও কাছে টেনে এনেছে। দু'জন লেখাপড়া করেছেন একই

জায়গায়। একই জায়গায় তাঁরা যুদ্ধবিদ্যা শিখেছেন, আর কতো ময়দানে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেখিয়েছেন বাযুর শক্তি ও তলোয়ারের তেয! সাঈদ যহীরক হঠাৎ আসার কারণ শুধালেন।

'কায়রুনের ওয়ালী আমায় আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।' সাঈদ বললেন।

'সব খবর ভালো তো!'

'না।' সাঈদ জওয়াব দিলেন, 'আফ্রিকায় দ্রুতগতিতে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ছে। রুমের লোকেরা জাহেল বার্বার দলকে উত্তেজিত করে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। এই বেদ্রোহের আগুন নিভিয়ে দিবার জন্য গড়ে তুলতে হবে নতুন ফউজ। গভর্নর দরবারে খিলাফতে সাহায্যের আবেদন করে বিফল হয়েছেন। নাসারা শক্তি আমাদের কমযোরীর সুযোগ নিচ্ছে। অবস্থা আয়ত্বে আনতে না পারলে আমরা চিরদিনের জন্য হারিয়ে ফেলবো এ বিশাল ভূখণ্ড। গভর্নর তাই আমায় আপনার কাছে পাঠিয়েছেন এই চিঠি নিয়ে।'

যহীর চিঠি খুলে পড়লেন। চিঠির মর্ম হচ্ছেঃ 'সাঈদ তোমায় আফ্রিকার অবস্থা খুলে বলবে। মুসলমান হিসাবে তোমার ফরযঃ যতো সিপাহী সংগ্রহ করতে পার, তাদেরকে নিয়ে শীগগিরই এখানে পৌছবে। খলিফার দরবারেও আমি এক চিঠি পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় আরবের লোকেরা যেমন নানারকম গৃহবিবাদে লিপ্ত রয়েছে, তাতে ওখান থেকে আমার কোনো সাহায্য পাবার উম্মীদ নেই। নিজের তরফ থেকে তুমি চেষ্টা করো।'

যহীর এক নওকরকে ডেকে সাঈদের ঘোড়াটি তার হাওয়ালা করে দিলেন। তারপর তাঁকে নিয়ে গেলেন ঘরের একটি কামরায়। তাঁর চোখ থেকে প্রিয়া মিলনের রাত্রির নেশা ততোক্ষণে কেটে গেছে। অপর কামরায় গিয়ে দেখলেন, ইয়াসমিন আল্লাহর দরগায় সিজদায় পড়ে রয়েছে। তাঁর দীল আনন্দে ভরে উঠলো। ফিরে সাঈদের কাছে এসে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন 'সাঈদ আমার শাদী হয়ে গেছে।'

'মুবারক হোক। কবে?'

'কাল।'

'মুবারক হোক।' সাঈদের মুখে হাসি, কিন্তু মুহূর্তে সে হাসি কোথায় উবে গেলো। পুরানো বন্ধুর চোখের উপর তিনি চোখ রাখলেন। তাঁর দৃষ্টি যেনো সুধাচ্ছে, এই যে শাদীর আনন্দ তা তোমায় জিহাদের উৎসাহ থেকে ফিরিয়ে আনবে না তো? যহীরের চোখ জওয়াবে প্রকাশ করছিলো সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়।

দুনিয়ার কম বেশি করে প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে অবশ্যি আসে এমন সব মুহূর্ত, যখন সে উচ্চস্তরে পৌছবার অথবা মহৎ কার্য করবার সুযোগ পায়, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে লাভ-লোকসানের হিসাব করে আমরা হারিয়ে ফেলি সে মওকা।

সাঈদ প্রশ্ন করলেন, 'চিঠি সম্পর্কে আপনি কি চিন্তা করলেন?'

যহীর হাসতে হাসতে সাঈদের কাঁধে হাত রেখে বললেনঃ 'এতে আমার চিন্তার কি আছে? চলো।'

'চলো- কথাটা বাইরে খুবই সহজ। কিন্তু যহীরের মুখে কথাটি শুনে সাঈদের মনে যে খুশী হলো, তা আন্দাজ করা কঠিন। নিজের অলক্ষ্যে তিনি বন্ধুর সাথে আলিংগনাবদ্ধ হোলেন। যহীরের মুখে আর কোনো কথা নেই। তিনি সাঈদকে সাথে নিয়ে ঘরের বাইরে মসজিদের দিকে চললেন।

ফজরের নামাযের পর যহীর বক্তৃতা করতে উঠলেন। মুজাহিদের কথার প্রভাব বিস্তার করতে না লাগে সুন্দর সুন্দর শব্দ সংযোজন আর না লাগে লম্বা লম্বা প্রতিশ্রুতি। তাঁর সাদাসিধা আবেগপূর্ণ কথাগুলো লোকের দীলের মধ্যে বসে গেলো। বক্তৃতার মধ্যে তিনি উঁচু গলায় বললেনঃ

'মুসলমান ভাইগণ! আমাদের স্বার্থ সন্ধান ও গৃহবিবাদ আমাদেরকে কখনো রক্ষা করতে পারবে না। রুম ও ইউনানের যে সালতানাতকে আমরা বহুবার পদলুণ্ঠিত করেছি, আজ এই মুহূর্তে তারা আর একবার আমাদের মোকাবিলা করবার সাহস করছে। তারা ইয়ারমুক ও আজনাদিনের পরাজয় ভুলে গেছে। এসো, আমরা তাদেরকে আর একবার জানিয়ে দেই যে, ইসলামের মর্যাদা হেফাযত করবার জন্য মুসলমান অতীতের মতো আজো তার বুকের খুন তেমনি অকাতরে বিসর্জন দিতে পারে। তারা নানা রকম ষড়যন্ত্র করে আফ্রিকার বাসিন্দাদের জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছে। তাদের ধারণা, গৃহবিবাদের ফলে আমরা কমযোর হয়ে পড়েছি। কিন্তু আমি বলতে চাই, যতোক্ষণ একটিমাত্র মুসলমান যিন্দাহ থাকবে, ততোক্ষণ আমাদের দিকে ভীতির দৃষ্টিতে তাকাতে হবে তাদেরকে।

মুসলমানগণ! এসো, আবার আমরা তাদেরকে বলে দেই, হযরত উমরের (রাঃ) যামানায় যেমন ছিলো, আজো আমাদের সিনায় রয়েছে সেই একই উদ্যম, বাযুতে রয়েছে সেই তাকৎ আর তলোয়ারে রয়েছে সেই তেয।'

যহীরের বক্তৃতার পর আড়াইশ নওজোয়ান তাঁর সাথী হবার জন্য তৈরী হলো।

❦

ইয়াসমিনের যিন্দেগীর সকল আকাংখার কেন্দ্রস্থল স্বামী তার চোখের সামনে থেকে বিদায় নিয়ে চলেছেন ময়দানে জংগের দিকে। তার দীলের আগুন চোখের পথ ধরে বেরিয়ে আসতে চাইছে আঁসুর ধারায়, কিন্তু স্বামীর সামনে নিজকে বুযদীল প্রমাণিত করতে বাধা দিচ্ছে তার আত্মসম্ভ্রমবোধ। চোখের আঁসু চোখেই চাপা পড়ে যাচ্ছে।

যহীর তাকালেন তাঁর বিবির মুখের দিকে। দুঃখ ও বিষণ্ণতার মূর্ত রূপ দাঁড়িয়ে আছে তাঁর চোখের সামনে। তাঁর দীল বলছে আরো এক লহমা দেরী করতে, আরো কয়েকটি কথা বলতে, কিন্তু সেই দীলেরই আর একটি দাবী—আর একটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে তাকে।

'আচ্ছা ইয়াসমিন, খোদা হাফিয।' বলে যহীর লম্বা লম্বা কদম ফেলে দরযার দিকে গেলেন এবং দরযা খুলে বাইরে যাবার উপক্রম করলেন। কি যেনো ভেবে তিনি হঠাৎ থেমে গেলেন আপনা থেকেই। যে ধারণা তিনি কখনো মনের কাছেও আসতে দেননি, তা যেনো বিদ্যুৎগতিতে তার দীল ও মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করে ফেললো। দীলের সূক্ষ্ম অনুভূতি তার কমযোর আওয়াযে শুধু জানিয়ে দিলো, হয়তো এই-ই তাদের শেষ মোলাকাত। মুহূর্তের মধ্যে এই ধারণা যেনো এক বিপর্যয় সৃষ্টি করে দিলো। যহীরের পা আর এগুতে চাইলো না। ইয়াসমিন কয়েক কদম এগিয়ে এলো। যহীর চোখ বন্ধ করে দু'বাহু প্রসারিত করে দিলেন। ইয়াসমিন কান্না-ভারাতুর চোখে আত্মসমর্পণ করলো তাঁর আলীংগনের মধ্যে।

'ইয়াসমিন!'

'স্বামী!'

যে অশ্রুধারা ইয়াসমিন তার দীলের গভীর তলায় গোপন করবার ব্যর্থ চেষ্টা করছিলো, অলক্ষ্যে তা এবার বাঁধমুক্ত হলো। দু'জনেরই দীল তখন কাঁপছে, কিন্তু দীলের সে কাঁপন অতি মৃদু এবং ধীরে ধীরে তা যেনো মৃদুতর হয়ে আসছে। সারা সৃষ্টি যেনো এক অপূর্ব সুর-ঝংকারে মুখর। কিন্তু সে সুরের তান যেনো আগের চাইতে আরো গভীর হয়ে আসছে। মুজাহিদের পরীক্ষার মুহূর্ত সমাগত। প্রেমের অনুভূতি আর কর্তব্যের অনুভূতির সংঘাত। সৃষ্টির সুর-মূর্ছনা মৃদুতর হয়ে এসেছে আর সেই মুহূর্তে যহীরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ইয়াসমিন শুধু ইয়াসমিন। সৌন্দর্য ও মনোহারিত্বের প্রতিমূর্তি। বর্ণগন্ধময় দুনিয়া! আর অপর দিকে? দীল ও আত্মার হুকুম। সেই গভীর সুরের জগতে আবার লাগে কাঁপন। মৃদু সুরঝংকার আবার তীব্রতর হয়ে ওঠে। যহীর তাঁর কম্পিত পা দু'খানি আবার সামলে নেন। হাতের চাপ ঢিলা হয়ে আসে। শেষ পর্যন্ত দু'জন আলাদা হয়ে দাঁড়ান সামনাসামনি।

'ইয়াসমিন, এ যে কর্তব্যের ডাক'। যহীর বললেন।

'স্বামী, আমি তা জানি।' ইয়াসমিন জওয়াব দেয়।

'আমার ফিরে আসা পর্যন্ত হানিফা তোমার খেয়াল রাখবে। তুমি ঘাবড়াবে না তো?'

'না, আপনি আশ্বস্ত হোন।'

ইয়াসমিন, একবার হেসে দেখাও তো আমায়। এমনি মুহূর্তে বাহাদুর নারী কখনো চোখের পানি ফেলে না। তুমি এক মুজাহিদের বিবি।'

স্বামীর হুকুম তামিল করতে গিয়ে ইয়াসমিন হাসলো, কিন্তু সে হাসির সাথে সাথেই দু'টি বড় বড় অশ্রুবিন্দু তার চোখ থেকে গড়িয়ে পড়লো।

'স্বামী, আমায় মাফ করুন।' অশ্রু মুছে ফেলতে ফেলতে সে বললো, আহা! আমিও যদি এক আরব মায়ের কোলে পালিত হতাম!' কথাটি শেষ করতে করতে সে এক গভীর বেদনার আবেশে চোখ মুদলো আর একবার সে তার বাহু প্রসারিত করলো যহীরের দিকে। কিন্তু চোখ খুলে সে দেখলো, তার প্রিয়তম স্বামী আর নেই সেখানে।

❦

ইয়াসমিন পালিত হয়েছিলো এক ইরানী মায়ের কোলে। তাই আরব-নারীর তুলনায় নারীসুলভ কোমলতা ও সূক্ষ্ম অনুভূতি ছিলো তার ভিতরে বেশি। যহীর বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর তার বে-কারারী সীমা ছাড়িয়ে গেলো। তার চোখে বদলে গেলো দুনিয়ার রূপ। পুরানো পরিচারিকা হানিফা সব রকম চেষ্টা করে তার দীলকে আশ্বস্ত করতে চাইতো। কয়েকমাস পরে ইয়াসমিন বুঝলো, তার দেহের মধ্যে প্রতিপালিত হচ্ছে আর একটি নতুন মানবদেহ। এরই মধ্যে স্বামীর কাছ থেকে কয়েকখানি চিঠিও এসেছে তার কাছে।

হানিফা যহীরকে লিখে জানিয়েছেঃ 'তোমার ঘরে এক ছোট্ট মেহমান আসবে শিগগীরই। ফিরে এসে দেখবে, ঘরের রওনক বেড়ে গেছে অনেকখানি। হাঁ, তোমার বিবি দিন কাটাচ্ছে কঠিন মর্মপীড়ার মধ্য দিয়ে। ছুটি পেলে কয়েকদিনের জন্যে এসে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে যেয়ো।'

আটমাস পর যহীর লিখলেন, দু'মাসের মধ্যে তিনি ফিরে আসবেন ঘরে। এই চিঠি পেয়ে প্রতীক্ষার জ্বালা ইয়াসমিনের কাছে আগের চাইতেও বেশী অসহনীয় হয়ে উঠলো। দিনের প্রশান্তি আর রাতের নিদ্রা তার জন্য হারাম হয়ে গেলো। দেখতে দেখতে শরীরও পড়লো ভেঙ্গে।

যহীরের ইনতেযারের সাথে সাথে ছোট্ট মেহমানের ইনতেযারও বেড়ে চললো। শেষ পর্যন্ত ইনতেযারের মেয়াদ শেষ হলো এবং যহীরের ঘরের নির্বাক আবহওয়া একটি শিশুর কলশব্দে কিছুটা প্রাণময় হয়ে উঠলো। এই শিশুই উযরা।

উযরার পয়দায়েশের পর ইয়াসমিনের হুঁশ হলে চোখ খুলেই সে প্রথম প্রশ্ন করলো, উনি এলেন না?

'উনিও এসে যাবেন।' হানিফা সান্ত্বনার ভংগীতে বললো।

'এতো দেরী হলো? খোদা জানেন, কবে আসবেন তিনি।'

উযরা পয়দা হবার পর তিন হফতা কেটে গেছে। ইয়াসমিনের স্বাস্থ্য দিনের পর দিন ভেঙ্গে পড়ছে। রাত্রে ঘুমের মধ্যে বারংবার সে যহীরের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে উঠে বসে। কখনো আবার ঘুমের মধ্যে চলতে গিয়ে দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায়।

হানিফা ঘুমে, জাগরণে, উঠতে, বসতে তাকে সান্ত্বনা দেয়। এছাড়া আর সে কি-ই-বা করতে পারে?

একদিন দুপুর বেলা ইয়াসমিন শুয়ে রয়েছে তার বিছানার উপর। হানিফা তার কাছে এক কুরসীতে বসে উযরাকে আদর করছে। এমন সময় কে যেনো ঘা দিলো দরজার উপর।

'কে যেনো ডাকছে।' ইয়াসমিন নেহায়েত কমযোর আওয়াযে বললো।

হানিফা উযরাকে ইয়াসমিনের পাশে শুইয়ে রেখে উঠলো এবং বাইরে গিয়ে দরযা খুলে দিলো। সামনে সাঈদ দাঁড়ানো।

হানিফা অধীর ও পেরেশান হয়ে বললো, 'সাঈদ, তুমি এসেছো? যহীর কোথায়? সে এলোনা?'

ইয়াসমিনের কামরা যদিও বাইরের দরযা থেকে বেশ দূরে, তথাপি হানিফার কথাগুলো তার কানে পৌছে গেছে। সাঈদের নাম শুনেই তার কলিজা ধড়ফড় করে উঠলো এবং এক লহমার মধ্যে হাজারো দুর্ভাবনা জাগলো তার মনে। কম্পিত বুকখানি হাতে চেপে ধরে সে উঠলো বিছানা থেকে। কাঁপতে কাঁপতে কামরা থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালো হানিফার কাছ থেকে দু'তিন কদম পিছনে। হানিফা দরযায় দাঁড়িয়ে তখনো চেয়ে আছে সাঈদের মুখের পানে, তাই ইয়াসমিনের আগমন সে লক্ষ্য করতে পারেনি। সাঈদ দাঁড়িয়ে রয়েছেন দরযার বাইরে। তাই দেখতে পাননি ইয়াসমিনকে।

হানিফা আর একবার প্রশ্ন করলো, কিন্তু সাঈদ নীরব।

'সাঈদ! হানিফা বললো, 'জওয়াব দিচ্ছো না কেন? তবে কি সে--?

সাঈদ গর্দান তুলে হানিফার দিকে তাকালেন। তিনি কিছু বলতে চাইছেন, কিন্তু কথা ফুটছে না তাঁর মুখে। তার বড় বড় খুবসুরত চোখ দু'টি অশ্রুভারাক্রান্ত। তার মুখের উপর ফুটে উঠেছে অসাধারণ দুঃখ ও বিষাদের ছাপ।

'সাঈদ--- কথা বল!' হানিফা আবার বললো।

'উনি শহীদ হয়ে গেছেন!-আমার আফসোস, আমি যিন্দাহ ফিরে এসেছি।'

কথা বলতে বলতে সাঈদের চোখ থেকে উছলে পড়লো অশ্রুধারা।

সাঈদের মুখের কথা শেষ হতেই হানিফার পিছনে একটা চীৎকার ধ্বনি শোনা গেলো এবং ধপ করে যমিনের উপর কিছু পড়বার আওয়ায এলো। হানিফা ঘাবড়ে গিয়ে পিছনে ফিরলো। সাঈদও হয়রান হয়ে আঙিনায় প্রবেশ করলেন। ইয়াসমিন ততক্ষণে নীচের দিকে মুখ দিয়ে পড়ে রয়েছে।

সাঈদ জলদী করে তাকে তুলে কামরায় নিয়ে শুইয়ে দিলেন বিছানার উপর। তার হুঁশ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চললো। অবশেষে হতাশ হয়ে তিনি ছুটলেন হাকীম ডাকতে। খানিকক্ষণ পর হাকীম নিয়ে ফিরে এসে সাঈদ দেখলেন, মহল্লার বহু নারী জমা হয়েছে ঘরের মধ্যে। হাকীমকে দেখে একজন বললো, এখন আর আপনার কোনো প্রয়োজন নেই। সে চলে গেছে।

সন্ধ্যার কাছাকাছি সময়ে শহরের হাকিম ইয়াসমিনের জানাযা পড়ালেন। যহীরের শাহাদতের খবর রটে গেলো চারদিকে। তাঁর মাগফেরাতের জন্য দো'য়া করা হলো। তারপর দো'য়া করা হলো যহীর ও ইয়াসমিনের স্মরণচিহ্ন উযরার দীর্ঘজীবন কামনায়।

সাঈদ সেই দিনই উযরাকে এক ধাত্রীর হাতে সমর্পণ করলেন। হানিফাকে তিনি বললেন, 'তুমি যহীরের বাড়িতে থাকতে চাইলে আমি তোমার সব খরচ বহন করতে তৈরী। আর আমার বাড়িতে থাকা পছন্দ করলে আমি তোমার খেদমত করবো।'

হানিফা বললো, 'আমি হলবে নিজের ঘরে চলে যেতে চাই। ওখানে আমার এক ভাই রয়েছে। ওখানে মন না বসলে আমি আবার ফিরে আসবো তোমার কাছে।'

সাঈদ হানিফার সফরের ইনতেযাম করে পাঁচশ দিনার দিয়ে তাকে বিদায় করলেন।

দু'বছর পর সাঈদ উযরাকে ফিরিয়ে এনে নিজেই তাকে পালন করতে লাগলেন। ফারেসে খারেজীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যাবার বেলায় তিনি উযরাকে রেখে গেলেন সাবেরার কাছে।

তিন

লোকালয়ের বাগ-বাগিচার ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে একটি নদী। পোষা জানোয়ারগুলোকে পানি খাওয়ানোর জন্য লোকালয়ের বাসিন্দারা নদীর কিনারে খুদে গেছে একটি তালাব। নদীর পানিতে ভরে থাকে তালাবটি। তালাবের আশেপাশে দেখা যায় খেজুর গাছের মুগ্ধকর দৃশ্য। লোকালয়ের ছেলেমেয়েরা প্রায় সব সময়েই এসে খেলা করে এখানে।

একদিন আব্দুল্লাহ, নয়ীম ও উযরা সেখানে খেলতে গেলো লোকালয়ের ছেলেমেয়েদের সাথে। আব্দুল্লাহ তার সমবয়সী ছেলেদের সাথে গোসল করতে নামলো তালাবের মধ্যে। নয়ীম আর উযরা দাঁড়িয়ে তালাবের কিনারে। সেখান থেকে তারা বড় ছেলেদের সাঁতার কাটা, লাফ-ঝাঁফ ও দাপাদাপি দেখে খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। কোনো ব্যাপারেই নয়ীম তার ভাইয়ের পেছনে পড়ে থাকতে চায় না। সাঁতার কাটতে সে শেখেনি, কিন্তু আব্দুল্লাহকে সাঁতার কাটতে দেখে সে নিজকে সামলে রাখতে পারলো না। উযরার দিকে তাকিয়ে সে বললো, এসো উযরা আমরাও গোসল করিগে।

'আম্মিজান রেগে যাবেন।' উযরা জওয়াব দিলো।

'আব্দুল্লাহর উপর তো তিনি রাগ করেন না। আমাদের উপর কেন রাগ করবেন তাহলে?'

'উনি তো বড়ো। উনি সাঁতরাতে জানেন। তাই আম্মিজান রাগ করেন না।'

'আমরা গভীর পানির দিকে যাবো না। চলো যাই।'

'উঁহু!' উযরা মাথা নেড়ে বললো।

'ডর লাগছে তোমার?

'নাতো!'

'তবে চলো।'

নয়ীম যেমন সব কিছুতে আব্দুল্লাহর অনুসরণ করতে চায়— শুধু তাই নয়, তাকে ছাড়িয়ে যেতে চায়, তেমনি উযরাও নয়ীমের সামনে স্বীকার করতে চায় না তার কমজোরী। নয়ীম হাত বাড়িয়ে দিলে উযরা তার হাত ধরে পানিতে ঝাঁপ দিলো। কিনারের দিকে পানি খুব গভীর নয়, কিন্তু আস্তে আস্তে তারা এগিয়ে চললো গভীর পানির দিকে। আব্দুল্লাহ ছেলেদের সাথে অপর কিনারে খেজুর গাছের একটা গুড়ির উপর থেকে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ছিলো। পালা করে আব্দুল্লাহর নযর যখন নয়ীম ও উযরার উপর পড়লো, তখন পানি তাদের গর্দান বরাবর উঠেছে। তখনো দু'জন পরস্পরের হাত ধরে রয়েছে। আব্দুল্লাহ ঘাবড়ে গিয়ে চীৎকার জুড়ে দিলো, কিন্তু তার

আওয়ায পৌছবার আগেই উযরা ও নয়ীম গভীর পানিতে পড়ে হাত-পা ছুঁড়তে লাগলো। আব্দুল্লাহ দ্রুত সাঁতার কেটে তাদের দিকে এগিয়ে এলো। তার আসার আগেই নয়ীমের পা যমিনের নাগাল পেয়েছে। কিন্তু উযরা তখন হাবুডুবু খাচ্ছে। আব্দুল্লাহ নয়ীমকে নিরাপদ দেখে এগিয়ে গেলো উযরার দিকে।

উযরা হাত-পা মারছে তখনো। আব্দুল্লাহ কাছে এলে সে তার গলায় বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরলো। তার বোঝা বয়ে নিয়ে সাঁতার কাটার সাধ্য আব্দুল্লাহর নেই। উযরা তাকে এমন ভীষণভাবে জড়িয়ে ধরেছে যে, সে তার বাযু নাড়তে পারছে না ঠিকমতো। দু'তিন বার সে পানিতে ডুবে ডুবে ভেসে উঠলো আবার। এরই মধ্যে নয়ীম কিনারে চলে গেছে। সে আর সব ছেলেদের সাথে মিলে শুরু করলো ডাক-চীৎকার। তখন এক রাখাল উটকে পানি খাওয়াতে আসছিলো তালাবের দিকে। ছেলেদের ডাক-চীৎকারে সে ছুটে এলো এবং কিনারে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটি দেখেই পানিতে ঝাঁপ দিলো কাপড়-চোপড় সমেত। উযরা ততোক্ষণে বেহুঁশ হয়ে আব্দুল্লাহকে ছেড়ে দিয়েছে তার বাহুবন্ধন থেকে। সে তখন এক হাতে উযরার মাথার চুল ধরে অপর হাত দিয়ে সাঁতার কাটার চেষ্টা করছে।

রাখাল দ্রুতগতিতে গিয়ে উযরাকে ধরে তুললো উপরে। আব্দুল্লাহ উযরার বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সাঁতরে গেলো আস্তে আস্তে কিনারের দিকে। রাখাল উযরাকে পানি থেকে তুলে নিয়ে দ্রুতগতিতে ছুটে চললো সাবেরার ঘরের দিকে।

আব্দুল্লাহ তালাব থেকে উঠে এলে নয়ীম ঝট করে ছুটে গেলো অপর কিনারে। সেখান থেকে সে আব্দুল্লাহর কাপড়গুলো নিয়ে এলো। আব্দুল্লাহ কাপড় পরতে পরতে নয়ীমের পানে তার ক্রুদ্ধদৃষ্টি হানলো। নয়ীম আগেই হতভম্ব হয়ে গেছে। ভাইয়ের ক্রোধের উত্তাপ সহ্য করতে না পেরে সে কেঁদে ফেললো হু হু করে। আব্দুল্লাহ নয়ীমকে কাঁদতে দেখেছে খুব কম। নয়ীমের চোখের পানি তার মন গলিয়ে দিলো মোমের মতো। সে বললো, 'তুমি একটা গাধা হয়ে গেছো। ঘরে চলো।'

নয়ীম কান্না জড়ানো কণ্ঠে বললো, 'আম্মিজান মারবেন। আমি যাবো না।'

'মারবেন না।' আব্দুল্লাহ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো।

আব্দুল্লাহর সান্ত্বনা-ভরা কথা শুনে নয়ীমের চোখের পানি শুকিয়ে গেলো। সে এবার চললো ভাইয়ের পিছু পিছু।

রাখাল উযরাকে নিয়ে যখন সাবেরার ঘরে পৌছলো, তখন সাবেরার পেরেশানীর আর অন্ত নেই। আশেপাশের মেয়েছেলারাও এসে জমা হয়েছে সেখানে। বহু চেষ্টার পর উযরা'র হুঁশ ফিরে এলো। সাবেরা রাখালকে লক্ষ্য করে বললেন, 'এ সব নয়ীমের দুষ্টুমির ফল হবে। উযরাকে ওর সাথে বাইরে পাঠাতে আমি সব সময়ই ভয় করি। পরশুও একটা ছেলের মাথা ফুটো করে দিয়েছে। আচ্ছা, আজ একবার ঘরে এলেই হয়।'

রাখাল বললো, 'এতে নয়ীমের কোন কসুর নেই। সে তো কেবল কিনারে দাঁড়িয়ে ডাক চীৎকার দিচ্ছিলো। তার আওয়ায শুনেই আমি তালাবের কাছে ছুটে এসে দেখি, আপনার বড়ো ছেলে উযরার চুল ধরে টানছে আর সে হাবুডুবু খাচ্ছে।'

'আব্দুল্লাহ!' সাবেরা হয়রান হয়ে বললেন, সে তো এমন নয় কখনো?'

রাখাল বললো, আজ তো আমিও তার কার্যকলাপ দেখে হয়রান হয়ে গেছি। আমি সময়মতো না পৌঁছলে নিষ্পাপ মেয়েটি ডুবেই মারা যেতো।'

ইতিমধ্যে আব্দুল্লাহ ঘরে পৌঁছলো। নয়ীম তার পিছু পিছু মাথা নীচু করে হাঁটছে। আব্দুল্লাহ সাবেরার মুখোমুখি হলে নয়ীম গিয়ে তার পিছনে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়ালো।

সাবেরা গযবের স্বরে বলে উঠলেন, 'আব্দুল্লাহ, যাও। আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাও। আমার ধারণা ছিলো, বুঝি তোমার কিছুটা বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে, কিন্তু আজ তুমি নয়ীমকেও চার কদম ছাড়িয়ে গেছো। উযরাকে সাথে নিয়েছিলে ডুবিয়ে মারবার জন্য?'

সারা পথ আব্দুল্লাহ নয়ীমকে বাঁচাবার কৌশল চিন্তা করেছে। এই অপ্রত্যাশিত অভ্যর্থনায় সে হয়রান হয়ে গেলো। সে বুঝলো, নয়ীমের কসুর তার ঘাড়েই চেপে বসেছে। সে পিছন ফিরে তাকালো। ছোট্ট ভাইটির চোখে সে দেখতে পেলো এক আকুল আবেদন। তাকে বাঁচাবার একটিমাত্র উপায় আব্দুল্লাহর সামনে। যে অপরাধ সে করেনি, তাই তাকে মাথা পেতে নিতে হবে। ভেবে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। মায়ের ক্রদ্ধ ভর্ৎসনা সে নীরবে হজম করে গেলো।

রাতের বেলা উযরার কাশিসহ জ্বর দেখা দিলো। সাবেরা শিয়রে বসে রয়েছেন। নয়ীমও নেহায়েৎ বিষণ্ন মুখে তাঁর পাশে বসে। আব্দুল্লাহ ভিতরে ঢুকলো। চুপি চুপি সে গিয়ে দাঁড়ালো সাবেরার পাশে। সাবেরা তার দিকে লক্ষ্য না করে উযরার মাথা টিপে দিচ্ছিলেন। নয়ীম হাত দিয়ে আব্দুল্লাহকে চলে যেতে ইশারা করলো এবং হাত মুঠো করে তাকে বুঝাতে চাইলো যে, এখ্খুনি তার চলে যাওয়া উচিত, নইলে ফল ভালো হবে না। আব্দুল্লাহ মাথা নেড়ে জওয়াব দিলো যে, সে যাবে না।

নয়ীমকে ইশারা করতে দেখে সাবেরা আব্দুল্লাহর দিকে নযর তুললেন। আব্দুল্লাহ মায়ের ক্রদ্ধ দৃষ্টিতে ঘাবড়ে গেলো। সে বললো, 'উযরা কেমন আছে?'

সাবেরা আগে থেকেই রেগে রয়েছেন। এবার আর সামলাতে পারলেন না।- 'দাড়াও বলছি'—বলে তিনি উঠে আব্দুল্লাহর কান ধরে বাইরে নিয়ে গেলেন। আঙ্গিনার একধারে আস্তাবল। সাবেরা আব্দুল্লাহকে সেদিকে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'উয'রা কেন এখনো মরেনি, তাই দেখতে গিয়েছিলে বুঝি? রাতটা এখানেই কাটাও।' আব্দুল্লাহকে এই হুকুম দিয়ে সাবেরা গিয়ে আবার 'উয'রার শিয়রে বসলেন।

নয়ীম যখন খানা খেতে বসলো, তখন ভাইয়ের কথা তার মনে পড়ে গেলো। লোকমা তার গলা দিয়ে সরতে চাইলো না। ভয়ে ভয়ে সে মাকে জিগগেস করলো, 'আম্মিজান! ভাই কোথায়?'

'আজ সে আস্তাবলেই থাকবে।'

'আম্মি, তাকে খানা দিয়ে আসবো?'

'না। খবরদার, তার কাছে গেলে ...।'

নয়ীম কয়েকবার লোকমা তুললো, কিন্তু তার হাত মুখের কাছে গিয়ে থেমে গেলো।

'খাচ্ছো না?' সাবেরা প্রশ্ন করলেন।

'খাচ্ছি আম্মি'। নয়ীম জলদী করে একটি লোকমা মুখে দিয়ে জওয়াব দিলো।

সাবেরা এশার নামাযের ওযু করতে উঠলেন। ওযু করে ফিরে এসে নয়ীমকে তেমনি বসে থাকতে দেখে বললেন, নয়ীম, তোমার আজ বড্ড দেরী হচ্ছে। এখনো খানা খেলে না?'

নয়ীম জওয়াবে বললো, 'আমার খাওয়া হয়ে গেছে।'

বরতনে তখনো খানা পড়ে রয়েছে। সাবেরা তা তুলে অপর কামরায় রেখে নয়ীমকে ঘুমোতে যেতে বললেন। নয়ীম বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো। সাবেরা নামাযে দাঁড়ালে সে চুপি চুপি উঠে নিঃশব্দে পাশের কামরা থেকে খানা তুলে নিয়ে আস্তাবলের দিকে চললো। আব্দুল্লাহ একটি ঘোড়ার মুখের উপর হাত বুলাচ্ছিলো। দরযা দিয়ে চাঁদের রোশনী এসে পড়েছে তার মুখে। নয়ীম খানা তার সামনে রেখে বললো, 'আম্মিজান নামায পড়ছেন। জলদী খেয়ে নাও।'

আব্দুল্লাহ নয়ীমের দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, 'নিয়ে যাও। আমি খাবো না।'

'কেন? আমার উপর নারায হয়েছো, না?' অশ্রুসজল চোখে সে বললো।

'না নয়ীম, এ আম্মিজানের হুকুম। তুমি যাও।'

'আমি যাবো না। আমিও থাকবো এখানেই।'

'যাও নয়ীম! আম্মিজান তোমায় মারবেন।'

'না, আমি যাবো না।' নয়ীম আব্দুল্লাহকে জড়িয়ে ধরে বললো।

নয়ীমের পীড়াপীড়িতে আব্দুল্লাহ চুপ করে গেলো।

এদিকে সাবেরার নামায শেষ হলো। মাতৃস্নেহ তিনি আর চেপে রাখতে পারছেন না। 'ওহ্! কী যালেম আমি!' নামায শেষ করেই তিনি গেলেন আস্তাবলের দিকে। নয়ীম মাকে আসতে দেখে পালালো না, বরং ছুটে গিয়ে তাঁর পা জড়িয়ে ধরে বলে উঠলো, 'আম্মি! ভাইয়ের কোনো কসুর নেই। আমিই 'উয'রাকে গভীর পানিতে নিয়ে গিয়েছিলাম। ভাই শুধু তাকে বাঁচাবার চেষ্টাই করেছে।'

সাবেরা খানিক্ষণ পেরেশান হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'আমারও সেই খেয়ালই ছিলো। আব্দুল্লাহ এদিকে এসো।' আব্দুল্লাহ উঠে এলে সাবেরা আদর করে কপোলে হাত বুলালেন। তারপর তার মাথাটা চেপে ধরলেন বুকের সাথে।

'নয়ীমকে আপনি মাফ করুন, আম্মি! আব্দুল্লাহ বললো।

সাবেরা নয়ীমের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেটা! কেন তুমি আগে দোষ স্বীকার করলে না?'

'আমি কি জানতাম ভাইকে আপনি সাজা দেবেন? নয়ীম জওয়াব দিলো। 'আচ্ছা, তুমি খানা তুলে নাও।' নয়ীম খানা তুলে নিলো। তারপর তিনজন গিয়ে প্রবেশ করলেন বড়ো কামরায়। তখনো কারুরই কিছু খাওয়া হয়নি, তাই তিনজন আবার একই জায়গায় খেতে বসলেন।

ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদীক্ষাই ছিলো সাবেরার যিন্দেগীর সকল আকর্ষণের কেন্দ্র। স্বামীর মৃত্যুর পর নারী জীবনের যে নিঃসংগতা অনুভূত হয়, তা সত্ত্বেও তাঁর জীর্ণ গৃহখানি একটি আড়ম্বরপূর্ণ শহরের চাইতে কম ছিল না।

রাতের বেলা তিনি যখন এশার নামায শেষ করে অবকাশ পেতেন, আব্দুল্লাহ, 'উযরা আর নয়ীম তখন তাঁর কাছে বসে জানাতো গল্প শোনার দাবী। সাবেরা তাদেরকে শোনাতেন কুফর ও ইসলামের গোড়ার দিকের যুদ্ধের কাহিনী, আর শোনাতেন রসূলে বরহক সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া-সাল্লামের যিন্দেগীর কিসসা।

ছেলেমেয়েদের নিরুদ্দেশ জীবন বয়ে চলেছে সাবলীল গতিতে। সাবেরার শিক্ষার গুণে তাদের দীলের মধ্যে সিপাহী সুলভ গুণের বিকাশ হচ্ছে দিনের পর দিন। আব্দুল্লাহ বয়সে যেমন বড়ো, 'নয়ীম ও উযরার তুলনায় তেমনি সে প্রশান্ত গম্ভীর। তেরো বছর বয়সে সে কুরআন পাক ও আরো কতগুলো ছোটখাটো কিতাব পড়ে শেষ করেছে। নয়ীম যেমন বয়সে ছোট, তেমনি খেলাধুলায় তার উৎসাহ বেশি; তাই পড়াশোনায় সে আব্দুল্লাহর পেছনে রয়েছে। তার চঞ্চল স্বভাব ও দুর্দান্তপনা তামাম লোকালয়ে মশহুর। উঁচু গাছে চড়তে সে পারে; তেমনি যতো দুর্দান্ত ঘোড়াই হোক না তার পিঠে সে সওয়ার হয়ে যায় অনায়াসে। ঘোড়ার নাংগা পিঠে চড়তে গিয়ে কতোবার সে পড়ে গিয়ে চোট পেয়েছে। প্রত্যেকবার সে উঠে এসেছে হাসিমুখে আর আগের চাইতেও বেশী সাহস নিয়ে মোকাবিলা করেছে বিপদের। এগারো বছরে পা দিতেই তামাম লোকালয়ে তার শাহ-সওয়ারী ও তীরন্দাযির আলোচনা শোনা যায়।

একদিন আব্দুল্লাহ সাবেরার সামনে বসে সবক শুনাচ্ছে। নয়ীম তখন তীর ধনুক হাতে নিয়ে বাড়ির ছাদের উপর দাঁড়িয়ে তাকাচ্ছিলো এদিক ওদিক। সাবেরা আওয়ায দিলেন 'নয়ীম, এসো এদিকে। আজ তুমি সবক শেখোনি কেন?'

'যাই আম্মি'।

সাবেরা আবার আব্দুল্লাহর দিকে মনোযোগ দিলেন। আচানক এক কাক উড়ে এলো সেদিকে। নয়ীম তীরের নিশানা করলো তখখুনি। কাকটি হুমড়ি খেয়ে এসে পড়লো সাবেরার কাছে। সাবেরা ঘাবড়ে গিয়ে তাকালেন উপরদিকে। নয়ীম ধনুক হাতে বিজয়গর্বে হাসছে। সাবেরা মুখের হাসি চাপা দিয়ে বললেন, 'বহুত নালায়েক হয়েছো তুমি!'

'আম্মি, ভাই আজ বলছিলো, আমি নাকি উড়ে যাওয়া পাখীর উপর নিশানা করতে পারি না।'

'ভারী বাহাদুর তো হয়েছো! এবার এসে সবক শোনাও।'

চৌদ্দ বছর বয়সে আব্দুল্লাহ দ্বীনী এলেম ও যুদ্ধ বিদ্যা শিখবার মতলবে বসরার এক মকতবে দাখিল হবার জন্য বিদায় নিয়ে চলে গেলো। উযরার দুনিয়ার অর্ধেকটা খুশী আর মায়ের মুহব্বত ভরা দীলের একটা টুকরা সে নিয়ে গেলো সাথে করে। আব্দুল্লাহ আর নয়ীম দু'জনের উপরই ছিল উযরার অন্তহীন মহব্বত কিন্তু দু'জনের মধ্যে কার উপর তার আকর্ষণ বেশি? তার নিষ্পাপ দীলের উপর কে বেশী দাগ কেটেছে? তার চোখ কাকে বারবার দেখবার জন্য বেকারার, আর কার আওয়ায তার কানের কাছে গুঞ্জন করে যায় সংগীত সুরের মতো?

প্রকাশ্যে উযরা নিজেও এ প্রশ্নের কোনো ফয়সালা করতে পারেনি। তার কাছে আব্দুল্লাহ ও নয়ীম একই দেহের দুটি ভিন্ন নাম। নয়ীমকে বাদ দিয়ে আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহকে বাদ দিয়ে নয়ীমের কল্পনাই তার কাছে অসম্ভব। সে কখনো তাঁর দীলের মধ্যে এদের দু'জনকে তুলনা করে দেখবার চেষ্টা করেনি। দু'জনাই যখন তার কাছে ছিলো, তখন তাদেরকে নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করবার প্রয়োজনই হয়নি কখনো। দু'জনের কেউ যখন হেসেছে, তখন সে তাতে শরীক হয়েছে। তারা গম্ভীর হলে সেও গম্ভীর হয়ে গেছে।

আব্দুল্লাহ বসরায় চলে যাবার পর এসব প্রশ্ন নিয়ে তার চিন্তা করবার মওকা মিললো। সে জানতো, নয়ীমও সেখানে চলে যাবে কিছুকাল পর। কিন্তু নয়ীমের বিচ্ছেদের চিন্তা তার কাছে আব্দুল্লাহর বিচ্ছেদের চাইতে আরো অসহনীয় মনে হতে লাগলো। আব্দুল্লাহ বয়সে বড়, তার প্রশান্ত গাম্ভীর্য উযরার দীলের মধ্যে মুহব্বতের সাথে শ্রদ্ধার সঞ্চারও করেছিলো। নয়ীমের মতো সেও তাকে ভাইজান বলে ডাকতো এবং তাকে বড় মনে করে তার কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতো, অবাধে মিশতে পারতো না। নয়ীমের প্রতিও তার শ্রদ্ধা কম ছিল না, কিন্তু তার সাথে অবাধ চলাফেরায় তাদের মধ্যে লজ্জার বাধন ছিলো না। তার দুনিয়ায় আব্দুল্লাহ ছিলো সূর্যের মতো, তার মুগ্ধকর দীপ্তি সত্ত্বেও যেনো তার দিকে তাকানো যায় না চোখ তুলে, তার কাছে যেতে যেনো ঘাবড়ে যায় মন। কিন্তু নয়ীমের প্রত্যেকটি কথা যেনো বেরিয়ে আসে তার নিজেরই মুখ থেকে। আব্দুল্লাহ চলে যাবার পর নয়ীমের চালচলনে এলো এক অদ্ভুত পরিবর্তন। আব্দুল্লাহর বিচ্ছেদ নয়ীমের মনে বেশী করে বাজবে, অথবা সেও একদিন বসরার মদ্রাসায় দাখিল হবার জন্য অধীর হয়ে রয়েছে, হয়তো এই চিন্তাই তাকে ছেলেবেলার চালচলন থেকে ফিরিয়ে পড়াশোনায় মেনোযোগী করে তুললো। একদিন সে সাবেরাকে শুধালো, আম্মি, আমায় কবে পাঠাবেন বসরায়?

মা জওয়াব দিলেন, বেটা, যতোক্ষণ তুমি গোড়ার দিকের শিক্ষা শেষ না করছো, ততোক্ষণ কি করে পাঠাবো? লোকে বলবে, আব্দুল্লাহর ভাই লেখাপড়া জানে না। ঘোড়ায় চড়া আর তীর চালানো ছাড়া জানে না কিছুই। এসব কথা আমি পছন্দ করি না।'

মায়ের কথাগুলো নয়ীমের স্পর্শকাতর দীলের উপর ছুরির মতো লাগলো। আঁসু সংবরণ করে সে বললোঃ আম্মি, কেউ আমায় জাহেল বলতে সাহস করবে না। এই বছরই আমি সবগুলো কিতাব শেষ করবো।'

সাবেরা আদর করে নয়ীমের মাথায় হাত রেখে বললেন, তোমার পক্ষে কিছুই মুশকিল হবে না বেটা! মুসিবৎ হচ্ছে, তুমি কিছু করতে চাও না।

'নিশ্চয়ই করবো আম্মি! আমার বিরুদ্ধে কোনো নালিশ থাকবে না আপনার।'

মাহে-রমযানের ছুটিতে আব্দুল্লাহ ঘরে ফিরে এলো। তার সারা গায়ে সিপাহীর লেবাস। লোকালয়ের ছেলেমেয়েরা তাকে দেখে হয়রান। তাকে দেখে নয়ীমের খুশীর অন্ত নেই। উযরা তাকে দূর থেকে দেখে মুষড়ে পড়ে লজ্জায়, সাবেরা বারবার চুমো খান তার পেশানীতে। নয়ীম প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে আব্দুল্লাহকে তার মাদ্রাসা সম্পর্কে। আব্দুল্লাহ তাকে বলে, সেখানে লেখাপড়ার চাইতে বেশী সময় লাগানো হয় নানারকম রণ-কৌশল শেখাতে। নেযাহবাযি, তেগ চালানো আর তীরন্দাযী শেখানো হয় তাদের মাদ্রাসায়। তীরন্দাযীর কথা শুনে নেচে ওঠে নয়ীমের দীল। ভাইজান! আমায়ও ওখানে নিয়ে চলুন।' অনুনয়ের স্বরে বলে নয়ীম। 'এখনো তুমি খুবই ছোট। ওখানকার সব ছেলেই তোমার চাইতে অনেক বড়। আরো কিছুকাল তোমায় অপেক্ষা করতে হবে।'

নয়ীম কতক্ষণ চুপ করে থেকে প্রশ্ন করলো, 'ভাইজান মাদ্রাসায় আপনি সব ছেলের চাইতে ভালো করছেন না?' আব্দুল্লাহ জওয়াব দিলো, 'না, বসরার একটি ছেলে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী। তার নাম মুহম্মদ বিন কাসিম। তীরন্দাযী আর নেযাহবাযিতে সে মাদ্রাসার সব ছেলের চাইতেই ভালো। তেগ চালানোয় আমরা দু'জন সমান। কখনো কখনো আমি তোমার কথা তাকে বলেছি। তোমার কথা শুনে সে খুব হাসে।'

'হাসে?' নয়ীম উত্তেজিত হয়ে বললো, 'আমি নিজে গিয়ে তাকে বলে দেবো যে, লোক আমার কথা শুনে হাসবে, তেমনটি আমি নই।'

আব্দুল্লাহ নয়ীমের রাগ দেখে তাকে বুকে চেপে ধরে খুশী করবার চেষ্টা করলো।

রাতের বেলায় আব্দুল্লাহ লেবাস বদল করে ঘুমালো। নয়ীম তার কাছে শুয়ে অনেকখানি রাত জেগে কাটালো। ঘুমিয়ে পড়লে সে স্বপ্নে দেখলো, যেনো সে বসরার মাদ্রাসার ছেলেদের সাথে তীরন্দাযিতে ব্যস্ত। ভোরে সে সবার আগে উঠলো। জলদি করে সে আব্দুল্লাহর উর্দী পরে গিয়ে উযরাকে জাগিয়ে বললো, 'দেখো তো উযরা, এ লেবাস আমায় কেমন মানায়?

উযরা উঠে বসলো। নয়ীমের মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে সে হেসে বললো, 'এ লেবাস বেশ মানিয়েছে তোমায়।'

'উযরা, আমিও ওখানে যাবো আর এই লেবাস পরে আসবো।'

উযরার মুখের উপর কেমন একটা উদাস ভাব ছেয়ে গেলো। 'তুমি কবে যাবে ওখানে?' সে প্রশ্ন করলো।

'উযরা, আম্মিজানের কাছ থেকে আমি শীগগিরই এজাযত নেবো।'

চার

৬৫ হিজরী থেকে শুরু করে ৭৫ হিজরী সাল পর্যন্ত যে সময়টা কেটে গেছে, তখনকার ইসলামী ইতিহাস এমন সব রক্ত-রাঙা ঘটনায় ভরপুর, যার আলোচনা করতে গিয়ে বিগত কয়েক শতাব্দীতে বহু অশ্রুপাত করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও আফসোস ও অশ্রুপাত ছাড়া তা স্মরণ করা যাবে না। যে তলোয়ার খোদার নামে নিষ্কোষিত

হয়েছিলো তা চলতে লাগলো তাদেরই গলায়, যারা খোদার নাম নিচ্ছে। মুসলমান যেমন দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে দুনিয়ার দিকে দিকে, তেমনি দ্রুতগতিতে এ বিপদের প্রসার ঘটলো তাদের মধ্যে। আশংকা হতে লাগলো, যেনো তেমনি দ্রুতবেগে দুনিয়ার সব দিক থেকে সংকুচিত হয়ে তারা সীমাবদ্ধ হবে আরব উপদ্বীপে। কুফা ও বসরা হয়েছিলো তখন নানারকম ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রভূমি। মুসলমান তাদের প্রারম্ভিক ঐতিহ্য ভুলে গিয়ে জিহাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তখন। তাদের সামনে স্বার্থপরতা ও লোভ চরিতার্থ করবার সংগ্রাম এবং ন্যায়-অন্যায় নির্বিশেষে যে কোনো ব্যাপারে কলহ সৃষ্টি ব্যতীত আর কোন দৃষ্টিভংগী ছিলোনা। তখনকার পরিস্থিতিতে এক লৌহ-কঠিন হস্তের প্রয়োজন ছিলো মুসলমানদের এক কেন্দ্রে ঐক্যবদ্ধ করবার জন্য।

আরব মরুতে হলো এক অগ্নিগিরির উদগীরণ এবং আরব-আযমের ধুমায়মান বিদ্রোহের আগুন সেই অগ্নিগিরির ভয়াবহ শিখার মোকাবিলায় এসে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। এই অগ্নিগিরি এক বিরাট ব্যক্তিত্ব—হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। প্রচণ্ড শক্তিমান হাজ্জাজ, বেরহম যালিম হাজ্জাজ। কিন্তু কুদরৎ আরব মরুর অভ্যন্তরীণ যুদ্ধবিগ্রহ খতম করে দিয়ে মুসলমানদের দ্রুতগামী বিজয় অশ্বের গতি পূর্ব ও পশ্চিমের লড়াইয়ের ময়দানের দিকে চালিত করবার মহাকর্তব্য ন্যস্ত করেছিলেন এই মানুষটির উপর।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে যেমন বলা যায় মুসলমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু, তেমনি বলা যায় নিকৃষ্ঠতম দুশমন। সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু বলা যায় এই কারণে যে, তিনিই এক শান্তিপূর্ণ আবহওয়া পয়দা করে মুসলিম বিজয় বাহিনীর অগ্রগতির জন্য খুলে দিয়েছিলেন তিনটি যবরদস্ত রাস্তা। এক পথ দিয়ে মুসলিম ফউজ এগিয়ে গেলো ফারগানা ও কাশগড় পর্যন্ত, দ্বিতীয় পথে মুসলমানদের সৌভাগ্য অশ্ব পৌঁছে গেলো মারাকেশ, স্পেন ও ফ্রান্সের সীমান্তে এবং তৃতীয় পথ ধরে মুহম্মদ বিন কাসিমের মুষ্টিমেয় সেনাবাহিনী পৌঁছে সিন্ধুর উপকূল ভূমিতে।

নিকৃষ্টতম দুশমন বলার কারণ, তাঁর যে খুন-পিয়াসী তলোয়ার উন্মুক্ত হতো অনিষ্টকারী ও উচ্ছৃংখল লোকদের দমিত করবার জন্য, কখনো কখনো তা সীমা ছাড়িয়ে নিষ্পাপ মানুষের গর্দান পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছতো। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের হাত যদি মযলুমের খুনে রেঙে না উঠতো, তাহলে ইতিহাসে সে যামানার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ হিসেবে তার স্বীকৃতি না পাবার কোনো কারণই থাকতো না। তিনি ছিলেন এমন এক ঘূর্ণিবাত্যার মতো, যা কাটা-ঝাড়ের সাথে সাথে ইসলামের গুলশান থেকে অসংখ্য সুরভী ফুল ও সবুজ শাখাও নিয়েছে উড়িয়ে।

হাজ্জাজের শাসনকালে একদিক ছিলো অন্তহীন বিভীষিকাপূর্ণ; আরেকদিকে ছিলো অন্তহীন দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। তিনি ছিলেন এমন এক ঝড়ের মতো যা সবুজ বৃক্ষরাজিকে সমূলে উৎপাটন করে, করে ভূপাতিত, কিন্তু তার কোলে লুকানো মেঘরাজি বারিবর্ষণ করে প্রাণময় সবুজ ও ফলপুষ্পে শোভিত করে দেয় হাজারো শুষ্ক বাগিচাকে।

আরব মরুভূমির গৃহবিবাদের অবসান হলো হিজরী ৭৫ সালে। মুসলমান আবার জেগে উঠলো এক হাতে কুরআন ও অপর হাতে তলোয়ার নিয়ে। তখনকার যামানায় হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নামের সাথেই উঠতো যায়েদ বিন আমেরের নাম। যায়েদ বিন

আমেরের বয়স তখন আশি বছর। ইরানে খসরুর এবং শাম ও ফিলিস্তীনে সীজারের সালতানাত পয়মাল করেছিলো যে শাহসওয়ার বাহিনী, যৌবনে তিনি ছিলেন তাদের সংগী। বার্ধক্যে যখন তার আর তলোয়ার ধরবার ক্ষমতা নেই, তখন ইরানের এক সুবায় তিনি হলেন কাযী। আরবে যখন বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়েছে, তখন ইবনে আমের গিয়ে পৌছলেন কুফায়। তিনি তবলীগ করে সেখানকার অবস্থার পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তার আওয়ায হলো নিস্ফল।

কুফার লোকদের ঔদাসীন্য লক্ষ্য করে ইবনে আমের গেলেন বসরায়। সেখানকার অবস্থাও কুফা থেকে স্বতন্ত্র ছিলো না। ধনী ও দুস্কৃতিকারীরা তার দিকে আমলও দিলো না। নওজোয়ান ও বুড়োদের দিক থেকে হতাশ হয়ে ইবনে আমের তার তামাম উম্মীদ ন্যস্ত করলেন ছোট্ট ছেলেমেয়েদের উপর। তার সবটুকু চেষ্টা, সবটুকু মনোযোগ তিনি নিয়োগ করলেন তাদের শিক্ষাদীক্ষায়। শহরের বাইরে তিনি কায়েম করলেন একটি মাদ্রাসার বুনিয়াদ। বসরায় শান্তি ফিরে এলে সেখানকার বিশিষ্ট লোকেরা ইবনে আমেরকে উৎসাহিত করলেন। মাদ্রাসায় শুধু দ্বীনী কিতাবপত্রই পড়ানো হতো না, তাছাড়া আরো শেখানো হতো যুদ্ধ বিদ্যা। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তার এ নিঃস্বার্থ খিদমতে মুগ্ধ হয়ে মাদ্রাসার তামাম ব্যয়ভার নিলেন নিজের যিম্মায়। ছাত্রদের রণকৌশল, শাহসওয়ারী প্রভৃতি শিখাবার জন্য উত্তম জাতের ঘোড়া আর নতুন নতুন অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবস্থা হলো এবং ঘোড়ার জন্য তিনি মকতবের কাছেই তৈরী করে দিলেন এক শানদার আস্তাবল।

প্রতি সন্ধ্যায় ছাত্ররা এসে জমা হতো এক প্রশস্ত ময়দানে। সেখানে তাদেরকে ফউজী শিক্ষা দেওয়া হতো হাতে-কলমে। শহরের লোক সন্ধ্যা বেলায় সেই ময়দানের আশেপাশে জমা হয়ে দেখতো ছাত্রদের তেগ চালনা, নেযাহবাযি ও শাহসওয়ারীর নতুন নতুন কায়দা।

মাদ্রাসার সুখ্যাতি শুনে সাঈদ সাবেরাকে চিঠি লিখে পরামর্শ দিলেন আব্দুল্লাহকে সেখানে পাঠাতে। এই নতুন পরিবেশে এসে আব্দুল্লাহর তরক্কী হতে লাগলো দ্রুতগতিতে। তার তরক্কী দেখে তার সহপাঠিদের মনে জাগতো ঈর্ষা। রণকৌশল শিক্ষায়ও সে অধিকার করলো একটি বিশেষ স্থান।

আব্দুল্লাহ বসরায় আসার দু'বছরের মধ্যে পরিচিত হয়ে গেলো সেখানকার ছেলেবুড়ো সবারই কাছে। এই প্রতিভাবান শাগরেদের কৃতিত্ব অজানা ছিলো না ইবনে আমেরের।

একদিন দুপুর বেলা এক কিশোর ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এসে ঢুকলো শহরে। আগন্তুকের এক হাতে নেযাহ, অপর হাতে ঘোরার লাগাম। কোমরে ঝুলানো একখানা তলোয়ার। গলায় হেমায়েল ও পিঠে ঝুলানো তূণীর। ধনুক বাঁধা রয়েছে ঘোড়ার যিনের পেছন দিকে। তার তলোয়ার দেহের উচ্চতা অনুপাতে অনেকটা বড়। কিশোর ঘোড়ার

পিঠে বসে রয়েছে মযবুত হয়ে। প্রত্যেক পথচারী ফিরি ফিরে তাকাচ্ছে তার দিকে। কেউ তাকে দেখে মৃদু হাসছে, আর কেউ বা হো হো করে। তার সমবয়সী ছেলেরা তামাশা দেখতে জমা হচ্ছে তার আশে পাশে। কিছু সময়ের মধ্যেই তার আগে পিছে এসে জমলো বিস্তর লোক। আগে বারবার ও পিছু হটবার রাস্তা তারা বন্ধ করে দাঁড়ালো। একটি ছেলে তার দিকে ইশারা করে চীৎকার করে উঠলো 'বদ্দু' বলে। আর সবাই তার সাথে চীৎকার করে উঠলো সমস্বরে। অপর একটি বালক তার দিকে কাঁকর ছুঁড়লো। অমনি আর সব ছেলেরাও শুরু করলো কাঁকর ছুঁড়তে। দলের সরদার ছেলেটি এগিয়ে এসে ছিনিয়ে নিতে চাইলো তার নেযাহ, কিন্তু আগন্তুক নেযাহ ধরে রাখলো মজবুত হাতে। সে ঘোড়ার লাগাম টেনে দ্রুত ঘোড়া চালালো। ঘোড়া ছুটবার উপক্রম করলে এদিক-ওদিক ছুটতে লাগলো ছেলেগুলো। আগন্তুক নেযাহ উদ্যত করে দলের সরদারের পেছনে লাগিয়ে দিলো তার ঘোড়া। ভয় পেয়ে সে ছুটে পালালো। আগন্তুক হালকা গতিতে চললো তার পিছু পিছু। বাকী ছেলেরা ছুটে আসছে পিছু পিছু। মজার কাণ্ড দেখে কতক বয়স্ক লোকও এসে শামিল হয়েছে ছেলের দলে। আগের ছেলেটির পা একটা কিছুতে লাগলো, অমনি সে পড়ে গেলো উপুড় হয়ে। আগন্তুক ঘোড়ার লাগাম টেনে পেছনের ছেলেদের দিকে ফিরে তাকালো এবং কয়েক কদম দূরে দাঁড়িয়ে গেলো। মালিক বিন ইউসুফ নামে একটি মধ্যবয়সী লোক এগিয়ে এলো দলের ভেতর থেকে। লোকটি বেঁটে, সুগঠিত দেহ। মাথায় মস্ত এক আমামা। তাঁর সামনের দাঁতগুলো খানিকটা উঁচু হয়ে বেরিয়ে আছে, যেনো সে হাসছে। সামনে এগিয়ে এসে সে আগন্তুককে প্রশ্ন করলো, 'কে তুমি?

'মুজাহিদ।' কিশোর সদর্পে জওয়াব দিলো।

'বেশ ভালো নাম তো! তুমি বেশ বাহাদুর।'

'আমার নাম নয়ীম।'

'তাহলো তোমার নাম মুজাহিদ নয়?'

'না আমার নাম নয়ীম।'

'তুমি কোথায় যাবে?' মালিক প্রশ্ন করলো।

'ইবনে আমেরের মকতবে। আমার ভাই ওখানে পড়ে।'

'তারা এখন আখড়ায়। চলো, আমিও যাচ্ছি ওখানে।'

নয়ীম মালিকের সাথে চললো। কয়েকটা ছেলে কিছুদূর সাথে এসে ফিরে গেলো। কতকগুলো ছেলে নয়ীমের পেছনে চললো।

নয়ীম তার সাথীকে শুধালো, আখড়ায় তীরন্দাযীও হয় তো?'

'হাঁ, তুমি তীর চালাতে জানো?'

'হাঁ। উড়ন্ত পাখীকে ফেলে দিতে পারি আমি।'

মালিক পিছু ফিরে নয়ীমের দিকে তাকালো। নয়ীমের চোখ দুটো তখন খুশীতে জলজল করছে।

আখড়ায় বহুলোক আলাদা আলাদা দলে দাঁড়িয়ে শিক্ষার্থীদের তীরন্দাযী, তেগ চালনা ও নেযাহবাযি দেখছে। মালিক সেখানে পৌছে নয়ীমকে বললো, 'তোমার ভাই

এখানেই আছে হয়তো। খেলা শেষ হবার আগে তার দেখা পাবে না তুমি। আপাততঃ এসব তামাশা দেখতে থাক।'

নয়ীম বললো, 'আমি তীরন্দাযী দেখবো।'

মালিক তাকে তীরন্দাযদের আখড়ার দিকে নিয়ে গেলো। তামাশা দেখতে যারা দাঁড়িয়েছে, তারা দু'জন গিয়ে তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেলো।

আখড়ার এক কোণে লাগানো রয়েছে একটা কাষ্ঠফলক। তার মাঝখানে একটা কালো নিশানা। ছেলেরা পালা করে তার উপর তীর ছুঁড়ছে। তীরন্দাযদের কাছ থেকেও শ'খানেক গজ দূরে এই কাষ্ঠফলক। নয়ীম বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখলো। বেশির ভাগ তীর গিয়ে লাগছে কাষ্ঠফলকে, কিন্তু একজন ছাড়া আর কারুর তীরই কালো নিশানায় লাগলো না।

নয়ীম মালিককে সুধালো, 'লোকটি কে? এর নিশানা তো ভারী চমৎকার!'

'উনি হচ্ছেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ভাতিজা মুহম্মদ বিন কাসিম। মালিক জওয়াব দিলো।'

'মুহম্মদ বিন কাসিম!'

'হাঁ, তুমি ওঁকে জানো?'

'হাঁ, উনি আমার ভাইয়ের দোস্ত। ভাই ওঁর নিশানার বহুত তারিফ করেছেন। কিন্তু এ নিশানায় তো মুশকিল নেই কিছু।'

'মুশকিল আবার কোথায়? হয়তো আমিও লাগাতে পারবো এ নিশানা। দেখি, তোমার ধনুকটা দাও তো। হাজ্জাজের ভাতিজা ভাবছেন দুনিয়ায় বুঝি আর তীরন্দায নেই।'

বলতে বলতে সে নয়ীমের ঘোড়ার যিন থেকে ধনুকটা খুলে নিলো। নয়ীম তূণীর থেকে একটা তীর দিলো তার হাতে। মালিক এক কদম এগিয়ে গিয়ে নিশানা করলো। লোকগুলো তাকে দেখে হাসতে লাগলো। মালিকের কাঁপা হাতের তীর লক্ষ্যস্থল থেকে কয়েক কদম দূরে মাটিতে গেঁথে রইলো। দর্শকদের তুমুল অট্টহাস্য শোনা গেলো। মালিক লজ্জিত হলো। মুহম্মদ বিন কাসিম হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে তীরটি যমিন থেকে তুলে মালিকের হাতে দিয়ে বললেন, 'আপনি আরেকবার চেষ্টা করুন।'

মালিক ততোক্ষণে ঘেমে গেছে। সে মুহম্মদ বিন কাসিমের হাত থেকে তীরটি নিয়ে নয়ীমকে এগিয়ে দিল। এবার দর্শকদের নযর পড়লো নয়ীমের উপর। তারা একে একে নয়ীমের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। মুহম্মদ বিন কাসিম স্বভাবসুলভ হাসিমুখে নয়ীমের কাছে এসে বললেন, 'আপনিও একবার দেখুন।' দর্শকরা হেসে উঠলো!

তার এ বিদ্রূপ ও দর্শকদের হাসি নয়ীমের বরদাশত হলো না। সে ঝট করে তার নেযাহ নীচে গেড়ে রাখলো এবং ধনুকে তীর যোজনা করে ছুঁড়লো। তীর লক্ষ্যস্থলে গিয়ে নিশানার মাঝখানে লেগে গেলো। মুহূর্ত মধ্যে জনতা নির্বাক হয়ে গেলো এবং পরক্ষণেই জেগে উঠলো এক তুমুল আনন্দধ্বনি।

নয়ীম আর একটি তীর বের করলো তূণীর থেকে। তামাম লোক নিজ নিজ জায়গা ছেড়ে তার চারিদিকে জমা হলো। দ্বিতীয় তীরটিও লাগলো ঠিক লক্ষ্যস্থলে। চারদিক

থেকে 'মারহাবা' 'মারহাবা' ধ্বনি উঠলো। নয়ীম একবার দৃষ্টি হানলো সমবেত জনতার দিকে। সবারই সপ্রশংস দৃষ্টি নিবদ্ধ তার দিকে। মুহম্মদ বিন কাসিম হাসিমুখে এগিয়ে এসে নয়ীমের হাত নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরে বললেন, 'আপনার নাম কি?

'আমায় নয়ীম বলে সবাই জানে।'

'নয়ীম? নয়ীম বিন ...?'

'নয়ীম বিন আব্দুর রহমান।'

'আব্দুল্লাহর ভাই তুমি?'

'জি হাঁ।'

'এখানে কবে এলে?'

'এইমাত্র।'

'আব্দুল্লাহর সাথে দেখা হয়েছে?'

'এখনো হয়নি।'

'তোমার ভাই হয়তো নেযাহবাযি অথবা তলোয়ার চালানোর অভ্যাস করছে। তুমি তলোয়ার চালাতে জানো?'

'আমাদের এলাকার একটি লোকের কাছে আমি শিখেছিলাম।'

'তোমার তীরন্দাযী দেখে আমার মনে হয়েছে, তলোয়ার চালাতেও তুমি ভালোই শিখেছো। আজ একটি ছেলের সাথে তোমার মোকাবিলা হবে।'

মোকাবিলার নাম শুনেই নয়ীমের শিরায় যেনো রক্তের গতি দ্রুততর হয়ে উঠলো। সে প্রশ্ন করলো, 'ছেলেটি কতো বড়ো?'

'তোমার চাইতে খুব বেশী বড়ো নয়। বুঝে-সুঝে কাজ করলে জিতে যাওয়া তোমার পক্ষে কষ্টকর হবে না। হাঁ, তোমার তলোয়ারটা খানিকটা ভারী। বর্মটাও অনেকটা ঢিলে। আমি এখ্‌খুনি তার ইনতেযাম করছি। তুমি ঘোড়া থেকে নেবে এসো।'

মুহম্মদ বিন কাসিম একটি লোককে বললেন তাঁর বর্ম, লোহার টুপি ও তলোয়ার নিয়ে আসতে।

খানিকক্ষণ পর নয়ীম এক নতুন বর্ম পরিধান করে, হাতে একখানা হালকা তলোয়ার নিয়ে দর্শকদের কাতারে দাঁড়িয়ে দেখছে আমেরের শাগরেদদের তেগ চালনার কৌশল। তার মাথায় ইউনানী ধরনের টুপি তার মুখ ঢেকে দিয়েছিলো চিবুক পর্যন্ত। তাই যারা তার তীরন্দাযী দেখে তার সাথে এসেছিলো, তারা ছাড়া কেউ জানতেই পারেনি যে, সে এক আগন্তুক।

ইবনে আমের দর্শকদের ভিড় থেকে দূরে ময়দানের মাঝে দাঁড়িয়ে শাগরেদদের হেদায়াত দিচ্ছেন। একটি বালকের মোকাবিলা করবার জন্য পর পর কয়েকটি বালক এসে নামলো ময়দানে কিন্তু কেউ দাঁড়াতে পারলো না তার সামনে। প্রত্যেকটি প্রতিদ্বন্দ্বীকে সে হারিয়ে দিলো কোনো না কোনো রকমে। অবশেষে ইবনে আমের মুহম্মদ বিন কাসিমের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মুহম্মদ! তুমি তৈরী হওনি?'

মুহম্মদ বিন কাসিম এগিয়ে এসে ইবনে আমেরকে চাপা গলায় কি যেনো বললেন।

ইবনে আমের হাসতে হাসতে নয়ীমের দিকে তাকালেন। আদর করে তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'তুমি আব্দুল্লাহর ভাই?'

'জি হাঁ।'

'এই ছেলেটির সাথে মোকাবিলা করবে?'

'জি, আমার তেমন বেশি অভ্যাস নেই। তাছাড়া এতো আমার চাইতে বড়োও বটে।'

'কোনো ক্ষতি নেই তাতে।'

'কিন্তু আমার ভাই কোথায়?'

'সেও এখানেই আছে। তার সাথে তোমার দেখা করিয়ে দেবো। আগে এর সাথে মোকাবিলা করে দেখাও।'

নয়ীম দ্বিধাকুণ্ঠিত পদে ময়দানে নামলো। দর্শকরা এতক্ষণে নীরবতা ভেঙে কথা বলতে শুরু করলো।

দুই তলোয়ারের ঠোকাঠুকি শুরু হলো। ধীরে ধীরে তীব্রতর হয়ে উঠতে লাগলো তলোয়ারের ঝংকার। নয়ীমের প্রতিদ্বন্দ্বী খানিকক্ষণ তাকে ছোট বালক মনে করে শুধু ঠেকাতে লাগলো তার হামলা, কিন্তু নয়ীম আচানক পায়তারা বদলে তার উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করলো। বালকটি তার অপ্রত্যাশিত হামলা ঠেকাতে পারলো না যথাসময়ে। নয়ীমের তলোয়ার তার তলোয়ারের উপর দিয়ে পিছলে গিয়ে লাগলো তার লোহার টুপিতে। দর্শকরা প্রশংসাসূচক ধ্বনি তুললো।

নয়ীমের প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে ব্যাপার বিলকুল নতুন। রাগে ফুঁসে উঠে সে কয়েকবার আক্রমণ চালালো তীব্রতার সাথে এবং নয়ীমকে পিছন দিকে হটাতে লাগলো। কয়েক কদম হটে যাবার পর নয়ীমের পা কেঁপে গেলে সে চিৎ হয়ে পড়ে গেলো।

নয়ীমের প্রতিদ্বন্দ্বী বিজয়-গর্বে তলোয়ার নীচু করে তার উঠে আসার ইনতেযার করতে লোগলো।

নয়ীম রাগে লাল হয়ে উঠে এলো এবং তেগ চালনার যাবতীয় নীতি উপেক্ষা করে অন্তহীন গতি ও বেগ সহকারে হামলা চালালো তার উপর। নয়ীমকে সিপাহীসুলভ রীতির বাইরে যেতে দেখে সে পুরো তাকৎ দিয়ে তলোয়ার ঘুরিয়ে হামলা করলো তার উপর। নয়ীম তার তলোয়ার দিয়ে এই হামলা প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করলো, কিন্তু তলোয়ার তার হাত থেকে কয়েক কদম দূরে ছিটকে পড়লো। নয়ীম পেরেশান হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো। মুহাম্মদ বিন কাসিম ও ইবনে আমের হাসিমুখে এগিয়ে এলেন। ইবনে আমের এক হাত শাগরেদের ও অপর হাত নয়ীমের কাঁধে রেখে নয়ীমকে বললেন, 'এসো, এবার তোমার ভাইয়ের সাথে দেখা করিয়ে দিচ্ছি।'

'জি হাঁ, ভাই কোথায়?'

ইবনে আমের দ্বিতীয় বালকটির লোহার টুপিটা নামাতে নামাতে বললেন, 'এদিকে তাকাও।'

নয়ীম ভাইজান বলে আব্দুল্লাহকে জড়িয়ে ধরলো। আব্দুল্লাহর অন্তহীন পেরেশানী লক্ষ্য করে মুহাম্মদ বিন কাসিম নয়ীমের টুপিটাও খুলে ফেলে বললেন, 'আব্দুল্লাহ! এ নয়ীম। হায়! এ যদি আমার ভাই হতো!'

ইবনে আমেরের মতো দক্ষ ওসতাদের যত্নে সাবেরার পুত্রদের আত্মিক, দৈহিক ও বুদ্ধিবৃত্তিসংক্রান্ত তরক্কী হতে লাগলো অসাধারণ দ্রুতগতিতে। মকতবে আব্দুল্লাহর নাম ছিলো সবার আগে, কিন্তু আখড়ায় নয়ীমের স্থান ছিলো সবার পুরোভাগে। মুহাম্মদ বিন কাসিম কখনো আখড়ায় আসতেন এবং তার কোন কোন যোগ্যতার স্বীকৃতি দিতে হতো নয়ীমকে।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের তেগ চালনার যোগ্যতা ছিলো সবচাইতে বেশী। নেযাহবাযিতে দু'জনের ছিলো সমান দক্ষতা। নয়ীম শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার ছিলো তীরন্দাযীতে। প্রতিক্ষেত্রে সম্মানের অধিকারী হবার মতো গুণরাজি ছেলেবেলা থেকেই বিকাশ লাভ করেছিলো মুহম্মদ বিন কাসিমের মধ্যে। একটা বড়ো কিছু করবার জন্য তিনি পয়দা হয়েছেন বলে তাঁকে তারিফ করতেন ইবনে আমের।

আব্দুল্লাহ ও নয়ীমের সাথে মুহম্মদ বিন কাসিমের দোস্তির সম্পর্ক মযবুত হতে লাগলো ক্রমাগত। বাইরে মুহম্মদ বিন কাসিমের নযরে তারা দু'জন ছিলো সমান; কিন্তু নয়ীম যে তাঁর বেশী নিকটতর, এ কথা আব্দুল্লাহ নিজে অনুভব করতো। নয়ীমের মকতবে দাখিল হবার পর আট মাস অতীত হলে মুহম্মদ বিন কাসিম শিক্ষা সমাপ্তির পর ফউজে শামিল হলেন।

মুহম্মদ বিন কাসিম চলে যাবার পর নয়ীমের আর একটি গুণের বিকাশ হতে লাগলো মকতবে। মাদ্রাসার ছেলেরা হফতায় একবার করে কোনো না কোনো বিষয় নিয়ে বিতর্ক সভা করতো নিয়মিত। বিষয়টি নির্ধারণ করে দিতেন ইবনে আমের নিজে। ভাইয়ের দেখাদেখি নয়ীমও এক বিতর্ক সভায় শরীক হলো। কিন্তু প্রথম বিতর্কে সে কয়েকটা ভাঙা কথা বলে ঘাবড়ে গেলো এবং সলজ্জভাবে মিম্বর থেকে নেমে এলে ছেলেরা বিদ্রূপ করলে ইবনে আমের সান্ত্বনা দিলেন তাকে, কিন্তু সারাদিনে তার বিষণ্ণতা কাটলো না। রাতের বেলা সে বারবার পাশ ফিরতে থাকলো ঘুম হারা চোখে। ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠে সে চলে গেলো বাইরে। দুপুর পর্যন্ত এক খেজুর গাছের ছায়ায় বসে সে বারংবার পুনরাবৃত্তি করতে লাগলো তার বক্তৃতা। পরের হফতায় সে আবার গিয়ে হাযির হলো বিতর্ক সভায়। এবার সে এক তেজোময় বক্তৃতা করে অবাক করে দিলো শ্রোতৃবর্গকে। তার দ্বিধাসংকোচ কাটতে লাগলো ক্রমাগত এবং এর পর থেকে সে নিয়মিত শরীক হতে লাগলো প্রত্যেকটি বিতর্কের মজলিসে। বেশির ভাগ বিতর্কে আব্দুল্লাহ ও নয়ীম দু'জনই যোগ দিতো। এক ভাই বিষয়ের সমর্থনে বক্তৃতা করলে অপর ভাই তার বিরোধিতা করতো। শহরের যেসব লোক ছিলো তাদের গুণগ্রাহী, তারা এবার তাদের বক্তৃতা শুনেও আনন্দ পেতে লাগলো। ইবনে আমের নয়ীমের শিরায় শিরায়

কেবল সিপাহীর উষ্ণ রক্তধারাই লক্ষ্য করেননি, বরং তার দীল ও দেমাগে দেখেছেন এক অসামান্য বক্তার উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি। তার এ যোগ্যতার পূর্ণ বিকাশের জন্য তিনি চেষ্টা করতেন যথাসাধ্য। কয়েকটি বক্তৃতার পর সে কেবল মাদ্রাসার শ্রেষ্ঠ বক্তা বলেই স্বীকৃতি পেলো না, বরং বসরার অলিগলিতে শোনা যেতে লাগলো তার চিত্তাকর্ষক বক্তৃতার তারিফ।

ইবনে আমেরের শাগরেদদের সংখ্যা বেড়ে চললো দিনের পর দিন, কিন্তু তাঁর উচ্চাকাংখার পূর্ণতার পথে অন্তরায় হলো বার্ধক্য ও স্বাস্থ্যহীনতা। বসরার ওয়ালীর কাছে তিনি দরখাস্ত করলেন মাদ্রাসার জন্য একজন অভিজ্ঞ ওসতাদের প্রয়োজন জানিয়ে। সাঈদ তখন সাইপ্রাসের ওয়ালী; বসরার ওয়ালী তাঁর চাইতে যোগ্য আর কোন লোককে খুঁজে পেলেন না এ কাজের জন্য। হাজ্জাজ খলীফার দরবারে দরখাস্ত করলে সাঈদকে অবিলম্বে বসরায় পৌছবার হুকুম দেওয়া হলো।

এক নতুন ওস্তাদ আসছেন, এ খবর নয়ীম ও আব্দুল্লাহর অজানা ছিলো না, কিন্তু তাদের মামুই যে ওস্তাদ হয়ে আসছেন, তা তারা জানতো না। সাইপ্রাসের এক নওমুসলিম পরিবারের মেয়ের সাথে শাদী হয়েছে সাঈদের। বিবিকে সাথে নিয়ে প্রথমে তিনি গেলেন সাবেরার কাছে। তারপর কয়েকদিন সেখানে থেকে চলে এলেন বসরায়। মকতবে এসে তিনি কাজ শুরু করে দিলেন পূর্ণোদ্যোমে। তাঁর ভাগ্নেরাই তার সেরা ছাত্র জেনে তিনি অন্তহীন আনন্দ অনুভব করলেন।

কয়েক মাস পরে আব্দুল্লাহ ও তার জামা'আতের আরো কয়েকটি নওজোয়ান শিক্ষা সমাপ্ত করলো। তাদের বিদায় উপলক্ষে ইবনে আমের যথারীতি এক বিদায় সভা ডাকলেন। বসরার ওয়ালী হাযির থাকলেন সে জলসায়। বিদায়ী ছাত্রদেরকে দরবারে-খিলাফতের তরফ থেকে বিতরণ করা হলো ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র।

ইবনে আমের তাঁর বিদায় সম্ভাষণে বললেন, 'নওজোয়ান দল! আজ এক কঠোর বিপদসংকুল দুনিয়ায় পা বাড়াবার সময় এসেছে তোমাদের সামনে। আমি আশা করছি যে, আমার মেহনত ব্যর্থ হয়নি, প্রমাণ করবার জন্য তোমরা প্রত্যেকে চেষ্টা করবে। যে সব কথা তোমাদেরকে বহুবার বলেছি, তা আবার নতুন করে বলবার প্রয়োজন নেই। মাত্র কয়েকটি কথার পুনরাবৃত্তি আমি করবো। নওজোয়ানরা! যিন্দেগী হচ্ছে এক ধারাবাহিক জিহাদ এবং মুসলমানের যিন্দেগীর পবিত্রতম কাজ হচ্ছে তার পরওয়ারদেগারের মুহাব্বতে জান পর্যন্ত বিসর্জন দিতে তৈরী থাকা এবং তোমাদের দীল সেই পবিত্র মনোভাবে পরিপূর্ণ থাকবে। তোমাদের সামনে যেনো দুনিয়া ও আখেরাত দুই-ই থাকে উজ্জ্বল হয়ে। দুনিয়ায় তোমরা সম্মানিত হয়ে শির উঁচু করে চলবে এবং আখেরাতে তোমাদের জন্য জান্নাতের দরযা থাকবে খোলা। মনে রেখো, এই পবিত্র মনোভাব থেকে বঞ্চিত হলে দুনিয়ায় কোনো স্থান থাকবে না তোমাদের এবং আখেরাতও হবে তোমাদের চোখে অন্ধকার। কমযোরী তোমাদেরকে এমন করে

আকড়ে ধরবে যে, হাত-পা নাড়াবার শক্তিও থাকবে না তোমাদের। কুফরের যেসব শক্তি মুজাহিদের পথে ধূলিকণার মতো উড়ে গেছে, তাই আবার তোমাদের সামনে দেখা দেবে মযবুত পাহাড় হয়ে। দুনিয়ার কূটকৌশলী জাতিসমূহ তোমাদের উপর হবে বিজয়ী এবং তোমাদেরকে বানাবে তাদের গোলাম। এমন সব নির্মম বিধানের আবর্তে জড়িয়ে পড়বে তোমরা যা থেকে নাজাত পাওয়া হবে অসম্ভব। তখনো তোমরা নিজেকে মুসলমান বলেই দাবী করবে, কিন্তু ইসলাম থেকে তোমরা থাকবে বহুদূর। সত্যের উপর ঈমান এনেও যদি তোমাদের মধ্যে সত্যের জন্যে কোরবানী দেবার আকাংখা পয়দা না হয়, তা হলে বুঝবে যে, তোমাদের ঈমান কমযোর। ঈমানের দৃঢ়তার জন্য আগুন ও খুনের দরিয়া অতিক্রম করে চলা অপরিহার্য। মওত যখন তোমাদের চোখে যিন্দেগীর চাইতে প্রিয়তর, তখন বুঝবে যে, তুমি যিন্দাহ-দীল, আর মওতের ভয় যখন তোমার শাহাদাৎ স্পৃহার উপর হবে বিজয়ী, তখন তোমার অবস্থা হবে এমন এক মুরদার মতো, যে কবরে থেকে হাত-পা ছুঁড়ছে শ্বাস নেবার জন্য।'

ইবনে আমের বক্তৃতার মাঝখানে এক হাতে কুরআন উর্ধ্বে তুলে বললেন: 'এ আমানত রসূলে মাদানী (সঃ)-এর উপর খোদায়ে কুদ্দুসের তরফ থেকে নাযিল হয়েছে এবং দুনিয়ায় তিনি তাঁর কর্তব্য সমাপন করে এ আমানত আমাদের হাতে সোপর্দ করে গেছেন। হুযূর (সঃ) আপন যিন্দেগীতে প্রমাণ করে গেছেন যে, তলোয়ারের তেযী ও বাযুর কুওৎ ব্যতীত আমরা এ আমানতের হেফাযত করতে পারবো না। যে পয়গাম তোমাদের কাছে পৌছে গেছে, তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে তা দুনিয়ার প্রতি কোণে পৌছে দেয়া।'

ইবনে আমের তার বক্তৃতা শেষ করে বসলেন। তারপর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বিস্তারিতভাবে জিহাদের গুরুত্ব বর্ণনা করে নিজের জেব থেকে একটা চিঠি বের করে বললেন, এ চিঠি মরভের গভর্নরের কাছ থেকে এসেছে। তিনি জৈহুন নদী পার হয়ে তুর্কিস্তানের উপর হামলা করতে চাচ্ছেন। এ চিঠিতে তিনি প্রচুর সংখ্যক ফউজ পাঠাবার দাবী জানিয়েছেন। আপাততঃ কয়েকদিনের মধ্যে আমি বসরা থেকে দু'হাজার সিপাহী পাঠাতে চাচ্ছি। তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে এই ফউজে শরীক হতে রাযী?

ছাত্রদের সবাই তার কথা শুনে হাত উঁচু করে সম্মতি জানালো।

হাজ্জাজ বললেন, আমি তোমাদের জিহাদী মনোভাবের প্রশংসা করি, কিন্তু যারা শিক্ষা সমাপ্ত করেছে, বর্তমান মুহূর্তে আমি কেবল তাদেরকেই দাওয়াত দেবো। এ ফউজের নেতৃত্ব আমি এই মাদ্রাসারই একটি যোগ্য শিক্ষার্থীর উপর সোপর্দ করতে চাই। আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান সম্পর্কে আমি অনেক কিছুই শুনেছি। তাই তারই উপর সোপর্দ করছি এ কাজের ভার। তোমাদের ভিতর থেকে যে সব নওজোয়ান তার সাথী হতে রাযী, বিশ দিনের মধ্যে তারা নিজ নিজ ঘর থেকে ঘুরে বসরায় এসে পৌছবে।

পাঁচ

সাবেরার নিয়মিত কাজ ছিলো, তিনি রোজ ফজরের নামায শেষ করে উযরাকে সামনে বসিয়ে তার মুখ থেকে কুরআন তেলাওয়াত শুনতেন। উযরার মধুর আওয়ায কখনো কখনো আশেপাশের মেয়েদের পর্যন্ত টেনে আনতো সাবেরার ঘরে। এরপর সাবেরা গাঁয়ের কয়েকটি মেয়েকে পড়াতে ব্যস্ত হতেন আর উযরা ঘরের দৈনন্দিন কাজকর্ম সেরে তীরন্দাযীর অভ্যাস করতো। একদিন সূর্যোদয়ের আগে উযরা যথারীতি কুরআন তেলাওয়াত করে উঠে যাচ্ছে, সাবেরা অমনি তার হাত ধরে কাছে বসিয়ে খানিকক্ষণ সস্নেহ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, উযরা কতোবার আমি ভাবি, তুমি না এলে আমার দিন কতো কষ্টে কাটতো। তুমি আমার নিজের মেয়ে হলেও হয়তো এর চাইতে বেশি স্নেহ আমি তোমায় দিতে পারতাম না।

উযরা জওয়াব দিলো, আম্মি আপনি না হলে আমি ...। উযরা আর কিছু বলতে পারলো না। তার চোখ দু'টি হয়ে উঠলো অশ্রুসজল।

'উযরা!' সাবেরা ডাকলেন।

'জি, আম্মি!'

সাবেরা আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, অমনি বাইরের দরযা খুলে গেলো। এবং ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিয়ে আব্দুল্লাহ এসে ঢুকলেন ঘরের মধ্যে। সাবেরা উঠে কয়েক কদম এগিয়ে গেলেন। আব্দুল্লাহ সালাম করলেন। মা ও ছেলে দাঁড়িয়ে রইলেন সামনাসামনি।

পুত্রকে ছেড়ে মায়ের নযর তখন চলে গেছে দূরে-বহু দূরে। বিশ বছর আগে ঠিক এমনি লেবাস পরে এমনি আকৃতি নিয়ে এসে ঘরে ঢুকতেন আব্দুল্লাহর বাপ।

'আম্মি।'

'হাঁ বেটা।'

'আপনাকে আগের চাইতে কমযোর মনে হচ্ছে।'

'না বেটা। আজতো আমায় কমযোর মনে হবার কথা নয়...। দাঁড়াও, আমি তোমার ঘোড়া বেঁধে রেখে আসি। ... বলে সাবেরা ঘোড়ার বাগ হাতে নিয়ে আদর করে তার গর্দানে হাত বুলাতে লাগলেন।'

'ছাড়ুন আম্মি। একি করে হতে পারে?' মায়ের হাত থেকে ঘোড়ার বাগ ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে আব্দুল্লাহ বললেন।

'বেটা, তোমার বাপের ঘোড়া তো আমিই বাঁধতাম।' সাবেরা বললেন।

'কিন্তু আপনাকে তকলীফ দেওয়া যে আমি গুনাহ মনে করি।'

'যিদ করো না বেটা, ছেড়ে দাও।'

আব্দুল্লাহ মায়ের কণ্ঠস্বরে অভিভূত হয়ে ঘোড়ার বাগ ছেড়ে দিলেন।

সাবেরা ঘোড়া নিয়ে আস্তাবলের দিকে কয়েক কদম এগিয়ে যেতেই উযরা এসে তাঁর হাত থেকে ঘোড়ার বাগ ধরে বললো, 'আম্মি। ছাড়ুন। আমি বেঁধে আসি।'

সাবেরা স্নেহ করুণ হাসি-ভরা মুখে উযরার দিকে তাকিয়ে একটুখানি চিন্তা করে ঘোড়ার বাগ ছেড়ে দিলেন তার হাতে।

আব্দুল্লাহ তাঁর ছুটির বিশ দিন কাটিয়ে দিলেন বাড়িতে। বাড়ির অবস্থায় তিনি লক্ষ্য করলেন এক যবরদস্ত পরিবর্তন। উযরা আগেও তাঁর সামনে কিছুটা দ্বিধা-সংকোচ নিয়ে চলতো। আর এখন সে যেনো শরমে মরে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে আব্দুল্লাহর ছুটির দিন শেষ হয়ে এলো। অতি আদরের পুত্রের জন্য মায়ের সবচাইতে বড়ো তোহফা ছিলো তার দাদার আমলের একখানি খুবসুরত তলোয়ার।

আব্দুল্লাহ যখন ঘোড়ার সওয়ার হয়েছেন, তখ্খুনি উযরা তার নিজ হাতের তৈরী একখানা রুমাল সাবেরার হাতে দিয়ে সলজ্জভাবে ইশারা করলো আব্দুল্লাহর দিকে। রুমাল খুলে আব্দুল্লাহ দেখতে পেলেন, তার মাঝখানে লাল রঙের রেশমী সূতা দিয়ে তোলা রয়েছে কালামে ইলাহীর এই কটি কথাঃ

قاتلوهم حتى لا تكون فتنة

-'অনিষ্ট অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।'

আব্দুল্লাহ রুমালখানা জেবের মধ্যে রেখে উযরার দিকে তাকালেন এবং পর মুহূর্তেই তার দিক থেকে নযর সরিয়ে নিয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে এজাযত চাইলেন।

সাবেরা মাতৃসুলভ কোমল ও নাযুক মনোভাব সংযত করে বললেন, এখন আর তোমায় নসীহতের প্রয়োজন নেই। তোমরা কার আওলাদ, তা ভুলে যেয়ো না। তোমার পূর্বপুরুষ কখনো পেছন ফিরে রক্তদান করেননি। আমার দুধ আর তাদের নামের ইয্যত রেখে চলবে।'

আব্দুল্লাহর জিহাদে যোগ দেবার পর এক বছর কেটে গেছে। সাবেরার কাছে তাঁর দেওয়া কয়েকখানা চিঠিতে প্রকাশ পেয়েছে যে, পুত্র-গর্বে গর্বিতা মাতার প্রত্যাশার চাইতেও বেশি সুনাম তিনি হাসিল করছেন। সাঈদের চিঠিতে এবং বসরা থেকে তাদের এলাকায় যারা আসা-যাওয়া করে তাদের মুখে সাবেরা শোনেন মকতবে নয়ীমের সুনাম-সুখ্যাতির খবর। নয়ীমের এক চিঠিতে সাবেরা জানলেন, তিনি শীগগিরই শিক্ষা শেষ করে ফিরে আসবেন বাড়িতে। একদিন সাবেরা বেড়াতে গেলেন পাশের এক বাড়িতে। উযরা তীর-ধনুক নিয়ে আঙিনায় বসে নানা রকম জিনিসের উপর লক্ষ্যভেদ করছে। একটা কাক হঠাৎ উড়ে এসে বসলো উযরার সামনে এক খেজুর গাছের উপর। কাকটা কেবলমাত্র উপরে উঠেছে, অমনি অপরদিক থেকে আর একটি তীর এসে তাকে যখম করে নীচে ফেলে দিলো। উযরা হয়রান হয়ে উঠে এসে কাকের দেহ থেকে তীরটা ছাড়িয়ে নিয়ে তাকাতে লাগলো এদিক-ওদিক। ফটকের কাছে গিয়ে সে বাইরে তাকালো। ঘোড়সওয়ার ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন হাসিমুখে। উযরার ফরসা চেহারা লজ্জায় ও খুশীতে লাল হয়ে উঠলো। এগিয়ে গিয়ে সে ফটক খুলে দিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে রইলো। নয়ীম ঘোড়া থেকে নেমে এসে ঢুকলেন ভিতরে।

নয়ীম বসরা থেকে বাড়ি এসেছেন অনেক কিছু বলবার আর অনেক কিছু শুনবার আকাংখা নিয়ে, কিন্তু অন্তহীন চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর মুখ থেকে একটির বেশী কথা বেরুলো না। তিনি বললেন, 'ভালো আছ 'উযরা?'

'উযরা কোনো জওয়াব না দিয়ে মুহূর্তের জন্য চোখ তুলে তাকালো তাঁর দিকে; পরক্ষণেই সে তার চোখ অবনত করলো।

নয়ীম আর একবার সাহস করলেন, 'উযরা কেমন আছ?'

'ভালো আছি।'

'আম্মিজান কোথায়?'

'তিনি একটি মেয়ের অসুখ দেখতে গিয়েছেন।'

খানিকক্ষণ দু'জনই নির্বাক।

'উযরা, তোমায় আমি হররোজ মনে করেছি।'

উযরা চোখ উপরে তুললো, কিন্তু সিপাহীর লেবাসে সৌন্দর্য ও মহিমার প্রতিমূর্তির দিকে তাকিয়ে প্রাণ ভরে দেখবার সাহস হলো না তার।

'উযরা, তুমি আমার উপর নারায হয়েছো?'

উযরা জওয়াবে কিছু বলতে চাচ্ছিলো, কিন্তু নয়ীমের রাজকীয় ঐশ্বর্যের দিকে তাকিয়ে তার বাকরুদ্ধ হয়ে গেলো।

'আচ্ছা, আমি আপনার ঘোড়াটা বেঁধে রেখে আসি।' কথার মোড় ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করে বললো সে।

'না, উযরা! তোমার হাত এসব কাজের জন্য তৈরী হয়নি।' নয়ীম এই কথা বলে ঘোড়াটিকে নিয়ে গেলেন আস্তাবলের দিকে।

নয়ীম তিন মাস বাড়িতে থেকে জিহাদে যাবার জন্য বসরার ওয়ালীর হুকুমের ইনতেযার করতে থাকলেন।

ঘরে ফিরে এসে নয়ীমের দিনগুলো খুশীতে কাটবে না, এরূপ প্রত্যাশা তিনি করেননি। যৌবনের প্রথম অনুভূতি উযরা ও তাঁর মাঝখানে সৃষ্টি করে তুলেছে লজ্জার এক দুস্তর ব্যবধান। ছেলেবেলার ফেলে আসা দিনগুলো তার মনে পড়ে, যখন উযরার ছোট্ট হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন লোকালয়ের বাগ-বাগিচায়। সেই হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো আজ তাঁর কাছে এক স্বপ্ন। কম-বেশী করে উযরারও সেই একই অবস্থা। নয়ীম তার ছেলেবেলার সাথী। কিন্তু তার চোখে তিনি যেনো আজ কতো নতুন। কোথায় তার চালচলনে দ্বিধা-সংকোচ কমে আসবে, তা না হয়ে যেনো তা আরো বেড়ে যাচ্ছে। নয়ীম তার দেহ মনকে ঘিরে অনুভব করছেন কারাপ্রাচীরের বন্ধন, তাঁর দীলের উপর চেপে রয়েছে এক গুরুতর বোঝা। উযরা তাঁর দীলের তন্ত্রীতে জাগিয়ে তুলেছে মহব্বতের এক ছন্দময় সংগীত সুর তার ছোটবেলা থেকেই। নয়ীম চান, এই মরুদুলালী হুরের সামনে খুলে ধরবেন তার দীলের পর্দা, কিন্তু রাজ্যের লজ্জা এসে যেনো চেপে ধরে তাঁর মুখ। তবু যেনো তারা দু'জনই শুনতে পান পরস্পরের দীলের কম্পন।

নয়ীম ঘরে ফিরবার চার মাস পর আব্দুল্লাহ এলেন ছুটি নিয়ে। সাবেরার ঘরের রওনক দ্বিগুণ বেড়ে গেলো। রাতের খানা খেয়ে নয়ীম ও আব্দুল্লাহ বসলেন মায়ের কাছে। আব্দুল্লাহ তাদেরকে শুনাচ্ছেন তার ফউজী তৎপরতার কথা, আরো শুনাচ্ছেন তুর্কিস্থানের অবস্থা। উযরা আব্দুল্লাহর কথা শুনছে খানিকটা দূরে পাঁচিলের আড়ে দাঁড়িয়ে। আলোচনার শেষে আব্দুল্লাহ বললেন; আমি বসরা হয়ে এসেছি।'

'তোমার মামুর সাথে দেখা হয়েছিলো?' সাবেরা প্রশ্ন করলেন।

'জি হাঁ, দেখা হয়েছে। আপনাকে সালাম জানিয়েছেন তিনি। তা ছাড়া একটা চিঠিও দিয়েছেন আমার হাতে।'

'কেমন চিঠি?'

আব্দুল্লাহ জেব থেকে একটা চিঠি বের করে বললেন, 'পড়ে দেখুন।'

'তুমিই পড়ে শুনাও বেটা।'

'আম্মিজান! চিঠিটা আপনার নামে।' আব্দুল্লাহ সলজ্জভাবে জওয়াব দিলেন।

সাবেরা চিঠিটা নয়ীমের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আচ্ছা বেটা, তুমিই পড়ো।'

নয়ীম চিঠি হাতে নিয়ে উযরার দিকে তাকালেন। উযরা বাতিটা তুলে নিয়ে নয়ীমের পাশে দাঁড়ালো।

চিঠির বিষয়বস্তুর দিকে নযর ফেলতেই নয়ীমের দীলের উপর এসে লাগলো এক প্রচণ্ড ধাক্কা। মাকে তিনি শুনাতে চান, কিন্তু চিঠিটার কথাগুলো যেনো তার মুখ চেপে ধরেছে। তিনি দ্রুত নযর চালালেন চিঠির আগাগোড়া। চিঠির বিষয়বস্তু নয়ীমের কাছে না-করা গুনাহর সাজা পাবার হুকুমনামার চাইতেও ভয়ানক হয়ে দেখা দিলো। তার ভবিষ্যত সম্পর্কে তকদীরের অমোঘ ফয়সালা পড়ে তিনি যেনো কিছুক্ষণের জন্য সম্বিতহারা হয়ে গেলেন। এক অসহনীয় বোঝা যেনো তাঁকে টেনে নিচ্ছে দ্বিধাবিভক্ত যমিনের অভ্যন্তরে। কিন্তু মুজাহিদের স্বভাবসুলভ হিম্মৎ হলো জয়ী। অন্তহীন চেষ্টায় তিনি মুখের উপর হাসি টেনে এনে বললেন, 'মামু জান ভাইয়ের শাদীর কথা লিখেছেন। পড়ুন আপনি।'

নয়ীম এই কথাটি বলে চিঠিখানি মায়ের হাতে দিলেন। সাবেরা বাতির আলোর দিকে এগিয়ে পড়তে শুরু করলেন, 'বোন, উযরার ভবিষ্যত সম্পর্কে আমি এখনও কোন ফয়সালা করতে পারিনি। আমার কাছে আব্দুল্লাহ ও নয়ীম—দু'জনই সমান। উযরার মতো শরীফ খান্দানের মেয়ের ভবিষ্যতের যামিন হতে পারে এমন গুণরাজি এদের দু'জনেরই ভিতরে মওজুদ রয়েছে। বয়সের দিক বিবেচনা করে আব্দুল্লাহকেই এ আমানতের বেশী হকদার মনে হয়। তার দু'মাসের ছুটি মিলেছে। আপনি কোনো পছন্দমতো দিন ধার্য করে আমায় খবর দেবেন। দু'দিনের জন্য আমি চলে আসবো। এ বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনিই আমার চাইতে বেশী ওয়াকেফ। এ উযরার ভবিষ্যতের প্রশ্ন, খেয়াল রাখবেন।—সাঈদ।'

নয়ীমের দীর্ঘদিনের স্বপ্নের পরিণাম হলো তার প্রত্যাশার বাইরে। তার এতদিনের ধারণা, তিনি উযরার জন্য আর উযরাও তারই জন্য। কিন্তু মামুর একখানা চিঠি তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এক তিক্ত বাস্তবের মুখোমুখি।

উযরা, তার নিষ্পাপ উযরা! এখন সে তার ভাবী হতে চলেছে। দুনিয়া আর তার ভিতরকার সব কিছুই যেনো তার চোখে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। তার দীলের মধ্যে থেকে থেকে জেগে উঠছে এক অপূর্ব বেদনার অনুভূতি, কিন্তু নিজেকে তিনি সংযত করে রেখেছেন যথাসাধ্য। দীলের গোপন ব্যথা তিনি প্রকাশ করেননি কারুর কাছে। উযরার অবস্থায়ও কোনো ব্যতিক্রম নেই।

আব্দুল্লাহ ও সাবেরা নয়ীম ও উযরার পেরেশানীর কারণ জানতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু ভাইয়ের প্রতি নয়ীমের ছিলো অপরিসীম শ্রদ্ধা। আর উযরা? সাবেরা, সাঈদ ও আব্দুল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধা যেনো তাকে বেঁধে ফেলেছে। তাই দু'জনই রইলেন নির্বাক, কোনো কথাটি বেরুলো না তাঁদের মুখ থেকে। 'মনের আগুন মনই পোড়ায়, নেই কোনো দোসর।'

আব্দুল্লাহর আনন্দের দিন যতো ঘনিয়ে এলো নিকটে, ততোই নয়ীম ও উযরার কল্পনার দুনিয়া হয়ে এলো অন্ধকার-তিমিরাচ্ছন্ন। নয়ীমের অশান্ত মনের কাছে ঘরের চার দেওয়ালের ভিতরটা হয়ে এলো জিন্দাখানার মতো। হর রোজ সন্ধ্যায় তিনি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বেড়াতে চলে যান দূরে-বহু দূরে। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত মরুপথে ঘুরে বেড়াতে থাকেন এদিক-ওদিক।

আব্দুল্লার শাদীর আর এক হফতা বাকী। নয়ীম এক রাত্রে লোকালয়ের বাইরে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বেড়াচ্ছেন। আসমানে ঝিকিমিকি করছে সিতারার দল। চাঁদের মন-ভোলানো দীপ্তিতে ঝকঝক করছে মরুভূমির বালু তরংগ। লোকালয়ে আব্দুল্লাহর শাদীর খুশীতে নওজোয়ান মেয়েরা গান গাইছে দফ বাজিয়ে। নয়ীম ঘোড়া থামিয়ে খানিকক্ষণ শুনলেন সে সংগীত সুর। তিনি ছাড়া গোটা সৃষ্টিই যেনো আজ আনন্দে মশগুল। ঘোড়া থেকে নেমে তিনি শুয়ে পড়লেন ঠাণ্ডা বালুর বিছানায়। চাঁদ, সিতারা, ঠাণ্ডা মন-ভোলানো হাওয়া আর এলাকার বাগ-বাগিচার মুগ্ধকর দৃশ্য যেনো তাঁর নিষ্পাপ দুনিয়ার হারিয়ে যাওয়া প্রশান্তির জন্য তাঁকে আবার পাগল করে তুললো। আপন মনে তিনি বলতে লাগলেনঃ

'আমি ছাড়া সৃষ্টির প্রতি অণু-পরমাণু আনন্দে বিভোর। এই বিপুল প্রসারের মাঝখানে আমার হাহাকারের বাস্তবতা কতটুকু। ওহ্! ভাই ও মায়ের খুশী, মামুর খুশী এবং হয়তো উযরার খুশীও আমায় বিষণ্ন ও মর্মাহত করে তুলেছে। কতো স্বার্থপর আমি। ... কিন্তু স্বার্থপরও তো নই আমি। ভাইয়ের জন্যই তো আমি আমার নিজের খুশী কোরবান করে দিয়েছি! ... কিন্তু তাও মিথ্যা! আমার দীলের মধ্যে ভাইয়ের জন্য এতটুকু ত্যাগের মনোভাব নেই যে, তাঁর খুশীতে শরীক হয়ে আমি আপনার দুঃখ-বেদনা ভুলে যাবো। রাতদিন এমনি করে বাইরে থাকা, কোন কথা না বলা, এমনি বেদনাতুর হয়ে থাকা তাঁর কাছে কি প্রকাশ করেছে ...! আর আমি এমন করবো না। তিনি আমার বিষণ্ন মুখ আর দেখবেন না! ... কিন্তু তাও তো আমার হাতে নেই কিছু!

আমি হয়তো দীলের আকাংখা সংযত করে রাখতে পারি, কিন্তু অনুভূতিকে তো সংযত করতে পারব না। তার চাইতে ভালো, আমি কিছুদিনের জন্য বাইরে চলে যাই। ... হাঁ, আমার অবশ্যি চলে যেতে হবে। ... এখ্খুনি চলে যাচ্ছি না কেন? ... কিন্তু না, এমনি করে নয়। ভোরের দিকে মায়ের এজাযত নিয়ে তবে যাবো।'

এই সংকল্প নয়ীমের দীলকে কিছুটা আশ্বস্ত করলো।

পরের দিন ভোরে ফজরের নামায পড়ে নয়ীম মায়ের কাছে গিয়ে কয়েকদিনের জন্য বসরা যাবার এজাযত চাইলেন।

'বেটা! তোমার ভাইয়ের শাদী! তুমি ওখানে যাবে কি আনতে?'

'আম্মি! শাদীর একদিন আগেই আমি এসে যাবো।'

'না বেটা! শাদী পর্যন্ত তোমায় থাকতেই হবে বাড়িতে।'

'আম্মি! আমায় এজাযত দিন।'

সাবেরা রাগের ভাব দেখিয়ে বললেন, 'নয়ীম, আমার ধারণা ছিলো তুমি সত্যি সত্যি এক মুজাহিদের বেটা, কিন্তু আমার অনুমান ভুল হয়েছে। আপন ভাইয়ের খুশীতে শরীক হতে তুমি চাও না। নয়ীম, তোমার ও আব্দুল্লাহর মধ্যে ঈর্ষা?'

'ঈর্ষা? আম্মা, আপনি কি বলছেন? ভাইয়ের প্রতি আমি ঈর্ষা কেন পোষণ করবো? আমি তো চাই, আমার সবটুকু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আমি তাকেই নযরানা দেবো।'

নয়ীমের কথাগুলো সাবেরার অন্তর স্পর্শ করলো। খানিকক্ষণ নির্বাক থেকে তিনি বলে উঠলেন, 'বেটা! খোদা করুন, আমার এ ধারণা যেনো মিথ্যাই হয়। কিন্তু তোমার এমনি নীরবতা, অকারণ মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ানোর অর্থ আর কি হতে পারে?'

'আম্মি, আমি মাফ চাচ্ছি।'

সাবেরা এগিয়ে এসে নয়ীমকে বুকে চেপে ধরে বললেন, 'বেটা মুজাহিদের সিনা প্রশস্ত হয়েই থাকে।'

সন্ধ্যা বেলায় নয়ীম আর বাইরে গেলেন না। রাতের খানা খেয়ে বিছানায় পড়ে তিনি বিভোর হয়ে রইলেন গভীর চিন্তায়। তার দীলের মধ্যে আশংকা জাগলো, তাঁর চালচলনে মায়ের মনে যে ধারণা জন্মেছে, আব্দুল্লাহর মনেও যদি তেমনি হয়ে থাকে! এই চিন্তা তার বাড়ী চলে যাবার ইরাদা আরো মযবুত করে দিলো।

মধ্য রাত্রে তিনি বিছানা ছেড়ে উঠলেন। তারপর কাপড় বদল করে আস্তাবলে গিয়ে ঘোড়ার উপর যিন বাঁধলেন। ঘোড়া নিয়ে বাইরে যাবার মতলব করতেই তাঁর দীলের মধ্যে জাগলো এক নতুন খেয়াল। ঘোড়া সেখানেই রেখে তিনি আঙিনা পার হয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন উযরার বিছানার পাশে।

উযরাও কয়েকদিন ধরে রাত জেগে কাটাচ্ছে নয়ীমের মতো। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে দেখছে নয়ীমের কার্যকলাপ। নয়ীম কাছে এলে তার দীলের মধ্যে জাগলো প্রচণ্ড কম্পন। ঘুমের ভান করে সে পড়ে রইলো চোখ বন্ধ করে। নয়ীম বহু সময় দাঁড়িয়ে রইলেন পাথরের মূর্তির মতো। চাঁদের রোশনী এসে পড়েছে উযরার মুখের উপর। মনে হচ্ছে যেনো আসমানের চাঁদ উকি মেরে দেখছে যমিনের চাঁদকে। নয়ীমের দৃষ্টি এমন

করে গিয়ে নিবদ্ধ হয়েছে উযরার মুখের উপর যে, তিনি খানিকক্ষণের জন্য ভুলে গেছেন চারদিকের বাস্তবকে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বলে উঠলেন; উযরা, তোমার শাদী মোবারক হোক।

নয়ীমের কথায় উযরার সারা দেহে কম্পন অনুভূত হলো। তার মনে হলো, যেনো কেউ তাকে গর্তের ভিতরে ফেলে উপর থেকে মাটি চাপা দিচ্ছে। তার দম বন্ধ হয়ে আসছে যেনো। সে চীৎকার করতে চায়, কিন্তু কোন এক অদৃশ্য হাত যেনো তার মুখ চেপে ধরে জোর করে। সে চায় নয়ীমের পায়ে মাথা রেখে শুধাতে, কি তার কসুর? কেন তিনি এ কথা বললেন? কিন্তু কম্পিত দীলের মধ্যেই গুমরে মরে তা। চোখ খুলে সে নয়ীমের দিকে তাকাতেও পারে না।

ঘোড়া বের করবার জন্য নয়ীম আবার চলে গেলেন আস্তাবলের ভেতরে। উযরা বিছানা ছেড়ে উঠলো। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পাঁচিলের পাশে দাঁড়িয়ে রইলো। নয়ীম ঘোড়া নিয়ে বাইরে এলেন। উযরা এগিয়ে এসে দাঁড়ালো নয়ীমের পথরোধ করে।

'নয়ীম। কোথায় যাচ্ছো তুমি?'

'উযরা তুমি? তুমি জেগে উঠেছো?'

'কখনই বা আমি ঘুমিয়েছিলাম? দেখো নয়ীম....।'

'উযরার মুখ থেকে আর কোন কথা বেরুলো না। কথা শেষ না করেই সে এগিয়ে গিয়ে নয়ীমের হাত থেকে ঘোড়ার বাগ ধরলো।

'উযরা, আমায় বাধা দেবার চেষ্টা করো না। যেতে দাও আমায়।'

'কোথায় যাবে, নয়ীম?' বহুকাল পরে উযরা নয়ীমকে নাম ধরে ডাকছে।

'কয়েকদিনের জন্য আমি বসরা যাচ্ছি, উযরা।'

'কিন্তু এ সময়ে কেন?'

'উযরা, কেন এ সময়ে যাচ্ছি, জানতে চাচ্ছ? তুমি জানোনা কিছুই?'

উযরা সবই জানে। তার দীল ধক ধক করছে। ঠোঁট কাঁপছে। নয়ীমের ঘোড়ার বাগ ছেড়ে অশ্রু ভারাক্রান্ত চোখ দু'টি দু'হাতে চেপে ধরলো সে।

নয়ীম বললেন, 'তুমি হয়তো জানো না উযরা, তোমার অশ্রুর কি দাম আমার কাছে। কিন্তু আমার এখানে থাকা ঠিক হবে না। আমি নিজে এমনি উদাস থেকে তোমাদের পীড়িত করে তুলছি। বসরায় কয়েকদিন থেকে আমার তবিয়ৎ ঠিক হয়ে আসবে। তোমাদের শাদীর দু'একদিন আগেই আমি ফিরে আসবার চেষ্টা করবো। উযরা! একটা কথায় আমি খুশী হয়েছি, আর তোমারও খুশী হওয়া উচিত। তোমার স্বামী হবেন যিনি, তিনি আমার চাইতে অনেক বেশী গুণের অধিকারী। আহা! তুমি যদি জানতে, আমার ভাইকে আমি কতো ভালোবাসি! এ অশ্রু তাঁর কাছে যেনো ধরা না পড়ে কোনোদিন।'

'তুমি সত্যি সত্যি চললে? 'উযরা প্রশ্ন করলো।

'আমি চাই না যে, এমনি করে হররোজ আমার সংযমের পরীক্ষা চলতে থাক। 'উযরা আমার দিকে অমনি করে চেয়ো না। তুমি যাও।'

উযরা আর একটি কথাও না বলে ফিরে এলো। কয়েক কদম এসে একবার সে ফিরে তাকালো নয়ীমের দিকে। এক পা ঘোড়ার রেকাবে রেখে নয়ীম তখনো তাকিয়ে রয়েছেন তার দিকে। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে উযরা দ্রুত পা ফেলে গিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে কেঁদে ফেললো।

নয়ীম ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে মাত্র কয়েক কদম এগিয়ে গেছেন, অমনি তার পিছন থেকে কে যেনো ছুটে এসে তার ঘোড়ার বাগ ধরলেন। নয়ীম অবাক-বিস্ময়ে দেখলেন, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আব্দুল্লাহ। 'ভাই! নয়ীম হয়রান হয়ে বললেন।

'নীচে নেবে এসো।' আব্দুল্লাহ কঠোর আওয়াযে বললেন।

'ভাই, আমি বাইরে যাচ্ছি।'

'আমি জানি। তুমি নীচে নেবে এসো।'

নয়ীম ঘোড়া থেকে নামলেন। আব্দুল্লাহ এক হাতে ঘোড়ার বাগ ও অপর হাতে নয়ীমের বাযু ধরে ফিরে চললেন। বাড়ির সীমানায় পৌঁছে তিনি বললেন, ঘোড়া আস্তাবলে বেঁধে এসো।

নয়ীমের কিছু বলবার ইচ্ছা ছিলো, কিন্তু আব্দুল্লাহ তাঁর সামনে এমন এক গুরুগম্ভীর প্রভুত্বব্যঞ্জক রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন যে, তাঁর হুকুম মেনে চলা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই তাঁর। তিনি ঘোড়াটাকে আস্তাবলে রেখে এসে আবার দাঁড়ালেন ভাইয়ের কাছে। উযরা বিছানায় শুয়ে শুয়ে দেখছেন এ অপূর্ব দৃশ্য। আব্দুল্লাহ আবার নয়ীমের বাযু ধরে তাঁকে নিয়ে চলে গেলেন ঘরের একটি কামরায়।

উযরা কাঁপতে কাঁপতে উঠে চুপি চুপি পা ফেলে সেই কামরার কাছে গিয়ে দরযার আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলো আব্দুল্লাহ ও নয়ীমের কথাবার্তা।

'বাতি জ্বালাও।' আব্দুল্লাহ বললেন। নয়ীম বাতি জ্বালালেন। কামরার মধ্যে একটা বড়ো পশমী কাপড় বিছানো। বাব্দুল্লাহ তার উপর বসে নয়ীমকে ইশারা করলেন বসতে!

'ভাই, আমাকে কি বলতে চান আপনি?'

'কিছু না ,বসে পড়।'

'আমি যাচ্ছিলাম এক জায়গায়।'

'তোমায় আমি যেতে মানা করবো না। বসো। তোমার সাথে একটা জরুরি কাজ আছে আমার।' নয়ীম পেরেশান হয়ে পড়লেন। আব্দুল্লাহ কাগজ-কলম বের করলেন একটা সিন্দুক থেকে। তারপর শুরু করলেন একটা কিছু লিখতে। লেখা শেষ করে আব্দুল্লাহ নয়ীমের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি সহকারে বললেন, 'নয়ীম, তুমি বসরায় চলে যাচ্ছ?'

'ভাই, আপনি যে গুপ্তচর, তা আমার জানা ছিলো না।' জওয়াবে নয়ীম বললেন।

'আমি মাফ চাই, নয়ীম! আমি তোমার নই, উযরার গুপ্তচর।'

'ভাইজান, অত শিগগীর আপনি উযরা সম্পর্কে কোনো রায় কায়েম করবেন না।

এই জওয়াব শুনে আব্দুল্লাহ নয়ীমের মুখের দিকে তাকালেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। নয়ীম ভয় পেয়ে ঘাড় নীচু করলেন। আব্দুল্লাহ আদর করে এক হাতে তাঁর চিবুক স্পর্শ করে

মুখখানা উপরে তুলে ধরে বললেন, 'নয়ীম! আমি তোমার ও উযরার সম্পর্কে কখনো ভুল ধারণা পোষণ করতে পারি না। তুমি আমার চিঠিখানা বসরায় মামুর কাছে নিয়ে যাবে।'

এই বলে আব্দুল্লাহ তাঁর লেখা চিঠিটা এগিয়ে দিলেন নয়ীমের হাতে।

'ভাইজান এতে কি লিখেছেন আপনি?'

'তুমি নিজে পড়ে দেখো। এতে আমি তোমার সাজার ব্যবস্থা করেছি।'

নয়ীম চিঠিটা পড়লেনঃ

প্রিয় মামুজান! আসসালামু আলাইকুম! যেহেতু উযরার ভবিষ্যত সম্পর্কে আপনার মতই আমিও উদ্বিগ্ন, তাই আমি আমার নিজের চাইতে নয়ীমকে তার ভবিষ্যতের মোহাফিয ও আমানতদার হতে দেখলে আরো বেশি খুশী হবো। আর বেশি কি লিখবো? এ চিঠি কেন লিখছি, তা আপনি বুঝবেন। আশা করি, আপনি আমার কথায় আমল দেবেন। আমার ছুটি শেষ হবার আগেই নয়ীম ও উযরার শাদী হয়ে যাক এই আমার ইচ্ছা। সুবিধা মতো তারিখ আপনি নিজে ধার্য করে দেবেন।

আপনার আব্দুল্লাহ।

চিঠি শেষ করতে করতে নয়ীমের চোখ আঁসুতে ভরে উঠলো। তিনি বললেন, 'ভাই আমি এ চিঠি নিয়ে যাবো না। উযরার শাদী আপনার সাথেই হবে। আমায় মাফ করুন ভাই।'

আব্দুল্লাহ বললেন, তুমি কি মনে কর, নিজের খুশীর জন্য আমি আমার ছোট ভাইয়ের সারা জীবনের খুশী কোরবান হতে দেবো?

'আমায় আর শরম দেবেন না আপনি।'

'তোমার জন্য কিছুই করছি না আমি। তোমার চাইতে উযরার খুশীর দিকেই আমার নযর বেশি। আগে থেকেই আমি ওকে তোমার জোড়া মনে করেছি। তুমি আমার জন্য যা কিছু করতে চাচ্ছ তাই আমি করছি উযরার জন্য। যাও, ভোর হয়ে এলো। কাল পর্যন্ত অবশ্যি ফিরে আসবে। মামুজান হয়তো তোমার সাথেই চলে আসবেন। চলো।'

'ভাই, কি বলছেন আপনি? আমি যাবো না।'

'নয়ীম যিদ করো না। উযরাকে খুশি রাখবার দায়িত্ব আমাদের দু'জনেরই।'

'ভাই....।'

'চলো।' আব্দুল্লাহ মুখের ভাব বদল করে বললেন এবং নয়ীমের বাযু ধরে কামরা থেকে বাইরে গেলেন।

উযরা তাদেরকে দেখে ছুটে গিয়ে শুয়ে পড়লো বিছানার উপর। নয়ীমকে ইতস্ততঃ করতে দেখে আব্দুল্লাহ নিজে আস্তাবলে গিয়ে নিয়ে এলেন তাঁর ঘোড়া। তারপর দু'ভাই বেরিয়ে গেলেন বাড়ির বাইরে। খানিকক্ষণ পরেই উযরার কানে এলো ঘোড়ার পায়ের আওয়ায।

আব্দুল্লাহ ফিরে এসে আল্লাহর দরগায় শোকর গোজারী করবার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন।

ভোরবেলা সাবেরা নয়ীমের বিছানা খালি দেখে আস্তাবলের দিকে গেলেন। আব্দুল্লাহ তখন সেখানে তাঁর ঘোড়ার সামনে চারা দিচ্ছিলেন। সাবেরা নয়ীমের ঘোড়া না দেখে পেরেশান হয়ে দাঁড়ালেন। আব্দুল্লাহ তাঁর মনের ভাব বুঝতে পেরে প্রশ্ন করলেন, আম্মি! নয়ীমকে তালাশ করছেন আপনি?

'হাঁ হাঁ, কোথায় নয়ীম?'

'সে একটা জরুরি কাজে গেছে বসরায়।' আব্দুল্লাহ জওয়াবে বললেন। তারপর খানিকক্ষণ কি যেন চিন্তা করে মাকে শুধালেন, 'আম্মি, নয়ীমের শাদী করে হবে?

'তোমার শাদী তো হোক বেটা, তার পালাও আসবে!'

'আম্মি, আমার ইচ্ছা, ওর শাদী আমার আগেই হোক।'

'বেটা। আমি জানি, সে তোমার কত আদরের। তার সম্পর্কে আমি গাফেল নই। তার জন্য আমি সম্পর্ক তালাশ করছি বই কি। খোদার ইচ্ছায় হয়তো উযরার মতো কোন মেয়ে মিলে যাবে।'

'আম্মি! 'উযরা আর নয়ীম তো ছোটবেলা থেকেই পরস্পরের সাথী।'

'হাঁ, বেটা।'

'আম্মিজান, আমার ইচ্ছা, ওরা চিরকাল এমনি একত্র হয়ে থাক।'

'তোমার মতলব তা' হোলে ...

'জি হাঁ, আমার বড়ো সাধ, উযরার শাদী নয়ীমের সাথেই হোক।'

সাবেরা হয়রান হয়ে আব্দুল্লাহর দিকে তাকালেন এবং স্নেহ আদরে দু'হাত তার মাথার উপর রাখলেন।

ছয়

বসরা শহরে প্রবেশ করেই নয়ীমের দেখা হলো এক সহপাঠীর সাথে। তাঁর নাম তালহা। তাঁর মুখে নয়ীম শুনলেন, জুমআর নামাযের পর শহরের মসজিদে এক যবর দস্ত জলসা হবে আর তাতে সভাপতিত্ব করবেন ইবনে আমের। মুসলিম বাহিনী সিন্ধুর উপর হামলা করবার সংকল্প করেছে এবং সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব সোপর্দ করা হয়েছে মুহম্মদ বিন কাসিমের উপর। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বসরার লোকদের জিহাদের পথে উদ্বুদ্ধ করবার দায়িত্ব ইবনে আমেরের উপর ন্যস্ত করে নিজে রওয়ানা হয়ে গেছেন কুফার লোকদের ফউজে ভর্তি করবার জন্য। ইবনে আমেরের বক্তৃতা শুনে বসরার লোকদের মধ্যে আশাব্যঞ্জক অবস্থা সৃষ্টি হবে, এরূপ আশা করবার কারণ রয়েছে, কিন্তু শহরে ইবনে সাদেক নামে এক নাম-কা-ওয়াস্তে দরবেশ এসে হাযির হয়েছে। তার জামা'আতের কতগুলো দুষ্ট লোক গোপনে গোপনে বিরোধিতা করছে সিন্ধুর বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার। তারা জলসায় শরীক হয়ে হয়তো একটা ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তুলবে, অমনি একটা আশংকা দেখা যাচ্ছে।

নয়ীম তালহার সাথে কথা বলতে বলতে গেলেন তাঁর বাড়িতে এবং সেখানে ঘোড়া রেখে দু'জন রওয়ানা হলেন মসজিদের দিকে। মসজিদে সেদিন জনসমাগম হয়েছে বরাবরের চাইতে বেশি।

নামাযের পর ইবনে আমের বক্তৃতা করতে উঠলেন মিম্বরের উপর। তিনি কোনো কথা বলবার আগেই বাইরে থেকে দু'হাজার লোকের একটি দল কোলাহল করতে করতে এসে ঢুকলো মসজিদে। তাদের পুরোভাগে একটি মোটাসোটা লোক। পরিধানে তার কালো জুব্বা। মাথায় সাদা পাগড়ী ও গলায় ঝুলছে বহুদামী মোতির হার। তালহা আগন্তুকের দিকে ইশারা করে বললেন, 'দেখুন, ওই যে ইবনে সাদেক এলো। আমার ভয় হচ্ছে, লোকটা নিশ্চয়ই জলসায় কোনো হাংগামা পয়দা করবে।'

ইব্নে সাদেক নয়ীমের আসন থেকে কয়েজগজ দূরে বসে পড়লো আর তার দলের লোকেরাও এদিক-ওদিক তাকিয়ে বসে পড়লো।

ইব্নে আমের তাদের চুপ করে বসবার ইনতেযার করলেন এবং শেষ পর্যন্ত বক্তৃতা শুরু করলেনঃ

'রসূলে খোদার পথে জীবন উৎসর্গকারী বীরদের সন্তান-সন্ততি! বিগত আশি-নব্বই বছর ধরে দুনিয়া আমাদের পূর্বপুরুষদের শৌর্য-বীর্যের, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার এবং পরাক্রম ও শক্তির পরীক্ষা নিয়েছে। সে যামানায় আমরা দুনিয়ার বড় বড় শক্তির মোকাবিলা করেছি। বড় বড় পরাক্রান্ত ও গর্বিত বাদশার মস্তক অবনমিত হয়েছে আমাদের সামনে। আমাদের সৌভাগ্যের কাহিনী শুরু হয়েছে তখন থেকে, যখন কুফ্‌রের ঘূর্ণিঝড় রিসালতের দীপশিখার আকর্ষণে ধাবমান পতংগদলকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে এগিয়ে এসেছে মদীনার চার দেয়ালের দিকে; যখন ইসলামের বৃক্ষমূল বুকের খুনে সিঞ্চিত করে উর্বর করে তুলবার মানসে রসূল (সঃ) পথে আত্মদানকারী তিনশো তেরো জন বীর সিপাহী কাফের বাহিনীর তীর, নেযাহ্ ও তলোয়ারের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। এই আযীমুশ্‌শান বিজয়ের পর তওহীদের ঝান্ডা উঁচু করে আমরা কুফ্‌রের অনুধাবন করে ছড়িয়ে পড়েছি দুনিয়ার দিক-দিগন্তরে। বিপুল বিরাট দুনিয়ায় রয়েছে বহু অঞ্চল, যেখানে খোদার আখেরী পয়গাম আজো পৌঁছে নি। আমাদের কর্তব্য, আমাদের প্রভু প্রতিপালকের পয়গাম আমরা দুনিয়ার সকল দেশে পৌঁছে দেবো। আমাদের রসূল (সঃ) যে কানুন বয়ে এনেছেন, তা আমরা জানিয়ে দেবো দুনিয়ার তামাম মানুষকে। তারই বদৌলতে দুনিয়ায় কায়েম হবে শান্তি, আর দুনিয়ার কমজোর ও শক্তিমান কওমসমূহ মিলিত হয়ে গড়ে তুলবে মানব-সাম্যের এক বিপুল ক্ষেত্র। মযলুম অসহায় মানুষ আবার ফিরে পাবে তাদের হারানো অধিকার। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, আজ পর্যন্ত দুনয়ার যে কোনো শক্তিই এই আযীমুশ্‌শান ও আলমগীর কানুনের মোকাবিলা করতে দাঁড়িয়েছে, তারই ভাগ্যলিপি হয়েছে ধ্বংস।'

'মুসলমান ভাইরা! আমাদের শৌর্য পরীক্ষার সাহস সিন্ধুরাজার কি করে হোল, ভেবে আমি হয়রান হচ্ছি। তিনি কি করে বুঝলেন যে, মুসলমান গৃহবিবাদের ফলে

এতটা কমজোর হয়ে পড়েছে যে, তারা তাদের মা-বোন ও কন্যাদের অবমাননা নীরবে বরদাশত করে যাবে।'

'বীর মুজাহিদ দল! তোমাদের শৌর্য পরীক্ষার মুহূর্ত সমাগত। আমার মতলব এ নয় যে, তোমরা দীলের মধ্যে প্রতিহিংসাবৃত্তি নিয়ে জেগে উঠবে। সিন্ধুরাজকে আমরা মাফ করতে পারি, কিন্তু মানব-সাম্যের নিশান-বরদার হয়ে আমরা হিন্দুস্থানের মযলুম কওমসমূহের উপর তার নির্মম স্বেচ্ছাচারী শাসন মেনে নেবো না। রাজ দাহির কয়েকজন মুসলমানকে কয়েদখানায় আটক করে আমাদেরকে দাওয়াত করেছেন সিন্ধুর লাখো মানুষকে তাঁর লৌহকঠিন নিপেষণ থেকে নাজাত দেবার জন্য। মুজাহিদ দল! জেগে ওঠ। বিজয়ভেরী বাজিয়ে তোমরা পৌঁছে যাও হিন্দুস্থানের শেষ সীমানা পর্যন্ত।'

ইবনে আমেরের বক্তব্য শেষ হবার আগেই ইব্নে সাদেক উঠে দাঁড়িয়ে জোর গলায় বললোঃ

'মুসলমানগণ! আমি ইব্নে আমেরকে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি মনে করি। তাঁর আন্তরিকতা সম্পর্কে আমার কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু আমার আফ্‌সোস এমনি উচ্চ চরিত্রের লোকও হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মতো ক্ষমতালোভীর হাতের ক্রীড়ণকে পরিণত হয়ে তোমাদের সামনে দুনিয়ার শান্তি বিপর্যস্ত করবার ভয়াবহ মন্ত্রণা পেশ করছেন।'

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের অতীত যুলুমের ফলে বসরার বেশীর ভাগ লোকই ছিলো তাঁর বিরোধী। তাঁরা বহুদিন ধরে এমন একটি লোকের সন্ধান করেছিলো, যে তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কিছু বলবার সাহস রাখে। তারা অবাক বিস্ময়ে ইব্নে সাদেকের মুখের দিকে তাকাতে লাগলো।

ইব্নে আমের কিছু বলতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু ইবনে সাদেকের বুলন্দ আওয়ায তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠকে ছাপিয়ে উঠলোঃ

'সমবেত জনগণ! হুকুমাত তোমাদেরকে রাজ্য ও গণিমতের আকাংখা ছাড়া অপর কোনো উদ্দেশ্যে এই ধরণের বিজয় অভিযানে উদ্বুদ্ধ করছে না; কিন্তু একবার ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখো, অতীতে এমনি রাজ্য ও গণিমতের লোভে কতো জান কোরবান করতে হয়েছে , কতো শিশু এতিম ও কতো নারী বিধবা হয়েছে। আমি নিজের চোখে তুর্কিস্তানের ময়দানে তোমাদের নওজোয়ান ভাই-বেটাদের হাজারো লাশ কবর ও দাফন ছাড়া পড়ে থাকতে দেখেছি। কত যখমীকে দেখেছি তড়পাতে আর মাথা খুঁড়ে মরতে। এই অবমাননাকর দৃশ্য দেখে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, মুসলমানের খুন এতটা সস্তা নয় যে, তা হাজ্জাজ বিন্ ইউসুফের নামে বিজয়খ্যাতি ছড়াবার জন্য অকাতরে বইয়ে দিতে হবে।'

'মুসলমান ভাইরা! জিহাদের বিরোধীতা আমি করছি না। কিন্তু আমি অবশ্য, বলবো যে, গোড়ার দিকে আমাদের জিহাদের প্রয়োজন হয়েছিলো; কারণ আমরা ছিলাম কমযোর এবং কাফের শক্তি আমাদেরকে হটিয়ে দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলো। এখন আমরা শক্তিমান। কোনো দুশ্‌মনের ভয় নেই আমাদের। এখন আমাদেরকে নযর দিতে হবে দুনিয়াকে শান্তির আবাস বানানোরদিকে।'

'মুসলমান ভাইরা ! হাজ্জাজের রাজ্যলোভ চরিতার্থ করবার জন্য যে সব যুদ্ধ করা হচ্ছে, তার সাথে জিহাদের লেশমাত্র সম্পর্ক থাকতে পারে না।'

সমবেত জনগণকে ইব্‌নে সাদেকের কথায় প্রভাবিত হতে দেখে ইব্‌নে আমের বুলন্দ আওয়াযে বললেনঃ 'মুসলমান ভাইরা! আমার ধারণা ছিল না যে, আজো আমাদের মধ্যে এমনি অনিষ্টকারী মওজুদ রয়েছে, যে....!'

ইব্‌নে সাদেক ইব্‌নে আমেরের কথা শেষ হতে দিলো না। সে বুলন্দ আওয়াযে বলে উঠলোঃ 'আমার বলতে শরম বোধ হচ্ছে যে, ইব্‌নে আমেরের মতো সম্মানিত ব্যক্তিও হাজ্জাজ বিন ইউসুফের গুপ্তচরের শামিল।'

'হাজ্জাজের গুপ্তচরকে বাইরে বের করে দাও।' বলে উঠলো ইব্‌নে সাদেকের এক সাথী।

ইব্‌নে সাদেকের কৌশল সফল হলো। কেউ কেউ হাজ্জাজের গুপ্তচর বলে চীৎকার জুড়লো, কেউ কেউ আবার ইব্‌নে আমেরকে অপমানজনক গালি-গালাজ করতে লাগলো। ইব্‌নে আমেরের এক শাগরেদ এক ব্যক্তির মুখে শ্রদ্ধেয় ওস্তাদের গালমন্দ বরদাশ্‌ত করতে না পেরে তার মুখের উপর এক চর বসিয়ে দিলো। ফলে মসজিদে রীতিমতো হাংগামা বেধে গেলো। জনগণ পরস্পর ধাক্কা-ধাক্কি শুরু করে দিলো।

মুহম্মদ বিন কাসিম এতক্ষণে ভীষণভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। তাঁর হাত বারংবার তলোয়ারের কব্জির দিকে যাচ্ছে, কিন্তু তিনি নিজেকে সামলে নিচ্ছেন ওস্তাদের ইশারায় আর মসজিদের মর্যাদার খাতিরে।

এমনি এক নাযুক পরিস্থিতিতে নয়ীম জনতার ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলেন মিম্বরের দিকে। তারপর মিম্বরে উঠে কুরআনে করীম তেলাওয়াত করতে শুরু করলেন বুলন্দ ও শিরীন আওয়াযে। কুরআনের আওয়ায সমবেত জনতার মধ্যে প্রশান্ত ভাব ফিরিয়ে আনলো এবং তারা পরস্পরকে চুপ করবার পরামর্শ দিতে লাগলো। ইব্‌নে সাদেক এসেছে জলসার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দেবার জন্য। তাই তার ইচ্ছা, আর একবার একটা হাংগামা সৃষ্টি হোক। কিন্তু কুরআন তেলাওয়াতের ফলে আওয়ামের মনোভাব আর নিজের জানের আশংকা বিবেচনা করে সে চুপ করে গেলো। জনতা চুপ করে গেলে নয়ীম শুরু করলেন তাঁর বক্তৃতাঃ

'বসরার বদ-কিসমৎ লোকেরা! তোমরা খোদার কহরের ভয় করো এবং ভেবে দেখো, তোমরা কোথায় দাঁড়িয়ে কি করছো। আফসোস্‌! যেসব মস্‌জিদ গড়ে তোলার জন্য তোমাদের পূর্ব-পুরুষরা পেশ করতেন দেহের খুন আর অস্থি, আজ তোমরা সেই মস্‌জিদে ঢুকেও গোলযোগ পয়দা করতে দ্বিধা করছো না।'

নয়ীমের কথায় মস্‌জিদে ফিরে এসেছে প্রশান্তি। গলার আওয়াযটা খানিকটা বিষন্ন করে তিনি বলে যানঃ

'এ সেই জায়গা, যেখানে ঢুকেই তোমাদের পূর্বপুরুষ কেঁপে উঠতেন খোদার ভয়ে। দুনিয়ার সব ব্যাপার পিছনে ফেলে এখানে ঢুকতেন তাঁরা। আমি ভেবে হয়রান হচ্ছি, তোমাদের মনের উপর কি করে পয়দা হলো এমনি এক যবরদস্ত ইন্‌কেলাব! তোমাদের ঈমান এতটা কমযোর হয়ে গেছে, তা যেনো আমি ভাবতেও পারি না। খোদা ও রসূলের

পথে জান বাজি রাখতেন যে মুজাহিদ দল, তাদেরই আওলাদ তোমরা। কোনোদিন সেই পূর্বপুরুষের কাছে ফিরে গিয়ে মুখ দেখাতে হবে, এ অনুভূতি যতক্ষণ তোমাদের মনে রয়েছে, ততক্ষণ তোমরা এমনি জঘন্য কার্যকলাপের পথে যেতে পারো না। আমি জানি, তোমাদের মধ্যে এ ধরনের মনোভাব পয়দা করছে অপর কোন লোক।'

ইব্‌নে সাদেক চমকে উঠলো। নাযুক পরিস্থিতি লক্ষ্য করে সে শ্রোতাদের মন থেকে নয়ীমের কথার প্রভাব দূর করবার চেষ্টা করলো। সে চীৎকার করে বললোঃ 'দেখুন, এও হাজ্জাজের গুপ্তচর। একে বের করে দিন।'

এ আরো কিছু বলতে চাইলো, কিন্তু রাগে কাঁপতে কাঁপতে নয়ীম বুলন্দ আওয়াযে বললেনঃ

'আমি হাজ্জাজের গুপ্তচর, তাই ঠিক, কিন্তু ইসলামের গাদ্দার নই। বসরার বদ-নসীব লোকেরা! তোমরা এই ব্যক্তির যবান থেকে শুনেছো আমাদের জিহাদের প্রয়োজন ছিল তখন, যখন আমরা কমযোর ছিলাম; কিন্তু একথা শুনেও তোমাদের দেহের খুন গরম হয়ে ওঠেনি। তোমাদের মধে কেউ একথা ভাবলো না যে, আগের দিনের প্রত্যেকটি মুসলমান শক্তি, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার দিক দিয়ে এ যামানার সকল মুসলমানের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারতেন। তাঁরা কি ছিলেন আর কি করে গেছেন? তাঁদের ভিতরে কি ছিলো, তা তোমাদের জানা নেই? তাঁদের ভিতরে ছিলো সিদ্দীকে আকবরের (রাঃ) আন্তরিকতা, উমর ফারুকের (রাঃ) মহৎ মন, উসমানের (রাঃ) বদান্যতা, আলী মুরতযার (রাঃ) শৌর্য এবং আসমান-যমিনের মালিক আল্লাহ্‌র প্রীয়তম পয়গাম্বরের দো'আ। তোমাদের মনে পড়ে, যেদিন কুফর ও ইসলামের পহেলা লড়াইয়ে তেগ ও কাফন নিয়ে তাঁরা তিনশ তেরো জন বেরিয়েছিলেন, সেদিন দীন-দুনিয়ার রহমতের নবী বলেছিলেনঃ 'আজ পুরো ইসলাম কুফরের পূর্ণ শক্তির মোকাবিলা করতে যাচ্ছে।' কিন্তু আজ এক নীচ মানুষ তোমাদের মুখের উপর বলছেঃ আমাদের চাইতে তাঁরা ছিলেন কমযোর। নাউ'যুবিল্লাহ্‌।'

নয়ীমের কথাগুলো সবারই মনের উপর দাগ কাটলো। একজন 'আল্লাহু আকবর' তক্‌বীর ধ্বনী করলো, আর সবাই তার সাথে আওয়ায তুললো। এর পর সবাই ফিরে ফিরে তাকাতে লাগলো ইব্‌নে সাদেকের দিকে। কেউ কেউ চাপা গলায় তার নিন্দাও শুরু করলো। নয়ীম বক্তৃতা করে চললেনঃ

'আমাদের দোস্ত ও বুযর্গগণ! খোদার রাহে জান, মাল ও দুনিয়ার তামাম স্বাচ্ছন্দ্য কোরবান করেন যে মুজাহিদ দল, তাঁদের উপর রাজ্য ও মালে-গণিমতের লোভের অপরাধ আরোপ করা না-ইনসাফী। দুনিয়ার লোভ যদি তাঁদের ভিতরে থাকতো, তাহলে মুষ্টিমেয় সহায় সম্বলহীন মুজাহিদ যে ভাবে কাফেরদের সংখ্যাহীন বাহিনীর সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছেন, আত্মদানের সে উদ্দাম-উৎসাহ তোমরা দেখতে পেতে না। রাজ্য লোভ নিয়ে বেরুলে বিজিত কওম কে তাঁরা দিতে পারতেন না সম অধিকার। আজো আমাদের ভিতরে এমন কেউ নেই, যে শাহাদতের পরিবর্তে মালে গণিমতের লোভ নিয়ে যাচ্ছে জিহাদের ময়দানে! মুজাহিদ শাসন-ক্ষমতা চায় না; কিন্তু খোদার

রাহে যারা সব কিছু কোরবান করে দিতে তৈরী, সব দিক দিয়ে দুনিয়ায় তাঁদের মাথা উচুঁ থাকায় বিস্ময়ের কিছু নেই। সাল্‌তানাত মুজাহিদের মহিমারই অংশ।

'মুসলমান ভাইরা! আমাদের অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা যেমন সিদ্দীকে আকবরের ঈমান ও আন্তরিকতার কাহিনীতে পরিপূর্ণ, তেমনি আবদুল্লাহ্‌ বিন উবাইর মুনাফেকির কাহিনী থেকেও তা মুক্ত নয়। সিদ্দীকে আকবরের (রাঃ) পদাংক অনুসরণকারীদের সামনে হামেশা যেমন থাকে ইসলামের সংগঠনী দৃষ্টিভংগী, তেমনি আবদুল্লাহ্‌ বিন উবাইর উত্তরাধিকারীরা হামেশা ইসলামের তরক্কীর পথে তুলে দেয় বাঁধার প্রাচীর; কিন্তু তার ফল কি হয়ে থাকে? আমি আবদুল্লাহ্‌ বিন্‌ উবাইর এই উত্তরাধিকারীর কাছে জিজ্ঞেস করছি।'

ইব্‌নে সাদেকের অবস্থাটা তখন চারদিক থেকে শিকারীর বেড়াজালের মধ্যে অবরুদ্ধ শিয়ালের মতো। সে তখন ঠিকই বুঝে নিয়েছে যে, কথার যাদুকর এ-নওজোয়ান আরো কয়েকটা কথা বললে সমবেত লোকজন সবাই তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি দেখে পিছন দিকে সরতে লাগলো। একজন বলে উঠলো, 'মুনাফেক পালাচ্ছে, ধর।' এক নওজোয়ান 'ধর ধর' আওয়ায করে তার উপর ঝাপিয়ে পড়লো। সাথীরা তাকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো, কিন্তু জনতার ভিড়ে টিকতে পারলো না। কেউ তাকে ধাক্কা মারে আর কেউ বা মারে চড়চাপড়। মুহম্মদ বিন্‌ কাসিম ছুটে এসে জনতার হাত থেকে বহু কষ্টে তার জান বাঁচিয়ে দিলেন।

ইব্‌নে সাদেক কোনমতে বিপদমুক্ত হয়ে ছুটে পালালো। কয়েকটি দুর্দান্ত নওযোয়ান শিকার হাতছাড়া হচ্ছে দেখে ছুটতে চাইলো পিছু পিছু। কিন্তু মুহাম্মদ বিন কাসিম বাধা দিলেন তাদেরকে। ইব্‌নে সাদেকের দলের লোকেরা একে একে বেরিয়ে গেলো মস্‌জিদ থেকে। আবার সবাই চুপ করে নয়ীমের দিকে মনোযোগ দিলে তিনি বলতে লাগলেনঃ

'এই দুনিয়ার প্রত্যেক অণু-পরমাণুর অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য আঘাতের জওয়াবে আঘাত দিতে হচ্ছে। তাই জিহাদ হচ্ছে মুসলমানের সব-চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। দুনিয়াকে শান্তির আবাস করে তুলবার জন্য জরুরী হচ্ছে কুফ্‌রের অগ্নিকুন্ড নিভিয়ে দেওয়া।'

'কুফ্‌রের যুলুমের আগুনে জ্বলছে যে অগণিত অসহায় মানুষ, বদর, হোনায়েন, কাদসিয়া, ইয়ারমুক ও আজনাদাইনের যুদ্ধের ময়দানে আমাদের পূর্ব পুরুষদের তক্‌বীর ধ্বনি ছিলো তাদেরই আর্ত হাহাকারের জওয়াব; আর আজাকের দুর্গত মানবতা সিন্ধুর ময়দানে আমাদের তলোয়ারের ঝংকার শুনবার জন্য বেকারার। মুসলমান! তোমাদের কওমের যে মেয়ে রয়েছে সিন্ধুরাজের কয়েদখানায় বন্দিনী, তাঁর ফরিয়াদ শুনেছো? আমি তোমাদের সিন্ধু বিজয়ের খোশ্‌খবর দিতে চাই।'

'মুজাহিদ হচ্ছে আল্লাহর তলোয়ার। যে শির তার সামনে উচুঁ হয়ে উঠবে, সে-ই হবে ধূলিলুন্ঠিত। সিন্ধুরাজ তোমাদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন তলোয়ারের তীক্ষ্ণধার ও বাযুর শক্তি পরীক্ষা করতে।'

'মুজাহিদ দল! জেগে উঠে প্রমাণ করে দাও যে, এখনো তোমাদের শিরায় আরবের শাহ্‌ সওয়ারদের রক্তধারা জমে যায়নি। একদিকে খোদাওন্দ করীম তোমাদের জিহাদী মনোভাবের পরীক্ষা নেবেন এবং অপরদিকে দুনিয়া তোমাদের আত্মমর্যদাবোধের পরীক্ষা নিতে যাচ্ছে। তোমরা এ পরীক্ষার জন্য তৈরী?'

'আমরা সবাই তৈরী, আমরা সবাই তৈরী'-এই গগণভেদী আওয়ায তুলে বুড়ো-জোয়ান সবাই তরুণ মুজাহিদের ডাকে সাড়া দিলো।

নয়ীম বৃদ্ধ ওস্তাদের দিকে তাকালেন। তাঁর ঠোঁটে মৃদু হাসি আর চোখে আনন্দের আঁসু। ইবনে আমের আবার উঠে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার পর ভর্তির জন্য নাম পেশ করবার জরুরি নির্দেশ দিলে সভা ভাঙলো।

রাতের বেলা মুহাম্মদ বিন কাসিমের গৃহে ইবনে আমের, সাঈদ, নয়ীম ও শহরের আরো কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি দিনের ঘটনাবলীর আলোচনায় ব্যস্ত। নয়ীমের প্রভাব কেবল বসরার নওজোয়ানদের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েনি, বরং তাঁর প্রশংসা শোনা যাচ্ছে বয়স্ক লোকদেরও মুখে মুখে। ইবনে আমের তাঁর সুযোগ্য শাগরেদকে ভালো করেই জানতেন। তিনি জানতেন যে, অকুতোভয়ে যে কোনো বিপজ্জনক পরিস্থিতির মোকাবিলা করবার মতো যোগ্যতা তাঁর ভিতরে রয়েছে পুরোমাত্রায়; কিন্তু নয়ীম আজ যা করেছেন, তা তাঁর প্রত্যাশার চাইতেও অনেক বেশি। সাঈদের খুশীরও সীমানা নেই। তিনি বারবার নওজোয়ান ভাগ্নের মুখের দিকে তাকান আর তাঁর মুখ থেকে উৎসারিত হয় তার দীর্ঘ জীবন কামনার নেক দোয়া। বক্তৃতার শেষে নয়ীমকে উৎসাহিত করবার জন্য তিনি সবার আগে ফউজে শামিল হবার জন্য নিজের নাম পেশ করেছেন এবং মকতবে তাঁর খেদমতের সবচাইতে জরুরি প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার জন্য তৈরি হয়েছেন। ইবনে আমেরের দুর্বল হাতে তলোয়ার ধরার তাকৎ আর নেই, তথাপি তিনি তাঁর সুযোগ্য শাগরেদ মুহাম্মদ বিন কাসিম ও নয়ীমের সাথী হবার ইরাদা জানিয়েছেন। কিন্তু বসরার লোকেরা তাঁকে বাধা দিয়ে একবাক্যে বলেছে, 'মদ্রাসায় আপনার প্রয়োজন সবচাইতে বেশি।' বসরার লোকেরা সাঈদকেও বাধা দিতে চেয়েছে, কিন্তু মুহাম্মদ বিন কাসিম অগ্রবর্তী দলের নেতৃত্বের জন্য একজন অভিজ্ঞ সালারের প্রয়োজন অনুভব করে তাঁকে নিয়েছেন সেনা বাহিনীর শামিল করে।

নয়ীম প্রতি মুহূর্তে এক মনযিলের নিকটবর্তী হচ্ছেন, আর এক মনযিল থেকে সরে যাচ্ছেন দূরে-বহুদূরে। তিনি মজলিসে বসে বেপরোয়া হয়ে শুনছেন সব আলোচনা। ইবনে আমের অভ্যাসমতো বর্ণনা করে যাচ্ছেন কুফ্‌র ও ইসলামের গোড়ার দিকের সংঘাতের কাহিনী। তিনি আলোচনা করছেন ইসলামের আযীমুশ্‌শান মুজাহিদ খালিদ বিন ওয়ালীদের হামলার বিভিন্ন তরিকা।

কে যেন বাইরে থেকে দরজায় করাঘাত করলো। মুহাম্মদ বিন কাসিমের গোলাম দরজা খুলে দিলো। এক বৃদ্ধ আরব এক হাতে একটি পুটলি ও অপর হাতে লাঠি নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। বৃদ্ধের ভুরু পর্যন্ত ভার্ধক্যে সাদা হয়ে গেছে। তাঁর মুখে পুরনো যখমের দাগ। দেখে মনে হয় এককালে তিনি খেলেছেন তলোয়ার-নেযাহ নিয়ে। ইব্‌নে আমের তাকে চিনতে পেরে এগিয়ে এসে মোসাফেহা করলেন। বৃদ্ধ ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'মকতবে আমি আপনাকে খুঁজে এসেছি। সেখানে শুনলাম আপনি এখানে এসেছেন।'

'আপনি বড়ই তকলীফ করেছেন। বসুন।'

বৃদ্ধ ইব্‌নে আমেরের কাছে বসলেন।

ইব্‌নে আমের তাঁকে বললেন, 'বহুদিন পর আপনার যিয়ারত নসীব হলো। বলুন, কি করে এলেন?'

বৃদ্ধ বললেন, 'আজকের মসজিদের ঘটনা শুনেছি লোকের মুখে। যে নওজোয়ানের হিম্মতের তারিফ করছে বসরার বাচ্চা -বুড়ো সবাই, তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি আমি। শুনলাম, সে নাকি আবদুর রহমানের বেটা। আবদুর রহমানের বাপ ছিলেন আমার অতি বড় দোস্ত। ছেলেটির সাথে দেখা হলে আমার তরফ থেকে কয়েকটি জিনিস আপনি তাকে দেবেন।'

বৃদ্ধ তাঁর পুটলি খুলে বললেন, 'পরশু তুর্কীস্তান থেকে খবর পেয়েছি, উবায়দা শহীদ হয়েছে।'

'কোন উবায়দা? আপনার নাতি?' ইব্‌নে আমের প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ তাই। আমার ঘরে তার এই তলোয়ার আর বর্ম ফালতু পড়েছিলো। আমার ঘরে এ সব জিনিসের হক আদায় করবার মতো কেউ নেই আর। তাই আমার ইচ্ছা, কোন মুজাহিদকে এগুলো নযরানা দেবো।'

ইব্‌নে আমের নয়ীমের দিকে তাকালেন। তাঁর মতলব বুঝতে পেরে নয়ীম উঠে গিয়ে বৃদ্ধের কাছে বসতে বসতে বললেন, 'আপনার গুণগ্রাহিতায় আমি ধন্য। যথাসাধ্য আপনার তোহফার সদ্ব্যবহার আমি করবো। আমায় আপনি দোয়া করুন।'

মধ্যরাত্রের কাছাকাছি মজলিস শেষ হলে সবাই যার যার ঘরে চলে গেলেন। নয়ীম তাঁর মামুর সাথে যেতে চাইলেন, কিন্তু মুহম্মদ বিন কাসিম তাঁকে কাছে রাখলেন।

মুহম্মদ বিন্ কাসিমের অনুরোধে সাঈদ নয়ীমকে সেখানে থাকতে বললেন। ইব্‌নে আমের ও সাঈদকে বিদায় দেবার জন্য নয়ীম ও মুহম্মদ বিন্ কাসিম ঘরের বাইরে এলেন এবং কিছু দূর গেলেন তাঁদের সাথে সাথে। নয়ীমের সাথে তখনও সাঈদের কোনো আলাপ হয়নি বাড়ি ঘর সম্পর্কে। চলতে চলতে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'নয়ীম , বাড়ির খবর সব ভাল তো?'

'জি হ্যাঁ, মামুজান! বাড়িতে সবাই ভাল। আম্মিজান.....।' নয়ীম আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। চিঠিটা বের করবার মতলব করে তিনি হাত ঢুকালেন জেবের মধ্যে, কিন্তু কি যেন চিন্তা করে খালি হাতই জেব থেকে বের করলেন।

'হ্যাঁ, বোন কি বলেছিলেন?'

'তিনি আপনাকে সালাম জানিয়েছেন মামুজান!'

বাকী রাতটা নয়ীম বিছানায় পড়ে এপাশ-ওপাশ করে কাটালেন। ভোর হবার খানিকটা আগে তাঁর চোখে নামলো ঘুমের মায়া। তিনি স্বপ্নে দেখলেন, তিনি যেনো তাঁর এলাকার বাগিচার মুগ্ধকর পরিবেশে মহব্বতের সুরঝংকারের মাঝখানে প্রিয়তমার সান্নিধ্য থেকে দূরে-বহুদূরে সিন্ধুর দিগন্তপ্রসারী ময়দানে যুদ্ধের বিভীষিকাময় দৃশ্যের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

পরদিন নয়ীম ফউজের একজন সিপাহসালার হিসাবে রওয়ানা হয়ে গেলেন। প্রতি পদক্ষেপে তিনি যেনো তাঁর আর্যুর পুরানো লোকালয় ভেঙে দিয়ে চলেছেন আর সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন নতুন আকাংখার দুনিয়া গড়তে গড়তে। সন্ধ্যার খানিকক্ষণ আগে তাঁর লশকর চলেছে এক উঁচু টিলার উপর দিয়ে। যে বাগিচার ছায়ায় নয়ীম কত সুখ-শান্তির দিন কাটিয়েছেন তারই দিকে নযর পড়ছে এখান থেকে। এ পথ থেকে দু'ক্রোশ দূরে রয়েছে তাঁর যৌবনের নিষ্পাপ আশার মূর্ত প্রতীক, তাঁর অন্তরের আকাংখিত প্রিয়জন। মন চায় তখ্খুনি তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যান সেই মরুভূমির হুরের কাছে, তাঁকে দু'টো কথা বলেন, দু'টো কথা শুনে আসেন তাঁর কাছ থেকে এই বিদায় মুহূর্তে। কিন্তু মুজাহিদদের আত্মা এ সূক্ষ্ম অনুভূতির উপর হয় বিজয়ী। জেব থেকে তিনি চিঠিটা বের করেন, পড়েন, আবার তা' গুঁজে রাখেন জেবের মধ্যে।

বাড়িতে আবদুল্লাহ ও নয়ীমের শেষ কথাবার্তা শুনবার পর উয্‌রার খুশীর অন্ত নেই। তার রূহ্ যেন আনন্দের সপ্তম আসমানে উড়ে বেড়াচ্ছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে যেন শুনতে পাচ্ছে আসমানের সিতারাদের নির্বাক সংগীত। সারা রাত জেগে থেকেও যেন তার মুখে ফুটে উঠেছে আগের চাইতে বেশী খুশীর আভাস। হতাশার আগুনে জ্বলে পুড়ে যাবার পর আশাতরু আবার ফুলে ফুলে সবুজ হয়ে উঠেছে।

আবদুল্লাহ্‌র উপকারের বোঝা যেনো ভারাক্রান্ত করে তুলেছে উয্‌রার মন। তার অন্তহীন আনন্দের ভিতরে ব্যাথা হয়ে বাজে আবদুল্লার উপকারের গোপন লজ্জা। সে ভাবে, আবদুল্লাহ্‌র এ ত্যাগ তো শুধু নয়ীমের জন্যই নয়, তাদের দু'জনেরই জন্য। তাঁর মুহব্বত কতো নিঃস্বার্থ! কতোটা ব্যথা তাঁর মনে লেগেছে! আহা! সে যদি এমনি করে ব্যথা না দিয়ে পারতো! আহ! নয়ীমকে যদি সে এতটা মুহব্বত না করতো আর আবদুল্লাহ্‌র দীলে এমনি করে আঘাত না দিতো! কল্পনার এই বেদনাদায়ক অনুভূতি মুহূর্তের মধ্যে চাপা পড়ে যায় তার অন্তর থেকে উৎসারিত আনন্দের সুরঝংকারে।

উয্‌রা ভেবেছে, নয়ীম ফিরে আসবেন সন্ধ্যার আগেই। বড়ো কষ্টে কেটেছে তার ইনতেযারের দিন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, কিন্তু নয়ীম ফিরে এলেন না। গোধূলির ম্লানিমা যখন রাত্রির অন্ধকারে রূপান্তরিত হতে লাগলো, আসমানের কালো পর্দায় ঝিক্‌মিক করতে লাগলো অসংখ্য সিতারার মোতি, তখন উয্‌রার অস্থিরতা ক্রমাগত বেড়ে চললো। মধ্যরাত্রি অতীত হয়ে গেলো, দুঃখের রাতকে আশার সান্ত্বনা দিয়ে উয্‌রা পাশ

ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। পরের দিনটি কাটলো আরো অস্থিরতার ভিতর দিয়ে এবং পরের রাতটি হলো যেনো আরো দীর্ঘ।

আবার ভোর কেটে গেলো, সন্ধ্যা হলো, কিন্তু নয়ীম ফিরে এলেন না। সন্ধ্যাবেলা উয্‌রা ঘর থেকে বেরিয়ে কিছু দূরে এক টিলার উপর গিয়ে নয়ীমের পথ চেয়ে রইলো। বসরার পথে বার বার ধূলো উড়ছে কম বেশি করে। বারবার সে ভাবে, ওই বুঝি নয়ীম এলেন। প্রতিবার হতাশ হয়ে সে চেপে ধরে তার কম্পিত বুক। উট-ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে চলে যায় কতো পথিক। দূর থেকে সে দেখে, বুঝি নয়ীম এলেন; কিন্তু কাছে এলেই সে দেখে, সব ভুল। সন্ধ্যার ঠান্ডা হাওয়া বইছে। রাখাল ফিরে যাচ্ছে আপন ঘরে। গাছের উপর কল-গুঞ্জন করে পাখীরা তাদের সমজাতীয় পাখীদেরকে জানাচ্ছে সন্ধ্যার আগমনী পয়গাম। উয্‌রা ঘরে ফিরে যাবার ইরাদা করেছে, অমনি পিছন থেকে শুনতে পেলো কার পায়ের আওয়ায। ফিরে দেখলো; আবদুল্লাহ্ আস্‌ছেন। হায়া ও লজ্জায় উয্‌রার চোখ নত হয়ে এলো। আবদুল্লাহ্ কয়েক কদম এগিয়ে এসে বললেন, 'উয্‌রা! এবার ঘরে চলো। চিন্তা করো না। নয়ীম শীগ্‌গিরই এসে পড়বে। বসরার কোনো বড়লোক দোস্ত ওকে আসতে বাধা দিয়েছেন।'

উয্‌রা কোনো কথা না বলে চললো ঘরের দিকে। পরদিন বসরা থেকে একটি লোক এলে জানা গেলো, নয়ীম রওয়ানা হয়ে গেছেন সিন্ধুর পথে। খবর পেয়ে সাবেরা, আবদুল্লাহ্ ও উয্‌রার মনে জাগলো নানারকম ধারণা। সাবেরা ও আবদুল্লাহ্‌র মনে সন্দেহ হলো, হয়তো নয়ীমের আত্মম্ভরিতা তাঁর মনকে ভাইয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে বিমুখ করেছে। উয্‌রার সন্দেহ তাদের থেকে ভিন্ন ধরনের। বসরার বড়ো বড়ো লোক তাঁর দোস্ত, আর তাঁদের কেউ তাঁকে আসতে বাঁধা দিয়েছেন, আবদুল্লার এই কথা তাঁর দীলের উপর গভীর রেখাপাত করেছে। বারবার সে মনে মনে বলছে, 'নয়ীমের দেহ সৌন্দর্য ও বাহাদুরীর খ্যাতি বড়ো বড়ো লোককে তাঁর কাছে টেনে এনেছে। তাঁরা হয়তো তাঁর সাথে সম্পর্ক রাখাটাকেই মনে করে গর্বের বিষয়। সম্ভবতঃ বসরার হাজারো সুন্দরী ও বড়ো ঘরের মেয়ে তাঁর কাছে আত্মনিবেদন করতে লালায়িত। আর আমার মধ্যে এমন গুণই বা কোথায়, যা' তাঁকে ফিরিয়ে রাখবে অপরের প্রতি আকর্ষণ থেকে! যদি তাঁর জিহাদে যেতেই হয়, তবু কেন আমায় বলে গেলেন না? তাঁকে বাঁধা দেবার মতো কে-ই আছে এ বাড়িতে? হয়তো এ এলাকায় তাঁর পেরেশানীর কারণ আমিই ছিলাম না। হয়তো আর কারুর সাথে তিনি পেতেছিলেন মুহব্বতের সম্পর্ক। .... কিন্তু না। তা কখনো হতে পারে না। নয়ীম-আমার নয়ীম...এমন তো নয় কখনো। তিনি তো আমায় ধোকা দিতে পারেন না। আর যদি দেনই, তা'হলেই বা তাঁকে নিন্দা করবার কি অধিকার আছে আমার?'

তখনকার যামানায় দেবল ছিলো সিন্ধুর এক মশহুর বন্দর। শহরের চার দেয়ালের উপর সিন্ধুরাজের এতটা ভরসা ছিল যে, ময়দানে নেমে মোকাবিলা না করে তিনি তাঁর বেশুমার ফউজ নিয়ে আশ্রয় নিলেন শহরের ভিতরে। মুহম্মদ বিন্ কাসিম শহর অবরোধ করে মিনজানিকের সাহায্যে প্রস্তর বর্ষণ শুরু করলেন, কিন্তু কয়েকদিনের কঠিন হামলা সত্ত্বেও মুসলিম বাহিনী শহরের দেয়াল ভাঙতে পারলো না। অবশেষে একদিন একটা ভারী পাথর পড়লো এক মশহুর বৌদ্ধ মন্দিরের উপর। মন্দিরের স্বর্ণ-গম্বুজ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়লো নীচে এবং তার সাথেই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেলো বুদ্ধের এক প্রাচীন মূর্তি। মূর্তিটি ভেঙে পড়ায় রাজা দাহির অশুভ লক্ষণ মনে করে ঘাবড়ে গেলেন এবং রাতের বেলায় ফউজ সাথে নিয়ে পালিয়ে গেলেন ব্রাহ্মণাবাদে।

দেবল বিজয়ের পর মুহম্মদ বিন্ কাসিম এগিয়ে এলেন নীরুনের দিকে। নীরুনের বাসিন্দারা লড়াই না করেই হাতিয়ার সমর্পণ করে দিলো।

নীরুন দখল করবার পর মুহম্মদ বিন্ কাসিম ভরোচ ও সিউস্তানের মশহুর কেল্লা জয় করলেন। রাজা দাহির ব্রাহ্মণাবাদে পৌছে চারদিকে দূত পাঠালেন এবং হিন্দুস্তানের রাজা-মহারাজাদের কাছে সাহায্যের আবেদন করলেন। তাঁর আবেদনে দু'শো হাতী ছাড়া আরো পঞ্চাশ হাজার ঘোড়সওয়ার ও কিছু সংখ্যক পদাতিক সিপাহী এসে জমা হলো তাঁর পাশে। রাজা দাহির বিপুল সেনাসামন্ত সাথে নিয়ে ব্রাহ্মণাবাদের বাইরে এসে সিন্ধুনদের কিনারে এক বিস্তৃত ময়দানে তাঁবু ফেলে মুহম্মদ বিন্ কাসিমের আগমন প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

মুহম্মদ বিন্ কাসিম কিশ্‌তির সেতু রচনা করে সিন্ধুনদ পার হলেন। ইসায়ী ৭১৩ সালের ১৯ শে জুন মুহম্মদ বিন্ কাসিমের ফউজ এসে সন্ধ্যাবেলায় তাঁবু ফেললো রাজার তাঁবু থেকে দুই ক্রোশ দূরে। ভোর বেলা বেজে উঠলো শংখঘন্টা এবং অপরদিকে জেগে উঠলো 'আল্লাহু আকবর' তক্‌বরী ধ্বনি এবং দুই লশ্‌কর নিজ নিজ দেশের সামরিক রীতি অনুযায়ী সংঘবদ্ধভাবে এগিয়ে চললো পরস্পরের দিকে।

মুহম্মদ বিন কাসিম তার ফউজকে পাঁচশ' সিপাহীর ছোট ছোট দলে ভাগ করে হুকুম দিলেন সামনে এগিয়ে যেতে। অপরদিকে সিন্ধুর ফউজে সবার আগে দু'শো হাতী এগিয়ে এলো। ভয় পেয়ে মুসলিম বাহিনীর ঘোড়াগুলো পিছু হটে যেতে লাগলো। এ সব দেখে মুহম্মদ বিন কাসিম তাঁর ফউজকে হুকুম দিলেন তীর বর্ষণ করতে। একটি হাতী মুসলিম সিপাহীদের সারি দলিত করে এগিয়ে এলো সামনের দিকে। মুহম্মদ বিন্ কাসিম তার মোকাবিলা করবার জন্য এগিয়ে যেতে চাইলেন, কিন্তু তাঁর ঘোড়া সেই ভয়ংকর জানোয়ারের কাছেও যেতে চাইলো না ভয়ে। মুহম্মদ বিন্ কাসিম বাধ্য হয়ে নেমে পড়লেন ঘোড়া থেকে এবং এগিয়ে গিয়ে হাতীর শুঁড় কেটে ফেললেন। নয়ীম ও সাঈদ তাঁর মতোই এগিয়ে গিয়ে কেটে দিলেন আরও দু'টি হাতীর শুঁড়। আহত হাতী উলটো দিকে ঘুরে সিন্ধুর ফউজকেই দলিত করে বেরিয়ে গেলো। বাকী হাতীগুলো তীরবৃষ্টির ভিতর দিয়ে এগুতে পারলো না। তারা যখমী হয়ে সিন্ধুর সিপাহীদের সারি ছিন্নভিন্ন করে চললো। সুযোগ বুঝে মুহম্মদ বিন কাসিম সামনের সারির সিপাহীদের এগিয়ে যেতে হুকুম দিলেন এবং পিছনের দলগুলোকে হুকুম দিলেন তিন দিক থেকে দুশমন ফউজকে

ঘিরে ফেলতে। মুসলিম বাহিনীর প্রাণপাত সংগ্রামের ফলে দুশমন ফউজের পা টলে গেল। সাঈদ কয়েকজন দুঃসাহসী যোদ্ধাকে সাথে নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীদের সারি ভেদ করে গিয়ে পৌছলেন দুশমন বাহিনীর মধ্যভাগে। নয়ীমও তাঁর বাহাদুর মামুর পিছনে পড়ে থাকতে রাযী ছিলেন না, তাই তিনি নেযাহ হাতে পথ খোলাসা করে এগিয়ে গেলেন তাঁর কাছে। রাজা দাহির তাঁর রাণীদের মাঝখানে এক হাতীর উপর সোনার আসনে বসে দেখেছিলেন যুদ্ধের দৃশ্য। তাঁর আগে কয়েকজন পূজারী একটি মূর্তি মাথায় নিয়ে ভজন গেয়ে চলেছে। সাঈদ বলে উঠলো, 'এই মূর্তি হচ্ছে ওদের শেষ অবলম্বন। ওটাকে ভেঙে ফেল।'

নয়ীম এক পূজারীর সিনার উপর তীর মারলেন এবং তখনি সে কলজের উপর হাত চেপে ধরে লুটিয়ে পড়লো যমিনের উপর। দ্বিতীয় তীর গিয়ে লাগলো আর এক পূজারীর উপর। অমনি সে মূর্তিটা ময়দানে ফেলে পিছু হটলো। এই মূর্তিটাই ছিল সত্যি তাদের শেষ আশা। তামাম ফউজে ছড়িয়ে পড়লো বিশৃংখলা। কঠিন আঘাত পেয়েও সাঈদ এগিয়ে চললেন সামনের দিকে। তিনি রাজা দাহিরের হাতীর উপর হামলা করলেন, কিন্তু রাজার রক্ষীর যোদ্ধারা তখন তাঁর চারদিকে জমা হয়ে গেছে। সাঈদ এবার তাদের নাগালের মধ্যে । সাঈদকে দুশমনবেষ্টিত দেখে নয়ীম ক্ষুধিত সিংহের মতো হামলা করে ছিন্ন ছিন্ন করে দিলেন দুশমন-বাহিনীকে। সাঈদের সন্ধানে তিনি চারদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করলেন, কিন্তু তাঁকে খুঁজে পেলেন না। আচানক তাঁর শূন্যপৃষ্ঠ ঘোড়াটিকে তিনি দেখতে পেলেন এদিক-ওদিক ছুটতে। নয়ীম এবার নীচে পড়ে থাকা লাশগুলোর দিকে তাকালেন। সাঈদ দুশমনদের কতকগুলো লাশের উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। নয়ীম ঘোড়া থেকে নেমে হাত দিয়ে তাঁর মামুর মাথাটা উপরে তুলে মামুজান বলে ডাকলেন, কিন্তু তাঁর চোখ আর খুললো না। নয়ীম 'ইন্নলিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেউন' বলে আবার ঘোড়ার পিঠে চাপলেন। রাজা দাহিরের হাতী তখন তাঁর কাছ থেকে বেশী দূরে নয়। কিন্তু তখনো বিশৃংখল সিপাহীদের এক দল তাঁকে ঘিরে রয়েছে।

নয়ীম আবার ধনুক হাতে নিয়ে তীর বর্ষণ শুরু করলেন রাজার দিকে লক্ষ্য করে। একটি তীর গিয়ে লাগলো রাজার সিনার উপর এবং রক্তাক্ত দেহে তিনি ঢলে পড়লেন এক রাণীর কোলের উপর। রাজার হত্যার খবর মশহুর হয়ে গেলে সিন্ধুর লশকর ময়দানের ভিতরে অগুণতি লাশ ফেলে পালালো। পরাজিত সিপাহীরা কতক গেলো ব্রাহ্মণাবাদে, আর কতক গেলো আরারের দিকে।

এই আযীমুশ্‌শান বিজয়ের পর মুসলমানরা যখমীদের শুশ্রূষা ও শহীদের দাফন-কাফনের কাজে ব্যস্ত হলেন; সাঈদের দেহে বিশটিরও বেশি যখমের নিশানা দেখা যাচ্ছিলো। তাঁর জেব থেকে ভাইয়ের চিঠিটা বের করে কবরের ভিতর ছুঁড়ে দিলেন।

মুহাম্মদ বিন্ কাসিম হয়রান হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কি ওটা?'

'একটা চিঠি।' নয়ীম বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন।

'কিসের চিঠি?'

'আবদুল্লাহ্ আমার কাছে দিয়েছিলেন ওটা। চিঠিটা আমি ওঁর কাছে পৌছে দেবার ওয়াদা করে এসেছিলাম। কিন্তু সে ওয়াদা পূরণ করাটা আল্লাহ্‌র মনযুর ছিলো না।'

'আমি ওটা দেখতে পারি?' মুহাম্মদ বিন কাসিম সুধালেন।

'ওর ভিতরে এমন কিছু নেই।'

মুহম্মদ বিন কাসিম নত হয়ে কবর থেকে তুলে নিলেন চিঠিখানা। পড়ে তিনি তা ফিরিয়ে দিলেন নয়ীমের হাতে। বললেন, 'এটা নিজের কাছে রেখে দাও। শহীদের দৃষ্টি থেকে দুনিয়া ও আখেরাতের কোনো কিছুই পুশিদা থাকে না।'

মুহম্মদ বিন কাসিমের কাছে নয়ীমের যিন্দেগীর কোনো রহস্যই পুশিদা ছিলো না। নয়ীমের জন্য আবদুল্লাহ্‌র ত্যাগ ও খোদার রাহে নয়ীমের শানদার কোরবানী তাঁর দীলের মধ্যে তাঁদের দু'ভাইয়ের প্রতি আগের চাইতে আরো গভীর মুহব্বত পয়দা করে দিলো।

রাতের বেলা ঘুমোবার আগে মুহম্মদ বিন কাসিম নয়ীমকে তাঁর তাঁবুতে ডেকে নিয়ে নানারকম কথাবার্তার পর বললেন, 'এবার আমরা কয়েকদিনের মধ্যে ব্রাহ্মণাবাদ জয় করে যাবো মুলতানের দিকে। ওখানে হয়ত আমাদের আরো বেশি সৈন্যবলের প্রয়োজন হবে। তাই আমার ধারণা, তোমায় আবার বসরায় পাঠাতে হবে। সিপাহী সংগ্রহ করবার জন্য তুমি ওখানে গিয়ে বক্তৃতা করে বেড়াবে। পথে তোমার বাড়ি হয়ে ওদের সবাইকে আশ্বাস দিয়ে যাবে।' 'ওদেরকে আশ্বাস দেবার কথা বলতে গেলে আমি ব্যাপারটিকে জিহাদের চাইতে বেশী গুরুত্ব দিচ্ছি না। নতুন সিপাহী ভর্তি সম্পর্কে আজকের লড়াইয়ে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, সিন্ধুর জন্য আর বেশি ফউজের প্রয়োজন নেই।'

'কিন্তু আমার ইরাদা শুধু সিন্ধু বিজয়েই সীমাবদ্ধ নয়। হিন্দুস্তান এক বিস্তীর্ণ রাজ্য। তোমায় যেতেই হবে।'

'একজন সিপাহী হিসাবে আপনার হুকুম মেনে চলা আমার ফরয, কিন্তু দোস্ত হিসাবে আমার প্রতি আপনার এ উপকারের প্রয়োজন নেই।'

'কোন উপকার?' মুহম্মদ বিন্ কাসিম প্রশ্ন করলেন।

'বসরায় পাঠাবার নাম করে আপনি আমায় বাড়ি ফিরে যাবার মওকা দিচ্ছেন। আমি এটাকেই মনে করছি উপকার।'

মুহম্মদ বিন্ কাসিম বললেন, 'যদি এ উপকারের সাথে আমার অথবা তোমার কর্তব্যের সংঘাত হতো, তাহলে কখখনো আমি তোমায় এজাযত দিতাম না; কিন্তু আপাততঃ এখানে তোমার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, ব্রাহ্মণাবাদ জয় করা আমাদের কাছে বাম হাতের খেলার মতো। এরপর এদিক ওদিক কয়েকটি মামুলী রাজ্যের বিদ্রোহ দমন করে আমরা এগিয়ে যাবো মুলতানের দিকে। ততদিনে তুমি স্বচ্ছন্দে ফিরে আসবে আর তোমার সাথে আসবে কমবেশী করে যেসব সিপাহী, তারা আমাদের তাকৎ যথেষ্ট বৃদ্ধি করতে পারবে।'

'আচ্ছা, কবে যেতে হবে আমায়?;

'যথাসম্ভব শীগগীর। যখন তোমায় সফরে এজাযত দেয়া হলো তখন কালই রওয়ানা হয়ে যাবে।'

মুহাম্মদ বিন্ কাসিমের সাথে আলাপের পর নয়ীম বসে থাকলেন সেখানেই, কিন্তু তাঁর কল্পনা তখন তাঁকে নিয়ে গেছে বহুদূরে সিন্ধুর সরযমিন থেকে হাজারো মাইল দূরে।

ভোর বেলা দেখা গেলো, নয়ীম বসরার পথে ফিরে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছেন।

সিন্ধুতে মুসলমানদের বিজয় অভিযান স্পর্কে হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে অবহিত করবার জন্য মুহম্মদ বিন্ কাসিম সিন্ধু থেকে বসরা পর্যন্ত দশ ক্রোশ দূরে দূরে সিপাহীদের চৌকি বসিয়েছেন। ডাক পাঠাবার জন্য প্রত্যেক চৌকিতে রাখা হয়েছে কতগুলো দ্রুতগামী ঘোড়া।

ভোরবেলায় নয়ীম রওয়ানা হলেন সিন্ধু থেকে বসরার পথে। প্রতি চৌকিতে ঘোড়া বদল করে তিনি দিনের সফরে পথ অতিক্রম করে যাচ্ছেন ঘন্টায়। রাতের বেলা তিনি বিশ্রাম করলেন এক চৌকিতে। ক্লান্তির দরুন তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন অল্প সময়ের মধ্য। মধ্যরাত্রের দিকে সিন্ধুর দিক থেকে আগত এক সওয়ারের লেবাস দেখে তাকে এক মুসলমান সিপাহী বলেই মনে হলো। চৌকিতে পৌঁছেই সে ঘোড়া থেকে নেমে বলতে লাগলো, 'আমি বসরায় যাচ্ছি এক অতি জরুরী খবর নিয়ে। আমার জন্য আর একটি ঘোড়া তৈরী করে দাও জলদী।'

সিন্ধুর যে কোন ব্যাপার সম্পর্কে নয়ীমের মনে ছিলো আগ্রহ। তিনি উঠে মশালের আলোয় দেখে নিলেন আগন্তুক লোকটিকে। লোকটি গন্দমী রঙের সুগঠিত দেহ জোয়ান।

'তুমি মুহম্মদ বিন্ কাসিমের পয়গাম নিয়ে যাচ্ছো?'

'জি হ্যাঁ!'

'কি পয়গাম?'

'কাউকেও তা বলবার এজাযত তো নেই।'

'আমায় চেনো তুমি?'

'জি হ্যাঁ, আপনি আমাদের ফউজের এক সালার। কিন্তু মাফ করবেন, যদিও আপনাকে বলায় কোন ক্ষতি নেই, তথাপি সিপাহ্সালারের হুকুম। হাজ্জাজ বিন্ ইউসুফ ছাড়া আর কাউকেও দেওয়া যাবে না এ পয়গাম।'

'আমি তোমার কর্তব্যনিষ্ঠার তারিফ করছি।' নায়ীম বললেন।

ইতিমধ্যে আর একটি ঘোড়া তৈরী হয়ে গেছে। দেখতে দেখতে অগান্তুক তার উপর সওয়ার হয়ে এক নিমেষে মিলিয়ে গেলো রাত্রির অন্ধকারে।

কয়েকদিন পর নয়ীম তাঁর সফরের তিন-চতুর্থাংশ শেষ করে এক মনোমুগ্ধকর উপত্যকা-ভূমির ভিতর দিয়ে পথ চলছেন। পথের মধ্যে আবার সেই সওয়ার তাঁর নযরে পড়লো। নয়ীম ভালো করে দেখে চিনতে পারলেন তাঁকে। লোকটি নয়ীমের কাছে এসে ঘোড়া থামিয়ে বললো, 'আপনি এসেছেন খুব দ্রুত গতিতে। আমার ধারণা ছিলো, আপনি অনেকখানি পিছনেই পড়ে থাকবেন।'

'হ্যাঁ, আমি পথের মধ্যে তেমন আরাম করিনি।'

'আপনিও কি তবে বসরায় যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, সেদিন যদি তুমি খানিকক্ষণ ইন্তেযার করতে, তা'হলে সারাটা পথ আমরা একত্রে সফর করতে পারতাম।'

'আমার ধারণা ছিলো, আপনি কিছুটা আরামে সফর করবেন।... চলুন, ঘোড়া আগে বাড়ান।'

'আমার মনে হয়, এসব রাস্তা তুমি বেশ ভালো করে চেন।'

'জি হ্যাঁ, এ দেশে আমি বহুদিন কাটিয়েছি।'

'চলো, তা'হল তুমিই আগে চলো।'

আগন্তুক ঘোড়া আগে বাড়িয়ে দ্রুতগতিতে ছুটে চললো। নয়ীম চললেন তার পিছু পিছু। খানিকক্ষণ পর নায়ীম প্রশ্ন করলেন, 'পরের চৌকি দেখা যাচ্ছে না কেন? আমরা পথ ভুলে আসিনিতো?'

নয়ীমের সাথী ঘোড়া থামিয়ে পেরেশানির ভাব করে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলো। অবশেষে সে বললো, 'আমার তো তাই মনে হচ্ছে। আপনার কোন চিন্তা নেই। এই উপত্যকা পার হয়ে গেলেই আমরা ঠিক পথ খুঁজে পাবো।' বলেই সে আবার ঘোড়া ছুটালো। আরো কয়েক ক্রোশ চলবার পর আগন্তুক ঘোড়া থামিয়ে বললো, 'সম্ভবতঃ আমরা সঠিক পথ থেকে বহুদূরে একদিকে সরে এসেছি। আমার মনে হয়, এ পথ শিরাযের দিকে গেছে। আমাদেরকে এবার বাম দিকে মোড় ঘুরতে হবে। কিন্তু ঘোড়া বড়োই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এখানে খানিক্ষণ আরাম করলেই ভাল হবে।' সবুজ শ্যামল গাছ-গাছড়া ভরা এলাকাটি এমন নয়নমুগ্ধকর যে, ক্লান্ত দেহ নিয়ে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করার জন্য আগন্তুকের কথায় নয়ীম সায় দিলেন। ঘোড়া দু'টোকে এক ঝরণার পানি পান করিয়ে গাছের সাথে বেঁধে রেখে তাঁরা বসে পড়লেন সবুজ ঘাসের বিছানার উপর।

আগন্তুক তার থলে খুলতে খুলতে বললো, 'আপনার তো ক্ষিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই? আমি পিছনের চৌকিতে পেট পুরে খেয়ে নিয়েছি। সামান্য কিছুটা খানা হয়তো আপনারই জন্য বেঁচে গিয়েছিলো।'

আগন্তুকের অনুরোধ নয়ীম রুটি আর পনীরের কয়েকটি টুকরো খেয়ে নিলেন। তারপর ঝরণার পানি পান করে ঘোড়ায় সওয়ার হতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু মস্তিষ্কে তীব্র ঘুর্ণন অনুভব করে শুয়ে পড়লেন ঘাসের উপর।

'আমার মাথা ঘুরছে।' তিনি আগন্তুককে লক্ষ্য করে বললেন।

আগন্তুক বললো, 'আপনি খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। খানিক্ষণ আরাম করে নিন।'

'না, দেরী হয়ে যাচ্ছে। আমাদের এখখুনি চলতে হবে।' বলে নয়ীম উঠলেন, কিন্তু কম্পিত পদে খানিকটা চলেই আবার বসে পড়লেন যমিনের উপর।

আগন্তুক তাঁর দিকে তাকিয়ে ভয়ংকর অট্টহাসি করে উঠলো। নয়ীমের দীলের মধ্যে তখখুনি সন্দেহ হলো, লোকটা খানার মধ্যে কোন একটা মাদক দ্রব্য দিয়েছে তাঁকে। অমনি তাঁর মনে অনুভূতি জাগলো, তিনি এক ভয়ানক মুসীবতে গ্রেফতার হতে চলেছেন। তিনি আর একবার উঠতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁর হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে এসেছে। তাঁর মস্তিষ্কে ছেয়ে এসেছে গভীর নিদ্রার মাদকতা। অর্ধ-অচেতন অবস্থায় তিনি অনুভব করলেন, কয়েকটি লোক তাঁর হাত-পা বাঁধছে। তাদের লৌহকঠিন বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য তিনি হাত-পা মারতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁর সকল চেষ্টা হলো নিষ্ফল। তখন তিনি প্রায় বেহুঁশ। তিনি সামান্যমাত্র অনুভব করেছিলেন যে, কয়েকটি লোক তাঁকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে আর কোথাও।

পরদিন যখন নয়ীমের হুঁশ হলো, তখন তিনি এক সংকীর্ণ কুঠরীতে বন্দী। যে অচেনা লোকটি তাঁকে প্রতারণা করে সেখানে এনেছে, সে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে। এদি-ওদকি তাকিয়ে নয়ীম তার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে প্রশ্ন করলেন, 'আমায় এখানে আনার পশ্চাতে তোমার কি উদ্দেশ্য? আমি কার কয়েদ খানায় বন্দী?

'সময় এলেই এসব প্রশ্নের জওয়াব পাবে।' অচেনা লোকটি বাইরে গিয়ে কুঠরীর দরজা বন্ধ করে দিলো।

কয়েদখানায় নয়ীমের তিন মাস কেটে গেলো। তাঁর অন্তরের হতাশা যেন কয়েদখানার ভয়ানক অন্ধকারকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে। আল্লাহ তাঁর সবরের পরীক্ষা নিচ্ছেন, এইমাত্র তাঁর সান্ত্বনা। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় এক ব্যক্তি এসে কয়েদখানার দেওয়ালের একটি ছোট ছিদ্রপথ দিয়ে খানা পৌঁছে দিয়ে চলে যায়।

নয়ীম কয়েকবার প্রশ্ন করেছেন, 'আমায় কয়েদ করেছে কে? কি কারণে আমায় কয়েদ করলো?'

কিন্তু কোন প্রশ্নেরই জওয়াব মেলে না। তিন মাস এমনি করে কেটে যাবার পর একদিন ভোরে নয়ীম যখন আল্লার দরগায় সিজদা করে দো'য়া করছেন, তখনই কুঠরীর দরযা খুলে সেই অচেনা লোকটি কয়েকজন সাথী নিয়ে এসে হাযির হলো। সে নয়ীমকে বললো, 'উঠে আমাদের সাথে এসো।'

'কোথায়?' নয়ীম প্রশ্ন করলেন।

'একজন তোমায় দেখতে চাচ্ছে।' সে জেওয়াবে বললো।

নয়ীম নাংগা তলোয়ারের পাহারায় চললেন তাদের সাথে সাথে।

কেল্লার এক সুদৃশ্য কামরায় ইরানী গালিচার উপর কয়েকটি নওজোয়ানের মাঝখানে এক বৃদ্ধ উপবিষ্ট। নয়ীম তাকে দেখেই চিনলেন। লোকটি ইব্‌নে সাদেক।

সাত

ইব্‌নে সাদেকের অতীত যিন্দেগী ক্রমাগত ব্যর্থতার এক দীর্ঘ কাহিনী। সে পয়দা হয়েছিলো জেরুজালেমের এক স্বচ্ছল ইহুদী পরিবারে। বুদ্ধি-বৃত্তির বলে ষোল বছর বয়সে তার অসাধারণ দখল জন্মাল আরবী, ফারসী, ইউনানী ও ল্যাতিন ভাষায়। তার বয়স যখন আঠারো তখন সে প্রেমে পড়লো মরিয়ম নামে এক ঈসায়ী মেয়ের। মেয়েকে তার সাথে শাদী দিতে মরিয়মের বাপ-মাকে রাযী করতে গিয়ে সে হয়ে গেলো ঈসায়ী। কিন্তু মরিয়ম কিছুদিন তাঁর মন ভুলিয়ে প্রেমে পড়লো তারই চাচাতো ভাই ইলিয়াসের। তারপর থেকেই সে ঘৃণার চোখে দেখতে লাগলো ইব্‌নে সাদেককে। বহু চেষ্টা করে ইব্‌নে সাদেক শাদীর জন্য রাযী করালো মরিয়মের বাপ-মাকে। কিন্তু মরিয়ম একদিন মওকা পেয়ে তার প্রেমিককে নিয়ে ফেরার হয়ে চলে গেলো দামেস্কের পথে। দামেস্কে গিয়ে তাদের শাদী হয়ে গেলো। মরিয়মের প্রেমে ও স্বভাবে মুগ্ধ ইলিয়াসও ঈসায়ী মযহাব এখতিয়ার করলো।

ইলিয়াস ছিলো এক দক্ষ রাজমিস্ত্রী। দামেস্কে তার প্রচুর আয়-রোযগারের পথ খুলে গেলো। সেখানে বাড়ি তৈরী করে তারা কাটাতে লাগলো তাদের যিন্দেগী। এক বছর পর তাদের ঘরে পয়দা হলো এক শিশু-কন্যা। তার নাম রাখা হলো জোলায়খা।

কঠিন সন্ধানের পর ইবনে সাদেক পেলো তাদের খোঁজ। সেও এসে হাযির হলো দামেস্কে। সেখানে তার মাশুক ও ভাইকে আয়েশ-আরামে যিন্দেগী কাটাতে দেখে তার দীলের মধ্যে জ্বলে উঠলো প্রতিহিংসার অগ্নিশিখা। কয়েকদিন সে ঘুরে বেড়ালো দামেস্কের অলিগলিতে। তারপর ইসলাম কবুল করে সে গিয়ে হাযির হলো দরবারে খিলাফতে। খলিফার কাছে মরিয়মকে দাবী করে সে আবেদন জানালো যে, তাকে ইলিয়াসের ঘর থেকে ছিনিয়ে এনে তার হাতে সপে দেওয়া হোক। দরবারে খিলাফত থেকে হুকুম হলো যে, ইহুদী ও ঈসায়ীরা মুসলমানদের আমানত। তাছাড়া মরিয়ম তার নিজের মরযী মতো শাদী করেছে, তাই তাকে বাধ্য করা যাবে না। হতাশ ইবনে সাদেক এরপর না রইলো ইহুদী, না ঈসায়ী আর না মুসলমান। চারদিকের হতাশা তার দীলের মধ্যে ধূমায়িত করে তুললো প্রতিহিংসার অগ্নিজ্বালা!

দামেস্কে কিছুদিন ঘুরে ফিরে কাটিয়ে সে চলে গেলো কুফায়। হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে সে তার অতীত কাহিনী শুনিয়ে তাঁর কাছে পেশ করলো সাহায্যের আবেদন। হাজ্জাজ চুপ করে শুনলেন তাঁর কাহিনী। তাঁকে চুপ করে থাকতে দেখে ইবনে সাদেক সেই সুযোগে তাঁর তারিফ করলো আর দরবারে খিলাফতের নিন্দা করে কয়েকটি কথা বলে ফেললো।

সে বললো, 'আপনি আমার দীলের কথা শুনতে চাইলে আমি বলবো, ব্যক্তিগত যোগ্যতার দিক দিয়ে আপনি হচ্ছেন খিলাফতের মসনদের সবচাইতে বড়ো হকদার।'

ইবনে সাদেক তার কথা শেষ করবার আগেই হাজ্জাজ এক সিপাহীকে আওয়ায দিয়ে ইবনে সাদেককে ধাক্কা মেরে শহরের বাইরে বের করে দেবার হুকুম জারী করলেন।

তারপর ইবনে সাদেককে লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমায় মৃত্যুদন্ড দেওয়াই উচিত ছিলো, কিন্তু মেহমান হয়ে তুমি এখানে এসেছো বলেই তোমায় আমি মাফ করে দিচ্ছি।'

ইবনে সাদেক সন্ধ্যাবেলায় শহর থেকে বেরুলো। রাতটা এক পাদরীর ঝুপড়িতে কাটিয়ে ভোরবেলা এক ভয়ানক চক্রান্ত মাথায় নিয়ে সে ধরলো জেরুজালেমের পথ। জেরুজালেমেও সে থাকতে পারলো না বেশী সময়। তার ভাই ও তার মাশুকই নয়, গোটা দুনিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার মনোভাব নিয়ে সে ঘুরে বেড়াতে লাগলো দেশ-দেশান্তরে। শেষ পর্যন্ত সে গড়ে তুললো দুর্বৃত্তদের এক ভয়ানক জামাত এবং এক কঠিন ষড়যন্ত্রের সংকল্প নিয়ে তাদেরকে ছড়িয়ে দিলো তামাম দেশে দেশে। সে হলো সেই ছোটখাটো জামাতের আত্মিক ও রাজনৈতিক নেতা। একদিন সে তার চাচাতো ভাইর উপর প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করবার মওকা পেয়ে গেলো। তার একমাত্র কন্যা জোলায়খাকে সে চুরি করে নিয়ে গেলো। জোলায়খার বয়স তখন আট বছর। ইবনে সাদেক তাকে নিয়ে পালালো ইরানের দিকে। মাদায়েনে তার জামাতের ইসহাক নামে একটি লোকের হাতে তাকে সোপর্দ ক'রে দিয়ে সে আবার লেগে গেলো তার ধ্বংসাত্মক সংকল্প হাসিল করবার কাজে। দু'মাস পরে তার দলের গোপন কর্মীরা হত্যা করলো ইলিয়াস ও মরিয়মকে। এই নৃশংস হত্যার পরও সে নিরস্ত হলো না। ইবনে সাদেকের বাকী যিন্দেগী তামাম দুনিয়ার জন্য হয়ে উঠলো ভয়াবহ। আলমে ইসলামের রাজনৈতিক আধিপত্য হাসিল করার জন্য সে লিপ্ত হলো হুকুমাতের বিরুদ্ধে কঠোর ষড়যন্ত্রে। খারেজী ও ইসলামের দুশমনদের ভিতর থেকে কতক লোক তাকে পূর্ণ সমর্থন করলো, কিন্তু তখনো তাঁদের পথে বাঁধা হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে আর্থিক অসুবিধা। হঠাৎ তার মাথায় এলো এক নতুন ধারণা। সে কয়েক মাসের সফর কয়েক হফতায় শেষ করে গিয়ে হাযির হলো রোমের সীজারের দরবারে।

সীজার যদিও পূর্বদিকে তার হারানো আধিপত্য নতুন ক'রে হাসিল করবার ইচ্ছা করতেন, কিন্তু তাঁর দীল থেকে পূর্বপুরুষদের শোচনীয় পরাজয়ের স্মৃতি তখনো মুছে যায়নি। তিনি খোলাখুলি ইবনে সাদেকের সাথে যোগ দিতে সাহস করলেন না, কিন্তু মুসলমানদের এই নিশ্চিত দুশমনকে উৎসাহিত করাও তিনি জরুরী মনে করলেন। ইবনে সাদেককে তিনি বললেন, 'আমি তোমাদের সব দিক দিয়ে সাহায্য করবো, কিন্তু যতদিন মুসলমানরা এক হয়ে থাকবে, ততদিন তাদের উপর হামলা করা আমরা অবিবেচনার কাজ বলে মনে করি। তোমরা ফিরে গিয়ে তোমাদের কাজ চালিয়ে যাও। তোমাদের কাজের দিকে আমার নযর থাকবে।'

ইবনে সাদেক সেখান থেকে ফিরে এলো বহু দামী সোনা, চাঁদি ও জওয়াহেরাত তোহ্ফা নিয়ে। বস্রার এক অজ্ঞাত এলাকায় ঘাঁটি করে সে শুরু করলো ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ। হাজ্জাজের ভয়ে সে কয়েক বছর তার ধারণা প্রকাশ্যে ঘোষণা করবার সাহসও করলো না। সে তার কার্যকলাপ তাঁর নযর থেকে পুশিদা রেখে পুরোপুরি হুঁশিয়ার হয়ে চলতে লাগলো। কয়েক বছরের প্রাণপণ চেষ্টা ও মেহনতের ফলে এক হাজার লোক এসে তার দলে ভিড়লো। তাদের মধ্যে বেশির ভাগকেই সে খরিদ করলো সোনা চাঁদির বিনিময়ে। সীজারকে সে তার কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত রেখে

প্রয়োজনমতো তার কাছ থেকে সাহায্য পেতে লাগলো। যখন সে বুঝলো যে, তার জামা'আত বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং কুফা ও বসরার বেশীর ভাগ লোক হাজ্জাজ বিন্ ইউসুফের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছে, তখন সে তৈরী হলো তার প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর শেষ আঘাত হানবার জন্যে। একদিন তার গুপ্তচর এসে তাকে খবর দিলো যে, সেদিন হাজ্জাজ কুফায় চলে গেছেন এবং ইবনে আমের ফউজ সংগ্রহের জন্য এক বক্তৃতা করবেন। সে আরো জানালো যে, বসরার বেশির ভাগ লোক ফউজে ভর্তি হতে নারায। ইবনে সাদেক চাইলো পরিস্থিতির সুযোগ নিতে এবং প্রথমবার সে তার আড্ডা থেকে বেরিয়ে এসে বসরার লোকদের 'আম জলসায় শরীক হবার সাহস করলো। তার মনে আস্থা ছিলো যে, বসরার অসন্তোষ-প্রবণ লোকদের সে তার কথার যাদুতে প্রভাবিত করতে পারবে, কিন্তু তার ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। নয়ীম আচানক বেরিয়ে এসে তার সাজানো কৌশলজাল ছিন্নভিন্ন করে ফেললেন।

ইব্নে সাদেক বসরা থেকে পালিয়ে বাঁচলো এবং রমলায় খলিফার ভাই সুলায়মানের কাছে আশ্রয় নিলো। এক হাজারের জামা'আত থেকে মাত্র কয়েকটি লোক গেলো তার সাথে।

সুলায়মানকে ওয়ালীআহাদের পদ থেকে বঞ্চিত করবার ব্যাপারে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছিলেন খলীফার সমর্থক। তাই হাজ্জাজ ও তাঁর সাথীদের সুলায়মান মনে করতেন নিকৃষ্টতম দুশমন! হাজ্জাজের দুশমনদের তিনি গ্রহণ করতেন দোস্ত বলে। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ইবনে সাদেকের চক্রান্তের খবর পেয়েই তার পিছনে লাগিয়ে রেখেছিলেন একদল সিপাহী। রমলায় সুলায়মান তাকে আশ্রয় দিয়েছেন জেনেই তিনি সব অবস্থা জানালেন খলিফাকে। দরবারে খিলাফত থেকে সুলায়মানের কাছে হুকুম এলো, তক্ষুণি সাথীদের সহ ইবনে সাদেককে শিকল পরিয়ে পাঠাতে হবে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছে। সুলায়মান ইবনে সাদেককে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং তার জান বাঁচাতে চান, তাই তিনি ইব্নে সাদেককে ইসফাহানের দিকে সরিয়ে দিয়ে খলিফার দরবারে লিখে পাঠালেন যে, ইবনে সাদেক রমলা থেকে পালিয়ে গেছে। কয়েকদিন ইসফাহানে ঘুরে ফিরে ইবনে সাদেক ধরলো শীরাযের পথ। শীরায থেকে পঞ্চাশ ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে পাহাড়ের মাঝখানে পুরানো যামানার এক বিরাম কেল্লা। ইব্নে সাদেক সেই কেল্লায় গিয়ে ফেললো স্বস্তির নিশ্বাস। তার সকল বিপদের দায়িত্ব নয়ীমের উপর চাপিয়ে সে তাঁকে এক অপমানকর শাস্তি দেবার কৌশল চিন্তা করতে লাগলো।

নয়ীম ইবনে সাদেকের সামনে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। এক সিপাহী তাঁকে আচানক ধাক্কা মেরে উপুড় করে ফেলে দিয়ে বললো, 'বেকুফ! এটা বসরার মসজিদ নয়। এ মুহূর্তে তুমি দাঁড়িয়ে আছ আমাদের আমীরের দরবারে। এখানে অপরাধীর মাথা কেটে ফেলা হয়।'

ইব্‌নে সাদেক ক্রোধ প্রকাশ করে বললো, 'ভারী বেকুফ তুমি। বাহাদুর লোকদের সাথে এমন ব্যবহার করে না কখনো।'

এই কথা বলে ইব্‌নে সাদেক আসন ছেড়ে উঠে বাযুর সাহায্যে তাঁকে দাঁড় করিয়ে দিলো। মেঝের উপর পড়ে নয়ীমের নাক বেয়ে রক্ত ঝরছে তখন। ইবনে সাদেক নিজের রুমাল বের করে তাঁর মুখ মুছিয়ে দিলো।

তারপর তার দিকে বিদ্রূপভরা হাসিমুখে তাকিয়ে বললো, 'আমি শুনেছি, আপনি নাকি নেহায়েত বেকারার হয়ে আপনার মেযবানের নাম জানতে চেয়েছেন। আফসোস! আপনাকে দীর্ঘ সময় ইনতেযার করতে হয়েছে। আমারও ইচ্ছা ছিলো, খুব জলদী করে আপনার খেদমতে হাযির হয়ে আপনাকে যিয়ারত করি, কিন্তু ফুরসত পাইনি। আজ আপনাকে দেখে আমার দীলে কি আনন্দ হয়েছে, তা আমিই জানি। আমি আশা করি, আপনিও পুরানো দোস্তের সাথে মিলিত হয়ে বহুত খুশী হয়ে থাকবেন। বলুন, তবিয়ত কেমন? আপনার মুখের রঙ কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আমার ধারণা, এই কুঠরীর সংকীর্ণতা ও অন্ধকারে আপনার মতো মুজাহিদের তবিয়ত খুবই পেরেশান হয়ে উঠেছে। কিন্তু আপনি হয়তো জানেন না, এ ছোট-খাটো কেল্লায় কোনো বড়ো কুঠরী নেই। তাই আমার লোকেরা বাধ্য হয়ে ওখানেই রেখেছে আপনাকে। আজ আমি আপনাকে কিছুক্ষণের জন্য এই কারণেই বাইরে আনিয়েছি, যাতে আলো-অন্ধকারের পার্থক্য করবার ক্ষমতা আপনি হারিয়ে না ফেলেন। কিন্তু আপনি আমার দিকে এমন করে তাকাচ্ছেন, যেনো আমি আপনার অজানা লোক। আপনি আমায় চিনতে পারছেন না? আপনার সাথে আমার পরিচয় হয়েছিলো বসরায়। যদিও আমাদের পয়লা মোলাকাত নেহায়েত অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির মধ্যে হয়েছে, তবু সেদিন থেকে আমাদের সম্পর্ক এমন নয় যে, আমরা এত শিগগিরই তা ভুলে যেতে পারি। বড় মুশকিলের ভিতর দিয়ে আমি আপনার সে বক্তৃতার তারিফ জানাবার এ মওকা পেয়েছি এবং আপনার মতো আত্মমর্যাদাবান মুজাহিদকে আব্দুল্লাহ বিন উবাইর উত্তরাধিকারীর সামনে এমনি করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমার মনে জাগছে বহুত রহম। বলুন, আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করা যাবে?'

ইব্‌নে সাদেকের প্রতিটি কথা নয়ীমের দীলের উপর বিঁধছে তীর ও ছুরির ফলার মতো। তিনি ঠোঁট কামড়ে বললেন, কয়েদ হবার জন্য আমার কোন দুঃখ নেই, কিন্তু তোমার মতো বুযদীল ও কমিনার হাতে কয়েদ হয়েছি বলেই আমার যা দুঃখ। এখন তোমার মন যা চায়, তাই করো। কিন্তু মনে রেখো, আমার জিন্দেগী আর মওত দুই-ই তোমার জন্য বিপজ্জনক। এই মুহূর্তে আমার হাত শিকল বাঁধা, কিন্তু মনে রেখো, বন্দীদশা মুজাহিদকে বুযদীল বানাতে পারেনা কখখনো।'

ইব্‌নে সাদেক নয়ীমের শক্ত কথাগুলো শুনে বেপরোয়া মনোভাব প্রকাশ করে বললো, 'তুমি যেমন বাহাদুর, তেমনি বেকুফও। তুমি জানো না যে, এই মুহূর্তে তোমার মাথা রয়েছে এক আজদাহার মুখের মধ্যে। তোমায় গ্রাস করা অথবা ছেড়ে দেওয়া নির্ভর করছে তারই মরযীর উপর। আমার কয়েদখানা থেকে আযাদ হবার ধারণা দূর

করে দাও দীল থেকে। এ কেল্লায় দু'শ সিপাহী প্রতিমুহূর্তে নাংগা তলোয়ার নিয়ে মওজুদ রয়েছে তোমার খোঁজখবর রাখবার জন্য।'

এই কথা বলে ইব্‌নে সাদেক হাততালি দিলো। অমনি কেল্লার বিভিন্ন কোণ থেকে বেরিয়ে এলো কতক সিপাহী নাংগা তলোয়ার হাতে। নয়ীমের চোখে তাদের প্রত্যেকেরই মুখ ইব্‌নে সাদেকের মতো নির্মম-নিষ্ঠুর।

নয়ীম বললেন, 'তুমি জানো, আমি বুযদীল নই। তোমার কাছে আমি কখনও রহমের আবেদন করবো না। তুমি যদি আমার জান নিতে চাও, তার জন্য আমি তৈরী।'

ইব্‌নে সাদেক বললো, তুমি মনে কর, দুনিয়ার সবচাইতে বড়ো শাস্তি মওত; কিন্তু আমি তোমার কাছে প্রমাণ করে দিতে চাই যে, দুনিয়ায় আরো বহুত শাস্তি রয়েছে, যা মওতের চাইতেও ভয়ানক। এমন শাস্তি আমি তোমায় দিতে পারি, যা, বরদাশত করবার মতো হিম্মৎ তোমার হবে না। তোমার যিন্দেগী আমি এমন তিক্ত করে তুলতে পারি যে, তোমার জীবনের প্রতি মুহূর্ত মওতের চাইতেও অন্ধকার হয়ে দেখা দেবে। কিন্তু আমি তোমার দুশমন নই। তুমি যিন্দা থাক, এই আমি চাই। আমি তোমায় এমন এক যিন্দেগীর পথ বলে দিতে পারি, যা তোমার পরলোকের কল্পনার চাইতেও সুন্দর। যুদ্ধের বিপদ-মুসীবৎকে তুমি বরদাশত করে যাও, কেননা যিন্দেগীর আয়েশ-আরাম তোমার জানা নেই। জীবন উপভোগের স্বাদ পাওনি বলেই এমন আপন-ভোলা তুমি। দুনিয়ায় কয়েক বছরের যিন্দেগী খোদা তোমায় দিয়েছেন দুনিয়ার অসংখ্য নিয়ামত ভোগ করবার জন্য। তার কদর ও কীমৎ তোমার জানা নেই। তুমি বাহাদুর সত্যি, কিন্তু তোমার বাহাদুরী তোমায় কি শিখিয়েছে? তোমায় এমন সব লক্ষ্যের পথে জান দিতে শিখিয়েছে, যার সাথে তোমার ব্যক্তিত্বের কোনো সম্পর্ক নেই। তোমার ধারণা, তুমি খোদার রাহে কোরবান হয়ে যাচ্ছো, কিন্তু তোমার এ কোরবানীতে খোদার কোন প্রয়োজন নেই। তোমার কোরবানী থেকে যদি কারুর কোনো ফায়দা হাসিল হয় তা হয়ে থাকে খলিফা ও হাজ্জাজের—যারা ঘরে বসে বসে বিজয়ের খ্যাতি হাসিল করে থাকেন। তোমরা আত্মপ্রতারণা করে চলেছো। তোমার যৌবনদীপ্তি, চেহারা ও রূপ দেখে মনে হয় খাক ও খুনের মধ্যে লুটিয়ে পড়বার জন্য তৈরী হয়নি ও দেহ। তোমায় দেখলে মনে হয় এক শাহজাদা। তুমি রক্তপিপাসু নেকড়ের জীবন যাপন করবে, এটাতো হতে পারে না। শাহজাদার মতো যিন্দেগীই তোমায় মানায়। তুমি হবে এক সুন্দরী শাহজাদীর চোখের আলো, দীলের শান্তি। তোমার যিন্দেগীকে তুমি করে তুলতে পার এক রঙীন স্বপ্নের মতো সুন্দর মোহময়। তুমি ইচ্ছা করলে কঠিন মাটি, রুক্ষ পাথর আর পাহাড়ের শয্যার পরিবর্তে পেতে পার ফুল শেজ। দুনিয়ার অসংখ্য আয়েশ-আরাম দৌলতের বিনিময়ে খরিদ করা যায়। ইচ্ছা করলে দুনিয়ার ধনভান্ডার তুমি আপনার করে নিতে পার, দুনিয়ার সবচাইতে সুন্দরী নারীকে করে নিতে পার তোমার শয্যাসংগীনী। কিন্তু সে পথ তোমার কাছে অজানা। সুন্দরী নারীর কেশের খোশবুতে মাতাল হয়ে বেঁচে থাকতে তুমি শেখোনি। দুনিয়ার আড়ম্বর দেখনি বলেই আত্মভোলা হয়ে খুশী হচ্ছো তুমি।

নওজোয়ান! তোমার জন্য বহুত কিছু করতে পারি আমি। আহা! তুমি যদি আমার সহকর্মী হতে! আমরা বনু উম্মিয়ার হুকুমাত খতম করে দিয়ে কায়েম করবো এক নয়া বিধান। আমার ইকিন রয়েছে যে, খলিফা ও হাজ্জাজের ক্ষমতা গর্বিত মস্তক ভূতলশায়ী করবার চেষ্টায় আমি কামিয়াব হবো। তোমার হয়তো মনে পড়ে, আমি সেই ইব্‌নে সাদেক, বসরার আম জলসায় তুমি যার মোকাবিলা করেছিলে; কিন্তু আমি তোমায় নিশ্চিত বলে দিচ্ছি, যতো কমযোর তুমি আমায় ভেবেছো, আমি তা নই। এইটুকু জেনে রাখাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট হবে যে, আমার পিছনে রোমের সীজারের মতো লোকও মওজুদ রয়েছেন। আরব ও আজমে এক যবরদস্ত ইনকিলাব পয়দা করবার জন্য আমি শুধু সময়ের প্রতীক্ষা করছি। বহুদিন ধরে তোমার মতো কথার যাদুকরের সন্ধান করে ফিরেছি আমি। তোমায় আমি দেখাতে চাই সেই কর্মের ময়দান। সেখানে তুমি খোদার দেওয়া শৌর্য-বীর্য পূর্ণ প্রয়োগ করতে পারবে। তোমার মতো নওজোয়ান মামুলী সিপাহী হিসাবে খুশী হয়ে না থেকে হবে খিলাফতের দাবীদার।'

নয়ীমকে নির্বাক হয়ে থাকতে দেখে ইব্‌নে সাদেক ভাবলো যে, তিনি তার প্রতারণাজালের মধ্যে এসে গেছেন। তাই গলার আওয়াযটা খানিকটা নরম করে সে বললো, 'আমার সাথে যদি তুমি বিশ্বস্ত থাকবার প্রতিশ্রুতি দাও, তাহলে আমি তোমার শিকল এখনই খুলিয়ে দিচ্ছি। বলো, তোমার ইরাদা কি? তোমার সামনে যিন্দেগীর পথ দুটো। বলো, তুমি যিন্দেগীর নিয়ামত পূর্ণরূপে উপভোগ করতে চাও, না এই অন্ধকার কুঠরীতে তোমার যিন্দেগীর বাকী দিনগুলো কাটিয়ে দিতে চাও এমনি করে?'

নয়ীম গর্দান উপরে তুললেন। তাঁর মুখে তখন অন্তরের অপরিসীম যাতনার অসাধারণ বহিঃপ্রকাশ দেখা যাচ্ছে। তিনি জোশের সাথে জওয়াব দিলেন, তোমার কথা আমার কাছে যখমী কুত্তার চীৎকারের চাইতে বেশি কোনো অর্থ রাখে না। তুমি জানো না, আমি যার গোলাম, তিনি যমিনের অণু থেকে শুরু করে আসমানের সিতারা পর্যন্তের মালিক হয়েও তিনদিন পেটে পাথর বেঁধে রয়েছেন। তুমি আমায় দৌলতের মোহে প্রলুব্ধ করতে চাও? দুনিয়ার তামাম আরামেরই নাম যিন্দেগী। কিন্তু তলোয়ারের ছায়ায় আযাদীর শ্বাস গ্রহণ করে যে আয়েশ-আরাম পাওয়া যায়, তা তোমার মতো নীচ মানুষের কল্পনারও বহু উর্দ্ধে। আমায় তুমি খোদার রাস্তা থেকে সরিয়ে নিজস্ব জঘন্য উদ্দেশ্য হাসিল করবার সহকর্মী বানাতে চাও। তুমি জিহাদের বিরোধিতা কর, কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যের জন্য রক্তের নদী বইয়ে দিতে তোমার দ্বিধা নেই। যে সীজারের শক্তির উপর ভরসা তোমার, তার পূর্বপুরুষ কতোবার আমাদের তলোয়ারের শক্তি পরীক্ষা করে দেখেছেন! এই মুহূর্তে আমি নিঃসন্দেহে তোমার হাতে রয়েছি, কিন্তু কয়েদ অথবা মৃত্যুর ভয় আমায় অচেতন বিবেকহীন করতে পারবে না কখনো। মুজাহিদের যোগ্য নয়, এমন কোনো কাজের প্রত্যাশা তুমি করো না আমার কাছে।'

ইব্‌নে সাদেক কিছুটা দমে গিয়ে বললো, 'কয়েকদিনের মধ্যেই তুমি এমন সব কাজ করতে রাযী হবে, যা দেখে শয়তানও শরম পাবে।'

এই কথা বলে সে তার চারপাশে বসা লোকদের দিকে তাকালো এবং ইসহাক নাম ধরে এক ব্যক্তিকে ডাকলো। যে সুগঠিত দেহ জোয়ান তাকে প্রতারণা করে গ্রেফতার করেছে, আওয়ায শুনে সেই লোকটিই এগিয়ে এলো সামনে। নয়ীম প্রথমবার জানলেন যে, লোকটির নাম ইসহাক!

ইব্‌নে সাদেক বললেন, 'ইসহাক! এর মাথাটা ঠিক করে দাও।'

ইব্‌নে সাদেকের হুকুমে নয়ীমকে আঙিনায় এক খুটির সাথে বাঁধা হলো। লোকটি এগিয়ে গিয়ে নয়ীমের গায়ের জামা ছিঁড়ে ফেললো। তারপর সে এক রক্তপিপাসু নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে কোড়া বর্ষণ করতে লাগলো নয়ীমের উলংগদেহের উপর। নয়ীম কোনো আওয়ায না করে মযবুত পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে কোড়া খেতে লাগলেন। সামনের কামরা থেকে চুপি চুপি কদম ফেলে এক বালিকা ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালো ইব্‌নে সাদেকের কাছে। সে কখনো বেকারার হয়ে তাকাচ্ছে নয়ীমের দিকে, আবার কখনো অনুনয়-ভরা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে ইব্‌নে সাদেকের দিকে। তার নাযুকদীল আর বরদাশত করতে পারছে না এ নিষ্ঠুর খেলা। অশ্রুভরা চোখে সে ইব্‌নে সাদেকের দিকে তাকিয়ে বললো, 'চাচা লোকটি বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছে।'

'হতে দাও। ও যে সায়ফুল্লাহ। আমি ওর তেযী খতম করে তবে ছাড়বো।'

'চাচা!'

ইব্‌নে সাদেক বিরক্ত হয়ে বললো, 'চুপ করো জোলায়খা। এখানে কি চাও? যাও।'

জোলায়খা মাথা নীচু করে ফিরে গেলো। দু'একবার সে ফিরে তাকালো নয়ীমের দিকে। নিজের অক্ষমতা ও অসহায়তা মুখভংগীতে প্রকাশ করে সে অদৃশ্য হয়ে গেলো এক কামরার মধ্যে। আঘাতের তীব্রতায় বেহুঁশ হয়ে নয়ীমের গর্দান যখন ঢিলা হয়ে পড়লো, তখন তাকে আবার ফেলে রাখা হলো কয়েদখানায়।

নয়ীমকে কয়েকবার বাইরে নিয়ে কোড়া মারা হলো। তাতেও যখন তাঁর মনোভাবের পরিবর্তন দেখা গেলো না, তখন ইব্‌নে সাদেক হুকুম দিলো যে, কয়েকদিন তাকে ভুখা রাখতে হবে। নানা রকম শারীরিক কষ্ট সহ্য করার পর নয়ীমের ভিতরে পয়দা হলো এক অসাধারণ সহনশক্তি। তিনি ক্ষুধা ও পিপাসায় যখন রাতের বেলায় ঘুমোবার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন, তখন কে যেন কুঠরীর ছিদ্রপথ দিয়ে আওয়ায দিয়ে ভিতরে ফেলে দিলো কয়েকটি সেব ও আঙ্গুরফল।

নয়ীম হয়রান হয়ে উঠে ছিদ্রপথ দিয়ে বাইরে উঁকি মেরে দেখলেন। রাতের অন্ধকারে দেখা গেল কে যেন কয়েক কদম দূর গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তার লেবাস ও চলার ধরণ দেখে তিনি আন্দায করলেন, কোনো নারী রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে চলে যাচ্ছে। দরদী মেয়েটিকে চিনে নিতে তার মুশকিল ছিলো না মোটেই। কোড়ার ঘা খেতে গিয়ে কতোবার তিনি দেখেছেন এক যুবতীকে তার জন্য বেকারার হতে। তার নিষ্পাপ সুন্দর মুখের উপর যুলুম ও অসহায়তার চিহ্ন অংকিত হয়ে গেছে নয়ীমের দীলের ফলকে। কিন্তু কি তার পরিচয়? এ ভয়ানক জায়গায় কি করে সে এলো? নয়ীম এ সব প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করতে করতে একটি সেব তুলে নিয়ে খেতে লাগলেন।

নয়ীমের জন্য অতটা বেদনা-বোধ যে মেয়েটির, তার নাম জোলায়খা। জীবনের ষোলোটি বছর অন্তহীন মুসীবতের ভিতর দিয়ে কাটিয়েও সে ছিলো দৈহিক সৌন্দর্যের এক পরিপূর্ণ প্রতীক। প্রতিটি মানুষের প্রতি অন্তহীন বিদ্বেষ পোষণ করতো জোলায়খা। ইব্‌নে সাদেকের সাহচর্যে সে কাটিয়েছে তার যিন্দেগীর তিক্ত মুহূর্তগুলো এবং হামেশা মানবতার নিকৃষ্ট রূপই রয়েছে তার চোখের সামনে। তাই প্রত্যেকটি মানুষই তার দৃষ্টিতে ছিলো ইবনে সাদেকের মত ধূর্ত, স্বার্থপর, নিষ্ঠুর কমিনা। শিকল-বাঁধা নয়ীমকে কেল্লায় আনতে দেখে প্রথমে তার মনে হয়েছে, একটি স্বার্থপর মানুষ একদল স্বার্থপর মানুষের কবযায় এসে গেছে, কিন্তু নয়ীমকে ইবনে সাদেকের সাথী হতে অস্বীকার করতে দেখে তার পুরোনো খেয়াল বদলে গেছে। তার মনে হচ্ছে, যে দুনিয়ায় সে কাটিয়ে দিয়েছে তার যিন্দেগীর বৈচিত্রহীন দিন আর ভয়ানক রাতগুলো, সে দুনিয়ার বাসিন্দা নয় এ নওজোয়ান। তাঁর ঈমান আর তেয দেখে সে হয়রান হয়ে গেছে। গোড়ার দিকে সে তাঁকে মনে করতো মযলুম—কৃপার পাত্র, কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি তাঁর কাছে হয়ে উঠেছেন অন্তহীন শ্রদ্ধার দাবীদার।

বাপ-মায়ের মর্মান্তিক পরিণতির খবর জোলায়খা জানতো না। তাদের সাথে মিলিত হবার কামনা জানিয়ে সে হয়ে গেছে হতাশ। তার কাছে দুনিয়া এক অবাস্তব স্বপ্ন আর পরকাল একটি নিছক কল্পনা।

ইব্‌নে সাদেকের নির্মমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের তুফান বারংবার তার আহত দীলকে তোলপাড় করে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে। দরিয়ার বুকে ভাসমান মনযিল হারা মাল্লার মতো ঢেউয়ের আঘাতে মুহ্যমান সে হয়েছে সাঁতরে পার হবার বা ডুবে যাবার সম্ভাবনা সম্পর্কে বেপরোয়া এবং চোখ বন্ধ করে মুসীবতের তুফানের উপর দিয়ে সে ভাসিয়ে দিয়েছে তার জীবন-তরী কোনো বিপদের পরোয়া না করে। ককনো কখনো চোখ খুলে হাল সামলাবার খেয়াল তার আসে, কিন্তু আবার হতাশা তাকে করে অভিভূত। এই ঘরছাড়া মাল্লাকে উপকূল বা মনযিলের নির্দেশ দেবার মতো দিশারীর ছিলো প্রয়োজন, আর প্রকৃতি সে ভার চাপিয়ে দিয়েছিলো নয়ীমের উপর। নয়ীমের সাথে মামুলী সম্পর্ক জোলায়খার দীলের ঘুমন্ত তুফানকে করে তুললো উত্তাল এবং ইব্‌নে সাদেকের পাঞ্জা থেকে রেহাই পেয়ে নয়ীমের দুনিয়ায় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবার আকাংখা তার দীলকে করে তুললো চঞ্চল।

জোলায়খা প্রতি রাত্রে কোনো না কোনো সময়ে আসে এবং খানাপিনার ব্যবস্থা ছাড়াও নয়ীমের অন্ধকার কুঠরীতে রেখে যায় খানিকটা আশার কিরণ।

চারদিন পর আবার নয়ীমকে হাযির করা হলো ইবনে সাদেকের সামনে। ইবনে সাদেক তার শারীরিক অবস্থায় বিশেষ কোনো পরিবর্তন না দেখে হয়রান হয়ে বললো, 'তোমার জান বড্ড শক্ত। হয়তো খোদার মনযুর, তুমি যিন্দাহ থাকবে। কিন্তু তুমি নিজ হাতে নিজের মওত খরিদ করছো। আমি এখনো তোমায় চিন্তা করবার মওকা দিচ্ছি। আমার একিন রয়েছে যে, তোমার ভাগ্যের সিতারা খুবই বুলন্দ। কোনো বড় কর্তব্য সাধনের জন্যই পয়দা হয়েছো তুমি। আমি তোমায় সেই উচ্চস্তরে পৌছাবার ওয়াদা করছি, যেখানে তোমার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে না তামাম ইসলামী দুনিয়ায়। আমি

তোমার দিকে প্রসারিত করছি দোস্তির হাত আর এই-ই হচ্ছে শেষ মওকা। এখনো তুমি আমার আন্তরিকতাকে উপেক্ষা করলে পস্তাবে শেষ পর্যন্ত।'

নয়ীম বললো, 'ইতর কুত্তা কোথাকার! আমায় বারংবার কেন বিরক্ত করছো?'

'এ ইতর কুত্তার কামড় কখনো সুখের হবে না। তোমায় কামড়ে দেবার জন্য এ ইতর কুত্তার মুখ খুলবার সময় হয়েছে এখন। অপরিণামদর্শী যুবক! একবার চোখ খুলে দেখে নাও, দুনিয়া কতো সুন্দর। চেয়ে দেখো, পাহাড়ের দৃশ্য কতো মুগ্ধকর। যে সব জিনিস দেখবার ইচ্ছা জাগে, আজই ভাল করে দেখে নাও। দীলের উপর সব কিছুর ছবি ভাল করে এঁকে নাও। কাল সূর্যোদয়ের আগেই উপড়ে ফেলা হবে তোমার চোখ। আর ও কান দুটো দিয়েও আর কিছু শুনতে পাবে না কখনো। যা কিছু দেখতে চাও, আজই দেখে নাও; যা কিছু শুনতে চাও, শুনে নাও।' বলে সে সিপাহীদের হুকুম দিলো এবং তারা নয়ীমকে খুঁটির সাথে বেঁধে দিলো।

'হ্যাঁ, এবার বলো, চোখের দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হবার আগে কোন জিনিস তুমি দেখতে চাও।'

নয়ীম নীরব রইলেন।

ইবনে সাদেক বললো, 'তুমি জান, আমার ফয়সালা অটল। আজ সারাদিন তোমার এখানেই কাটিয়ে দেবার ব্যবস্থা হবে। এই সময়টার ফায়দা নিয়ে নাও। যা কিছু আসবে তোমার সামনে, ভালো করে দেখে নাও, আর যে সুর ঝংকার বাজবে তোমার সামনে, প্রাণ ভরে শুনে নাও।'

ইবনে সাদেক হাততালি দিলো। অমনি কয়েকটি লোক সেখানে এসে হাজির হোল বাদ্য বাজনার নানা রকম সরঞ্জাম নিয়ে। ইবনে সাদেকের ইশারায় তারা বসে গেলো একদিকে।

আস্তে আস্তে সুর-ঝংকার বুলন্দ হতে লাগলো। এর পর বহু বিচিত্র বর্ণের লেবাসে সজ্জিত কয়েকটি নারী এককোণ থেকে বেরিয়ে এসে নাচতে শুরু করলো নয়ীমের সামনে। নয়ীমের নযর তখন নীচে তার পায়ের দিকে। তাঁর কল্পনা তখন তাঁকে নিয়ে গেছে বহুক্রোশ দূরে এক বস্তির পথে।

মজলিস বসবার পর কয়েক মুহূর্ত চলে গেছে। হঠাৎ কয়েকটি দ্রুতগামী ঘোড়ার পায়ের আওয়াযে মজলিসে হাজির লোকেরা চমকে উঠলো। ইবনে সাদেক উঠে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলো; ইসহাক পৌছে গেছে বলে খবর দিলো এক হাবশী গোলাম।

ইবনে সাদেক নয়ীমকে লক্ষ্য করে বললো, নওজোয়ান, হয়তো তুমি এখন খুব আনন্দের একটি খবর শুনবে।'

খানিকক্ষণ পর ইসহাক এক তশতরী হাতে নিয়ে ভিতরে ঢুকে সসম্ভ্রমে ইবনে সাদেকের সামনে রাখলো। ইবনে সাদেক উপরের রুমালখানা তুললে নয়ীম দেখলেন, তাতে একটি মানুষের মস্তক।

'হয়তো এটি দেখে তুমি খুশী হবে। বলে ইবনে সাদেক এক হাবশীকে ইশারা করলো। হাবশী তশতরী তুলে নয়ীমের কাছে নিয়ে রাখলো যমিনের উপর। তশতরীতে

রাখা মস্তকটি চিনতে পেরে নয়ীমের দীলে লাগলো এক প্রচণ্ড আঘাত। ইবনে আমেরের মস্তক! শুকিয়ে যাওয়া মুখের উপর তখনো খেলছে এক অপূর্ব হাসির রেখা। নয়ীম অশ্রুসজল চোখ দু'টি বন্ধ করলেন। জোলায়খা ইব্‌নে সাদেকের পিছনে দাঁড়িয়ে দেখছে মর্মবিদারক দৃশ্য! ধৈর্য ও মহিমার প্রতিমূর্তি নয়ীমের চোখে অশ্রুধারা দেখে তার কলজে ফেটে যাচ্ছে।

ইব্‌নে সাদেক আসন ছেড়ে উঠলো। ইসহাকের কাছে গিয়ে তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে সে বললো, 'ইসহাক! এখন আর একটিমাত্র শর্ত বাকী। আমি চাই মুহম্মদ বিন কাসিমের মস্তক এই নওজোয়ানের সাথে দাফন করতে। যদি সে অভিযানে কামিয়াব হয়ে ফিরে আসতে পার তুমি, তাহলে জোলায়খা হবে তোমারই। তাকে তোমার মতো বাহাদুর নওজোয়ানের জীবনসঙ্গিনী করে দিতে আর কোনো বাধা থাকবে না।'

বলতে বলতে ইব্‌নে সাদেক ফিরে জোলায়খার দিকে তাকালো। জোলায়খা অশ্রুভরা চোখে চলে গেলো নিজের কামরার দিকে। ইব্‌নে সাদেক নয়ীমের কাছে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো, 'আমি জানি, ইবনে কাসিমের প্রতি তোমার অশেষ মুহব্বত। যদি কোনো কারণে তার মস্তক এখানে পৌঁছা পর্যন্ত তুমি যিন্দাহ না থাকতে পার, তা হলে আমি ওয়াদা করছি, তার মস্তক তোমারই সাথে দাফন করা হবে।'

ইব্‌নে সাদেকের হুকুমে সিপাহীরা নয়ীমকে রেখে গেলো কয়েদখানায়।

❦

রাতের বেলা নয়ীম বহুক্ষণ কয়েদখানার চার দেওয়ালের মধ্যে ঘুরতে লাগলেন অস্থির চঞ্চল হয়ে। তার দীল দীর্ঘকালের আত্মিক ও দৈহিক ক্লেশ সহ্য করে নির্বিকার হয়ে উঠেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও চোখ ও কান থেকে বঞ্চিত হবার শাস্তির কল্পনা করাটা খুব মামুলী ব্যাপার নয়। প্রতি মুহূর্তে তার মনের চাঞ্চল্য বেড়ে চলেছে। কখনো তার মনে কামনা জাগে, এ রাত্রি কিয়ামতের রাত্রির মতো দীর্ঘ হোক, আবার কখনো তার মুখ থেকে দোআ বেরিয়ে আসে, এখনই ভোর হয়ে প্রতীক্ষার দীর্ঘ রাত্রির অবসান হোক। টহল দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে তিনি ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়লেন। খানিকক্ষণ পাশ ফিরবার পর মুজাহিদদের চোখে নামলো ঘুমের মায়া। তিনি স্বপ্নে দেখলেন, ভোর হয়ে এসেছে এবং তাঁকে কুঠরী থেকে বের করে বেঁধে দেওয়া হয়েছে এক গাছের সাথে। ইবনে সাদেক হাতে খঞ্জর নিয়ে এগিয়ে আসছে। সে তাঁর চোখ দুটি উপড়ে ফেলছে। চারদিক ছেয়ে নেমে আসছে ঘন অন্ধকার। তারপর তার কানের ভিতর ঢেলে দেওয়া হচ্ছে একটি তরল পদার্থ। শাঁই শাঁই করছে তার কানের ভিতর। তিনি কিছুই শুনতে পারছেন না। ইবনে সাদেকের সিপাহী তাঁকে সেখান থেকে এনে ফেলে যাচ্ছে কুঠরীর ভিতরে। সেখান থেকে বেরিয়ে যাবার পথ তার নজরে আসছে না। সিপাহী আর একবার এসে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে কুঠরীর বাইরে; তারপর তাঁকে ফেলে আসছে খানিকটা দূরে। তারপর তিনি অনুভব করছেন, যেনো সহসা খুলে গেলো তাঁর কানের পর্দা। পাখিদের কলকাকলি আর হাওয়ার শাঁ শাঁ আওয়াজ আসছে তার কানে। 'উযরা 'নয়ীম নয়ীম' বলে ডাকছে তাঁকে। যেদিক থেকে উযরার আওয়াজ আসছে, তিনি উঠে কদম ফেললেন সেদিকে কিন্তু কয়েক পা চলবার পর পা কাঁপতে কাঁপতে তিনি পড়ে যাচ্ছেন যমিনের উপর। আবার ফিরে আসছে তার চোখের দৃষ্টি। তিনি দেখছেন, 'উযরা তার সামনে দাঁড়িয়ে। আবার উঠে তিনি 'উযরা উযরা' বলে দু'হাত প্রসারিত করে এগিয়ে যাচ্ছেন তার দিকে, কিন্তু কাছে গিয়ে ভালো করে তাকিয়ে দেখে তিনি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। তার স্বপ্নের শেষাংশ বাস্তব সত্য হয়ে উঠেছে, কিন্তু উযরার পরিবর্তে কুঠরীর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে তারই মতো রূপ ও সৌন্দর্যের আর এক মূর্ত প্রতীক। দেয়ালের ছিদ্রপথ দিয়ে তার মুখে এসে পড়ছে চাদের রোশনী। খানিকক্ষণ ভালো করে তাকিয়ে দেখে তিনি চিনলেন সে ছায়া মূর্তিটি জোলায়খা, কিন্তু বহুক্ষণ পেরেশান অবস্থায় দাঁড়িয়ে থেকে তিনি অনুভব করতে লাগলেন যেনো তিনি স্বপ্ন দেখছেন। ধীরে ধীরে তার ধারণা ভুল প্রমাণিত হতে লাগলো। কয়েকবার চোখ মেলে নিজের শরীরে হাতের স্পর্শ অনুভব করতে তার মনে হলো, এ স্বপ্ন নয়—বাস্তব সত্য।

নয়ীম প্রশ্ন করলেন, 'কে তুমি? তাহলে আমি কি স্বপ্ন দেখছি না?'

জোলায়খা চাপা আওয়াজে জওয়াব দিলো, 'না, এ স্বপ্ন নয়। কিন্তু আপনি পড়ে গেলেন কেন?'

'কখন?'

'এইতো এখনই, আমি আপনাকে যখন আওয়াজ দিচ্ছিলাম। আপনি ঘাবড়ে উঠলেন, তারপরই আবার পড়ে গেলেন।'

'উহু, আমি এক স্বপ্ন দেখছিলাম। আমি অনুভব করছিলাম, যেনো আমি অন্ধ হয়ে গেছি। উযরা আমায় ডাকছে আর আমি এগিয়ে যাচ্ছি তার দিকে। অমনি একটা কিছুতে ধাক্কা খেয়ে আমি পড়ে গেছি। কিন্তু আপনি এখানে?'

জোলায়খা বললো, 'আস্তে কথা বলুন। যদিও ওরা সবাই ঘুমিয়ে আছে এখন, তবু কারুর কানে আপনার আওয়াজ গিয়ে পৌঁছলে সব কৌশল ব্যর্থ হয়ে যাবে। নিজের সব যেওর দিয়ে আমি বহু কষ্টে পাহারাদারদের বাধ্য করে এ কুঠরীর দরজা খুলিয়েছি। আমাদের জন্য তারা দুটো ঘোড়া তৈরি করে রেখেছে। তারা কেল্লার দরজা খুলে দেবার ওয়াদা করেছে। আপনি উঠে হুঁশিয়ার হয়ে আমার সাথে চলুন।'

দু'টো ঘোড়া। কি জন্যে?'

'আমি আপনার সাথে যাবো।'

'আমার সাথে?' নয়ীম হয়রান হয়ে প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ আপনার সাথে। আমার উম্মীদ, আপনি আমার হেফাযত করবেন। আমার বাপ-মার ঘর দামেস্কে। আপনি সেখানে পৌঁছে দেবেন আমায়।'

'এ কেল্লায় কি করে এলেন আপনি?'

জোলায়খা বললো, 'কথার সময় নেই এখন। আমিও আপনারই মতো এক বদনসীব।'

নয়ীম খানিকটা ইতস্তত করে বললেন, 'এখন আপনার আমার সাথে যাওয়া ঠিক হবে না। আপনি আশ্বস্ত হোন, কয়েকদিনের মধ্যেই আমি আপনাকে মুক্ত করবো এ লোকটির হাত থেকে।'

'না, না, খোদার দিকে তাকিয়ে আমায় হতাশ করবেন না।' জোলায়খা কেঁদে বললো, 'আপনার সাথেই যাবো আমি। আপনি চলে যাবার পর যদি ওরা জানতে পারে যে, আপনাকে আযাদ করবার ভিতরে আমার কোনো হাত ছিলো, তা হলে ওরা আমায় কতল না করে ছেড়ে দেবে না। আর তা না জানলেও আপনার চলে যাবার পর আপনার দিক থেকে বিপদের আশংকা করে ওরা কেল্লা ছেড়ে কোথাও অদৃশ্য হয়ে যাবে। তখন আমায় ওরা এমন এক পিঞ্জরে কয়েদ করবে, যেখানে পৌছা আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না। আপনি জানেন না, এ লোকটি যবরদস্তি করে আমায় শাদী দিতে চাচ্ছে ইসহাকের সাথে এবং সে ওয়াদা করেছে যে, মুহাম্মদ বিন কাসিমকে কতল করে আসতে পারলে আমায় তার হাতে সঁপে দেবে। খোদার ওয়াস্তে আমায় এ যালেম নেকড়ের হাত থেকে বাঁচান।' কথা কটি বলে সে নয়ীমের জামা ধরে হাঁপাতে লাগলো।

'আপনি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে চলতে পারবেন?' নয়ীম প্রশ্ন করলেন।

জোলায়খা আশান্বিত হয়ে জওয়াব দিলো, 'আমি এ যালেমের সাথে ঘোড়ায় চড়ে প্রায় আধা দুনিয়া ঘুরেছি। এখন সময় নষ্ট করবেন না। আপনার তামাম হাতিয়ারসহ এক পাহারাদার ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেল্লার বাইরে।'

নয়ীম জোলায়খার হাত ধরে কুঠরীর দরজার দিকে গেলে বাইরের কারুর পায়ের আওয়াজ শোনা গেলো। তিনি থেমে গিয়ে চুপি চুপি বললেন, 'কে যেনো আসছে এদিকে।'

এ কুঠরীর দু'জন পাহারাদারকেই আমি কেল্লার দরজায় পাঠিয়ে দিয়েছি। এ আর কেউ হবে। এখন কি হবে?

নয়ীম তার মুখে হাত রেখে দেয়ালের দিকে ঠেলে দিলেন। তারপর নিজে দরজার বাইরে উঁকি মেরে দেখতে লাগলেন। পায়ের আওয়াজ যতো নিকটতম হতে লাগলো, তার দীলের স্পন্দন ততো প্রবল হতে লাগলো।

এক পাহারাদার দেয়ালের গা ঘেঁষে দরজার কাছে এসে মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালো। সাথে সাথেই নয়ীম তাকে ঘুষি লাগালেন এবং তার গর্দান নয়ীমের লৌহ কঠিন মুঠোর মধ্যে পিষ্ট হতে লাগলো। নয়ীম কয়েকটা ঝাঁকুনি দিয়ে বেহুঁশ অবস্থায় তাকে কুঠরীর ভিতর ঠেলে ফেললেন এবং জোলায়খার হাত ধরে বাইরে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

কেল্লার দরজায় এক সিপাহী তার নযরে পড়লো। জোলায়খাকে দেখেই সে দরজা খুলে দিলো। আর একটি সিপাহী কেল্লার বাইরে নয়ীমের হাতিয়ার আর ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে। নয়ীম হাতিয়ার বেঁধে জোলায়খাকে এক ঘোড়ায় সওয়ার করে দিয়ে নিজে অপর ঘোড়ায় সওয়ার হলেন। কিন্তু কয়েক কদম চলেই তিনি ফিরে পাহরাদারদের বললেন, 'তোমরা কি নিশ্চিত জানো যে আমাদের জন্য তোমাদের জান বিপন্ন হবে না?'

পাহারাদার জওয়াব দিলো, 'আপনি আমাদের চিন্তা করবেন না। ওই যে দেখুন।' সে একটি গাছের দিকে ইশারা করে বললো, 'ভোর হবার আগে আমরাও কয়েক ক্রোশ দূরে চলে যাবো। এ নেকড়ের দলে আর আমাদের মন বসছে না।' নয়ীম দেখলেন, গাছের সাথে আরো দুটি ঘোড়া বাঁধা।

দুর্গম পাহাড়ী পথের সাথে নয়ীমের পরিচয় নেই। সিতারার ঝলকে পথ দেখে তিনি এগিয়ে চলেছেন জোলায়খাকে নিয়ে। ঘন গাছপালার ভিতর দিয়ে কয়েক ক্রোশ চলবার পর তার নযরে পড়লো এক বিস্তীর্ণ ময়দান। কয়েক মাস পর তিনি খোলা হাওয়ায় এসে দেখছেন আসমানের দীপ্তিমান সিতারারাজির দৃশ্য। নির্জন পথে মাঝে মাঝে শোনা যায় শিয়ালের ডাক। চাঁদের মুগ্ধকর আলোর বন্যা, গাছের পাতায় পাতায় দীপ্তিমান জোনাকীর দল, হালকা হালকা ঠাণ্ডা সুরভী হাওয়া—মোটকথা, সেই রাত্রির সবকিছুই যেনো নয়ীমের কাছে অসাধারণ আনন্দদায়ক মনে হতে লাগলো। খানিকক্ষণ পরেই ভোরের রোশনী রাত্রির কালো পর্দা ভেদ করে উঁকি মারতে শুরু করলো। আলো-আঁধারে নয়ীমের চোখে দেখা দিলো একদিকে সারি সারি পাহাড় শ্রেণী, আর একদিকে ময়দানের আবছা দৃশ্য। তিনি জোলায়খার দিকে তাকালেন। তার রূপ ও আকৃতি সেই অস্পষ্ট দৃশ্যরাজিকে যেনো আরো মোহময় করে তুলেছে। নয়ীমের কাছে সে যেনো প্রকৃতির দৃশ্য পরিক্রমারই একটা অংশ। জোলায়খাও তার সাথীর দিকে তাকিয়ে লজ্জায় গর্দান নীচু করলো। সে কি করে ইবনে সাদেকের হাতে পড়েছিলো জানতে চাইলেন নয়ীম। তার জওয়াবে জোলায়খা তার মর্মন্তুদ কাহিনী আদ্যোপান্ত বর্ণনা করলো। বলতে বলতে কয়েকবার সে আপনার অলক্ষ্যে কেঁদে ফেলেছে। নয়ীম বারবার তাকে দিয়েছেন সান্ত্বনা।

আরো বেশি আলো দেখা দেবার পর তারা ঘোড়ার গতি আরো বাড়িয়ে দিলেন। জোলায়খা ঘোড়ায় চড়ে খুব ভালো চলতে পারে দেখে নয়ীম ছুটে চললেন আরো দ্রুত গতিতে। প্রায় দু'ক্রোশ চলবার পর হঠাৎ নয়ীমের মাথায় এক খেয়াল এলো এবং তিনি ঘোড়া থামালেন। জোলায়খা তার দেখাদেখি থেমে পড়লো। নয়ীম জোলায়খাকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, ইসহাক মুহাম্মদ বিন কাসিমকে কতল করবার ইরাদা নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেছে?

'হাঁ, সে সন্ধ্যাবেলায় রওয়ানা হয়ে গেছে।' জোলায়খা জওয়াব দেলো।

'তা হলে বেশি দূর যায়নি সে।' বলে নয়ীম ঘোড়ার গতি বাঁ দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। জোলায়খা কোন প্রশ্ন না করে তার পিছু পিছু ঘোড়া ছুটালো।

সূর্যোদয়ের খানিকক্ষণ পর নয়ীম এসে পৌছলেন এক চৌকিতে। পাহাড়ী লোকদের হামলা প্রতিরোধ করবার জন্য সেখানে ছিলো ত্রিশজন সিপাহী। নয়ীম ঘোড়া থেকে নামলেন। এক বুড়ো সিপাহী নয়ীমকে চিনতে পেরে এগিয়ে এসে তাকে কোল দিলো। বুড়ো সিপাহীটি নয়ীমের পাশের বস্তির বাসিন্দা। খুশীর জোশে সে নয়ীমের পেশানীতে হাত বুলিয়ে বললো, 'আলহামদুলিল্লাহ, আপনি নিরাপদে আছেন। এতদিন কোথায় ছিলেন আপনি? আমরা দুনিয়ার প্রতি কোণে খুঁজে বেড়িয়েছি আপনাকে।

আপনার ভাইও আপনার খোঁজে গিয়েছিলেন সিন্ধুতে। আপনার দোস্ত মুহম্মদ বিন কাসিম আপনার সন্ধানের জন্য পাঁচ হাজার আশরফী পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। আমরা সবাই হতাশ হয়ে গিয়েছি। শেষ পর্যন্ত কোথায় ছিলেন আপনি?'

নয়ীম জওয়াব দিলেন, 'এসব প্রশ্নের জওয়াব দিতে বহু সময়ের প্রয়োজন। এখন আমি খুব তাড়াহুড়ায় রয়েছি। আপনি আমায় বলুন, আজ রাত্রে অথবা ভোর বেলায় একটি বলিষ্ঠ দেহ লোক এই পথ দিয়ে গিয়েছে কি?

সিপাহী জওয়াব দিলো, হাঁ, সূর্যোদয়ের খানিকক্ষণ আগে একটি লোক এখান থেকে গেছে। সে বলছিলো, দামেস্ক থেকে খলিফাতুল মুসলেমীন এক খাস পয়গাম নিয়ে তাকে পাঠিয়েছেন সিন্ধুর পথে মুহাম্মদ বিন কাসিমের কাছে। লোকটি এখান থেকে ঘোড়া বদল করে নিয়েছে।'

'লোকটি গন্দমী রঙের? নয়ীম প্রশ্ন করলেন।

'জি হাঁ, সম্ভবতঃ তার রঙ গন্দমী।' বুড়ো সিপাহী জওয়াব দিলো।

'বহুত আচ্ছা।' নয়ীম বললেন, আপনাদের মধ্যে একজন সোজা উত্তর পূর্বে চলে গিয়ে কয়েক ক্রোশ দূরে পাহাড়ের উপর দেখতে পাবেন গাছ-পালায় ঢাকা এক কেল্লা। যে লোকটি যাবে সে কাছে গিয়ে দেখবে, কেল্লার বাসিন্দারা কেল্লা ছেড়ে চলে গেছে কিনা। আমার বিশ্বাস, তার যাবার আগেই ওরা কেল্লা খালি করে চলে যাবে। কিন্তু আমি জানতে চাই, ওরা কোন দিকে যাচ্ছে। এর জন্য দরকার একটি হুঁশিয়ার লোক।'

'আমি যাচ্ছি'—বলে এক নওজোয়ান এগিয়ে এলো।

'হাঁ, যাও। যদি ওরা আগেই কেল্লা খালি করে গিয়ে থাকে, তাহলে ফিরে এসো, নইলে তাদের গতিবিধির খেয়াল রাখবে।' নয়ীম বললেন।

নওজোয়ান ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ছুটে চললো।

নয়ীম বাকী সিপাহীদের ভিতর থেকে বিশজনকে বাছাই করে নিয়ে হুকুম দিলেন, 'তোমরা এই সম্মানিত মহিলার সাথে বসরা পর্যন্ত যাবে এবং সেখানে পৌঁছে আমার তরফ থেকে গভর্নরকে বলবে যে, একে ইযযত ও শ্রদ্ধার সাথে দামেস্কে পৌঁছে দিতে হবে। পথের চৌকিগুলো থেকে যত সিপাহী সংগ্রহ করা সম্ভব, তোমাদের সাথে সামিল করে নেবে। সম্ভবত এক ভয়ানক দুশমন এর অনুসরণ করবে। বসরার ওয়ালীকে বলবে, তিনি যেনো এর সাথে কমসে কম একশ সিপাহী রওয়ানা করে দেন। তোমরাও হুঁশিয়ার থাকবে। এর দুশমনদের সাথে মোকাবিলা করবার সম্ভাবনা এলে তোমাদর সব চাইতে ফরয হবে এর জান বাঁচানো। পথে এর কোনো তকলীফ না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখবে।' হুকুম পেয়ে সিপাহী ঘোড়ার যিন লাগাতে ব্যস্ত হলো। নয়ীম ঘোড়া থেকে নেমে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নামে একটি চিঠি লিখে তাতে তার জন্য জোলায়খার কোরবানীর কথা জানিয়ে তাকে ইযযত ও শ্রদ্ধার সাথে দামেস্কে পৌঁছে দেবার আবেদন জানালেন। চিঠিখানা এক সিপাহীর হাতে দিয়ে তিনি এসে দাঁড়ালেন জোলায়খার কাছে। জোলায়খা তখনো মাথা নীচু করে বসে রয়েছে ঘোড়ার উপর। নয়ীম খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আপনাকে বিষণ্ন মনে হচ্ছে। কোনো চিন্তা করবেন না। আমি

আপনার হেফাজতের পুরো বন্দোবস্ত করে দিয়েছি। পথে কোনো তকলীফ হবে না আপনার। মনে করেছিলাম, আমিও আপনাদের সাথে বসরা পর্যন্ত যাবো. কিন্তু আমি নিরুপায়।'

'কোথায় যাবেন আপনি?' জোলায়খা বললেন।

'আমায় এক দোস্তের জান বাঁচাতে হবে।'

আপনি ইসহাকের পিছু ধাওয়া করতে যাচ্ছেন?'

'হাঁ, উম্মীদ রয়েছে, খুব শিগগিরই আমি তাকে ধরে ফেলবো।'

জোলায়খা তার অশ্রুভারাক্রান্ত চোখ দুটি রুমালে ঢেকে বললো, আপনি সতর্ক হয়ে চলবেন। ও যেমন বাহাদুর তেমনি প্রতারক।

'আপনি চিন্তা করবেন না। আপনার সাথীরা তৈরি হয়ে গেছে, আমারও দেরী হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা খোদা হাফিয।'

নয়ীম চলবার উপক্রম করেছেন। জোলায়খা অশ্রুভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে বিষণ্ন আওয়াজে বললেন, আমি একটা কথা আপনাকে জিগগেস করতে চাই।

'হাঁ বলুন।'

জোলায়খা চেষ্টা করেও বলতে পারে না। তার কালো চোখ থেকে উছলে উঠা অশ্রুর ফোটা পড়লো গাল বেয়ে।

'বলুন।' নয়ীম বললেন, 'আপনি আমায় কি প্রশ্ন করতে চেয়েছিলেন। আমি আপনার চোখের আসুর কদর ও কিমৎ জানি, কিন্তু আপনি আমার নিরুপায় অবস্থার খবর জানেন না।

'আমি জানি।' জোলায়খা চাপা আওয়াজে জওয়াব দিলো।

'হাঁ, আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে। কি জিগগেস করতে চান, বলুন।'

জোলায়খা বললো, 'আমি প্রশ্ন করতে চাই, যখন আমি আপনাকে কয়েদখানায় আওয়ায দিয়েছিলাম, তখন উযরা উযরা বলে আপনি উঠে আবার পড়ে গিয়েছিলেন।'

'হাঁ আমার মনে আছে।' নয়ীম জওয়াব দিলেন।

'আমি জানতে পারি, সে খোশনসীব কে? জোলায়খা কাপা গলায় প্রশ্ন করলো।

'আপনি ভুল করছেন। সে হয়তো অতোটা খোশনসীব নয়।'

'তিনি যিন্দাহ আছেন?'

'সম্ভবত।'

'খোদা করুন, তিনি যেন যিন্দাহ থাকেন। কোথায় তিনি? আমার পথ থেকে বহুত দূর না হলে আমি তাকে দেখে যেতে চাই একবার। আপনি আমার আবেদন কবুল করবেন?'

'আপনি সত্যি সত্যি সেখানে যেতে চান?

'আপনি অপছন্দ না করলে আমি খুবই খুশী হবো।'

'বহুত আচ্ছা। এ সিপাহী আপনাকে আমার ঘরে পৌছে দেবে। আমি ফিরে আসা পর্যন্ত আপনি ওখানে থাকবেন। কোনো কারণে দেরী না হলে সম্ভবত পথেই এসে আমি মিলবো আপনাদের সাথে।'

'তিনি আপনার মার কাছেই আছেন কি? আপনাদের কি শাদী হয়েছে'?

'না, কিন্তু সে প্রতিপালিত হয়েছে আমাদেরই ঘরে।'

এই কথা বলে নয়ীম সিপাহীদের লক্ষ্য করে হুকুম দিলেন, যেনো জোলায়খাকে বসরায় পৌছে না দিয়ে তার বাড়িতেই পৌছে দেওয়া হয়।

নয়ীম খোদা হাফিজ বলে চলে যাচ্ছিলেন, কিন্তু জোলায়খার অনুনয় ভরা দৃষ্টি আর একবার তার পথ রোধ করলো। জোলায়খা চোখ নীচু করে ডান হাত দিয়ে একখানা খনজর নয়ীমের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, আপনার হাতিয়ারের ভিতর থেকে এই খনজর আমি নিজের কাছে রেখেছিলাম কল্যাণ নিদর্শন হিসেবে। হয়তো এর প্রয়োজন হবে আপনার।

'যদি ওটাকে আপনি কল্যাণ নিদর্শন বলেই মনে করে থাকেন, তা হলে আমি খুশী হয়েই আপনাকে ওটা পেশ করছি। আপনি ওটা হামেশা কাছে রাখবেন।'

'শোকরিয়া। আমি ওটা হামেশা নিজের কাছে রাখবো। হয়তো কখনো এটা আমার কাজে লাগবে।'

নয়ীম তখন তার কথায় ততোটা মনোযোগ না দিয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হলেন, কিন্তু পরে বহুক্ষণ তার কথাগুলো বাজতে লাগলো তার কানের মধ্যে।

জোলায়খাকে এই ছোটখাটো কাফেলার সাথে পাঠিয়ে দিয়ে নয়ীম রওয়ানা হলেন ইসহাকের পিছু ধাওয়া করতে। প্রত্যেকটি চৌকিতে ঘোড়া বদল করে ইসহাকের সন্ধান করতে করতে তিনি ছুটে চললেন অত্যন্ত দ্রুত গতিতে। দুপুর বেলা তার সামনে এক সওয়ার তার নযরে পড়লো। নয়ীম তার ঘোড়ার গতি আরো বাড়িয়ে দিলেন। আগের সওয়ার নয়ীমের দিকে ফিরে তাকিয়ে ঢিলে করে দিলো তার ঘোড়ার বাগ। কিন্তু পিছনের সওয়ারের ঘোড়া অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আসছে, দেখে সে কি যেনো ভেবে ঘোড়ার গতি কমিয়ে দিলো। নয়ীম দূর থেকেই ইসহাককে চিনে ফেলেছেন। তিনি লৌহ শিরস্ত্রাণ নীচু করে দিয়ে মুখ ঢেকে নিলেন। নয়ীমকে কাছে আসতে দেখে ইসহাক রাস্তা থেকে কয়েক কদম সরে একদিকে দাঁড়ালো। নয়ীমও তার কাছে গিয়েই ঘোড়া থামালেন। উভয় সওয়ার মুহূর্তের জন্য পরস্পরের মুখোমখি হয়ে দাঁড়ালেন নির্বাক হয়ে। শেষ পর্যন্ত ইসহাক প্রশ্ন করলো, আপনি কে? আর কোথায় যাবার ইরাদা করেছেন?

'সেই একই প্রশ্ন আমিও তোমায় জিগগেস করতে চাচ্ছি। নয়ীম বললেন।

নয়ীমের কণ্ঠস্বরের কঠোরতা এবং আপনির মেকাবেলায় 'তুমি' বলতে দেখে ইসহাক পেরেশান হয়ে উঠলো, কিন্তু শিগগিরই পেরেশানি সংযত করে বললো, আপনি আমার প্রশ্নের জওয়াব না দিয়ে আর একটি প্রশ্ন করে বসেছেন।

নয়ীম বললেন, ভালো করে তাকাও আমার দিকে। তোমার দুটি প্রশ্নের জবাব মিলে যাবে।' কথাটি বলেই নয়ীম এক হাত দিয়ে তার মুখের আবরণ খুললেন।

'তুমি.....নয়ীম?' ইসহাকের মুখ থেকে অলক্ষ্যে বেরিয়ে এলো।

'হাঁ, তাই.....। নয়ীম তার লৌহ-শিরস্ত্রাণ আবার নীচু করে দিয়ে বললেন। ইসহাক তার ভীতি সংযত করে আচানক ঘোড়ার বাগ টেনে পিছু হটালো। নয়ীমও এক হাতে ঘোড়ার বাগ ও অপর হাতে নেযাহ সামলে নিয়ে তৈরি হয়ে গেছেন ইতিমধ্যে। দু'জনই প্রতীক্ষা করছেন পরস্পরের হামলার। আচানক ইসহাক নেযাহ বাড়িয়ে দিয়ে ঘোড়া হাকালো সামনের দিকে। ইসহাকের ঘোড়ার এক লাফে নয়ীম এসে গেছেন তার নাগালের ভিতর, কিন্তু বিজলী চমকের মতো দ্রুতগতিতে তিনি একদিকে ঝুঁকলেন। ইসহাকের নেযাহ সরে গেলো তার রানে খানিকটা হালকা যখম করে। ইসহাকের ঘোড়া কয়েক কদম আগে চলে গেলো। নয়ীম তখখুনি তার ঘোড়া ঘুরিয়ে তার পিছনে লাগিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে ইসহাক তার ঘোড়াটাকে বৃত্তাকার ঘুরিয়ে এনে আর একবার দাঁড়িয়ে গেলো নয়ীমের সামনে। উভয় সওয়ার একই সংগে নিজ নিজ ঘোড়া হাকিয়ে নেযাহ সামলাতে সামলাতে এগিয়ে গেলেন পরস্পরের দিকে। নয়ীম আর একবর আত্মরক্ষা করলেন ইসহাকের আক্রমণ থেকে। কিন্তু এবার নয়ীমের নেযাহ ইসহাকের সীনা পার হয়ে চলে গেছে। ইসহাককে খাক ও খুনের মধ্যে তড়পাতে দেখে নয়ীম ফিরে চললেন। পরের চৌকিতে গিয়ে তিনি যোহরের নামায আদায় করলেন। তারপর ঘোড়া বদল করে তিনি এক লহমা সময় নষ্ট না করে চললেন গন্তব্য পথে। যে চৌকি থেকে জোলায়খাকে বিদায় দিয়ে তিনি ইসহাকের সন্ধানে বেরিয়েছিলেন, সেখানে পৌছে জানলেন যে, ইবনে সাদেক তার দলবল নিয়ে চলে গেছে কেল্লা ছেড়ে। তাদের পিছনে ছুটে বেড়ানো নয়ীমের কাছে মনে হলো নিষ্ফল। তখনো সন্ধ্যার কিছুটা দেরী। এক সিপাহীর কাছ থেকে কাগজ-কলম চেয়ে নিয়ে নয়ীম এক চিঠি লিখলেন মুহম্মদ বিন কাসিমের নামে। সিন্ধু থেকে বিদায় নিয়ে আসার পর ইবনে সাদেকের হাতে গ্রেফতার হওয়ার কাহিনী তিনি সবিস্তারে লিখলেন তার চিঠিতে। তিনি তাকে ইবনে সাদেকের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত হবার জন্য তাগিদ করলেন। তিনি দ্বিতীয় চিঠি লিখলেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নামে। ইবনে সাদেককে অবিলম্বে গ্রেফতার করবার জরুরী ব্যবস্থা করার তাগিদ দিলেন তাকে। চিঠি দুটো চৌকিওয়ালাদের হাতে সোপর্দ করে দিয়ে নয়ীম তাদেরকে দ্রুত পৌছে দেবার নির্দেশ দিয়ে আবার ঘোড়ায় সওয়ার হলেন।

নয়ীমের মনে আশংকা ছিলো, ইবনে সাদেক হয়তো জোলায়খার অনুসরণ করবে। প্রতি চৌকিতে তিনি ছোট-খাটো কাফেলাটির খবর নিতে নিতে চললেন। তিনি জানতে পেলেন যে, অপর চৌকিগুলোয় সিপাহীর অভাব ছিলো বলেই জোলায়খার সাথে

দশজনের বেশি সিপাহী যেতে পারেনি। জোলায়খার হেফাযতের চিন্তা করে তিনি তখখুনি সেই কাফেলায় শামিল হতে চাইলেন এবং দ্রুত থেকে দ্রুততর বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে চললেন। রাত হয়ে গেছে। শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদ সারা সৃষ্টির উপর ছড়িয়ে দিয়েছে তার রূপালী আভা। নয়ীম পাহাড়-প্রান্তর অতিক্রম করে এসে পার হয়ে চলেছেন এক মরু অঞ্চল। পথের মধ্যে এক বিচিত্র দৃশ্য দেখে তার দেহের রক্ত জমাট হয়ে এলো। বালুর উপর পড়ে রয়েছে কয়েকটি ঘোড়া ও মানুষের লাশ। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তখনো তড়পাচ্ছে। নয়ীম ঘোড়া থেকে নেমে দেখলেন, জোলায়খার সাথে যারা এসেছিলো, তাদের কেউ কেউ রয়েছে তাদের মধ্যে। নয়ীমের দীলের মধ্যে সবার আগে জাগলো জোলায়খার চিন্তা। তিনি ঘাবড়ে গিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন। এক যখমী নওজোয়ান পানি চাইলো নয়ীমের কাছে। নয়ীম ঘোড়ার পিঠে বাঁধা মোশক থেকে পানি ধরলেন তার মুখের কাছে। এক হাত দিয়ে তার কম্পিত বুক চেপে ধরে তিনি কিছু জিজ্ঞেস করবেন, এর মধ্যে যখমী নওজোয়ান একদিকে হাতের ইশারা করে বললো, আমাদের আফসোস, আমাদের ফরয আদায় করতে পারিনি আমরা। আপনার হুকুম মোতাবেক আমরা নিজেদের জান বাঁচাবার চেষ্টা না করে শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত ওর জানের হেফাযত করবার জন্য লড়াই করেছি, কিন্তু ওরা ছিলো সংখ্যায় অনেক বেশি। আপনি ওর খবর নিন।'

এই কথা বলে সে আবার হাত দিয়ে ইশারা করলো এক দিকে। নয়ীম দ্রুত সেদিকে এগিয়ে গেলেন। কয়েকটি লাশের মাঝখানে জোলায়খাকে দেখে তার দীল কেঁপে উঠলো। কানের ভিতর শাঁই শাঁই আওয়ায হতে লাগলো। যে মুজাহিদ আজ পর্যন্ত অসংখ্যাবার নাযুক থেকে নাযুকতার পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছেন অকুতোভয়ে, এই মর্মান্তিক দৃশ্য তাকে কাঁপিয়ে তুললো।

'জোলায়খা!' জোলায়খা! তুমি....।'

জোলায়খার শ্বাস তখনো কিছুটা বাকী রয়েছে।—'আপনি এসে গেছেন?' সে বললো ক্ষীণ আওয়াযে।

নয়ীম এগিয়ে গিয়ে জোলায়খার মাথাটা তুলে ধরে পানি দিলেন তার মুখে। জোলায়খার সিনায় বিদ্ধ হয়ে রয়েছে এক খনজর। নয়ীম কম্পিত হাতে তার হাতল ধরে টেনে বের করতে চাইলেন, কিন্তু জোলায়খা হাতের ইশারায় তাকে মানা করে বললো, ওটা বের করে কোন ফায়দা হবে না। ওর কার্য ও করেছে আর এই শেষ মুহূর্তে আমি আপনার নিশানী থেকে জুদা হতে চাই না।'

নয়ীম হয়রান হয়ে বললেন, আমার নিশানী?'

জি হাঁ, এ খনজর আপনার। আপনার দেওয়া খনজর আমার কার্যে এসেছে, তাই আমি আপনার শোকরগুযারী করছি।

জোলায়খা! জোলায়খা তুমি আত্মহত্যা করলে!!

'প্রতিদিনের রূহানী মওতের চাইতে একদিনের জিসমানী মওতকে আমি ভাল মনে করেছি। খোদার ওয়াস্তে আপনি আমার উপর নারায হবেন না। শেষ পর্যন্ত আমি কি-ই বা করতে পারতাম? ভাঙ্গা তকদীরকে জোড়া দেওয়ার সাধ্য ছিলো না আমার, আর এই শেষ হতাশা আমি জিন্দাহ থেকে বরদাশত করতে পারতাম না।'

নয়ীম বললেন, জোলায়খা, আমি অত্যন্ত লজ্জিত কিন্তু উপায় ছিলো না।'

জোলায়খা নয়ীমের মুখের উপর প্রীতি ভরা দৃষ্টি হেনে বললো, 'আপনি আফসোস করবেন না। এই-ই ছিল কুদরতের মনযুর, আর কুদরতের কাছে এর চাইতে বেশি প্রত্যাশাও আমি করিনি। শেষ মুহূর্তে আপনি আমার পাশে রয়েছেন, এর চাইতে খোশনসীব আমার কিই বা হতে পারতো।'

জোলায়খা এই কথা বলে দুর্বলতা ও বেদনার আতিশয্যে চোখ মুদলো। কম্পিত দীপশিখা বুঝি নিভে গেল, ভয় করে নয়ীম 'জোলায়খা জোলায়খা' বলে তার মাথায় ঝাকুনি দিলেন। জোলায়খা চোখ খুলে নয়ীমের দিকে তাকালো এবং শুকনো গলায় হাত রেখে পানি চাইলো। নয়ীম পানি দিলেন তার মুখে। খানিকক্ষণ দু'জনই নির্বাক। এই স্তব্ধতার মধ্যে নয়ীমের দীলের কম্পন দ্রুততর ও জোলায়খার দীলের স্পন্দন ক্ষীণতর হতে লাগলো। মৃত্যুপথযাত্রীর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে রয়েছে শেষ সংগীর মুখের উপর, আর সংগীর ব্যথাতুর দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে তার বুকে নিমজ্জিত খনজরের উপর। শেষ পর্যন্ত জোলায়খা একবার কাতরে উঠে নয়ীমের মনোযোগ আকর্ষণ করে বললো, আপনার ঘরে গিয়ে আমি ওকে দেখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে আরযু আমার পুরা হলো না। আপনি গিয়ে ওকে আমার সালাম বলবেন। জোলায়খা আবার চুপ করলো।

খানিকক্ষণ চিন্তা করে জোলায়খা আবার বললো, আমি এখন এক দীর্ঘ সফরের পথে চলেছি। আপনার কাছে একটা প্রশ্ন করবো আমি। যে দুনিয়ায় আমি চলছি, সেখানে আমার পরিচিত কেউ থাকবে না। আমার বাপ-মাও হয়তো চিনবেন না আমায়, কেননা যখন এই জালেম চাচা আমায় চুরি করে এনেছে, তখন আমি ছিলাম খুবই ছোট। এ আশা কি আমি করতে পারি যে, সেই দুনিয়ায় আপনি একবার অবশ্যি মিলিত হবেন আমার সাথে। সেখানে এমন একজন লোক তো চাই, যাকে আমি আপনার বলতে পারবো। আপনাকেই আমি মনে করছি আমার আপনার জন। কিন্তু আপনি যতোটা আমার নিকট, ততোটা দূর।'

জোলায়খার কথা নয়ীমের দীলকে অভিভূত করলো। তার দু'চোখ হয়ে উঠলো অশ্রু ভারাক্রান্ত। তিনি বললেন, জোলায়খা যদি তুমি আমায় আপনার করে নিতে চাও, তাহলে তার একই পথ রয়েছে।

জোলায়খার বিষণ্ন মুখ খুশীতে দীপ্ত হয়ে উঠলো। হতাশার অন্ধকারে বিশীর্ণ ফুলের বুকে আশার আলো এনে দিলো নতুন সজীবতা। বেকারার হয়ে সে বললো, বলুন, কোন সে পথ?

'জোলায়খা! আমার প্রভুর গোলামী কবুল কর। তাহলে তোমার আমার মাঝখানে কোনো দূরত্ব থাকবে না।'

'আমি তৈরী। কিন্তু আপনার প্রভু আমায় গ্রহণ করবেন কি?'

'হাঁ। তিনি বড়ই কৃপাময়।'

'কিন্তু আমি তো কয়েক লহমার জন্যই মাত্র যিন্দাহ থাকব।'

'তার জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন নেই। জোলায়খা, বল।'

কি বলব?' বিগলিতাশ্রু জোলায়খা বললো।

নয়ীম কলেমায়ে শাহাদাত পড়লেন আর জোলায়খা তার সাথে সাথে তা আবৃত্তি করলো। জোলায়খা আর একবার পানি চাইলো এবং তা পান করে বললো—আমি অনুভব করছি, যেনো আমার দীল থেকে এক বোঝা নেবে গেছে।'

নয়ীম বললেন, 'এখান থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে রয়েছে ফৌজী চৌকি। তুমি ঘোড়ায় চড়তে পারলে তোমায় ওখানে নিয়ে যেতে পারতাম। এ অবস্থায় তোমার ঘোড়ার উপর বসা সম্ভব নয়, তাই আমায় কিছুক্ষণের জন্য এজাযত দাও। খুব শিগগীরই আমি ওখান থেকে সিপাহী ডেকে আনবো। হয়তো ওরা আশপাশের বস্তি থেকে কোন হাকীম খুঁজে আনতে পারবে।'

নয়ীম জোলায়খার মাথা যমীনের উপর রেখে উঠছিলেন, কিন্তু কমযোর হাত দিয়ে সে নয়ীমের জামা ধরে কেঁদে বললো, 'খোদার ওয়াস্তে আপনি কোথাও যাবেন না। ফিরে এসে আপনি যিন্দাহ পাবেন না আমায়। মরবার সময়ে আমি আপনার কাছ-ছাড়া হতে চাই না।'

নয়ীম জোলায়খার বেদনাতুর কণ্ঠের আবেদন অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। তিনি আবার বসে পড়লেন তার পাশে। জোলায়খা আশ্বস্ত হয়ে চোখ বন্ধ করলো। বহুক্ষণ সে পড়ে রইলো নিশ্চল। কখনো কখনো সে চোখ খুলে তাকাচ্ছে নয়ীমের মুখের দিকে। রাতের তৃতীয় প্রহর কেটে গেছে। ভোরের আভা দেখা যাচ্ছে। জোলায়খার দেহের শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। তার সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিসার হয়ে এসেছে, আর বহু কষ্টে সে টানছে শ্বাস।

জোলায়খা! নয়ীম বেকারার হয়ে ডাকলেন।

জোলায়খা শেষ বারের মত চোখ খুললো এবং এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুমিয়ে পড়লো চিরকালের মত। 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেউন' বলে নয়ীম মাথা নত করলেন। অলক্ষ্যে তার চোখ থেকে নেমে এলো অশ্রুর বন্যা। সে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো জোলায়খার মুখের উপর। জোলায়খার নির্বাক মুখ যেন বলে যাচ্ছে ঃ

'হে পবিত্র আত্মা! তোমার অশ্রুর মূল্য আমি আদায় করে গেলাম।' নয়ীম উঠে ঘোড়ায় সওয়ার হলেন এবং নিকটের চৌকিতে পৌছে কয়েকজন সিপাহীকে ডেকে আনলেন। আশপাশের বস্তি থেকেও কতক লোক এসে জমা হলো সেখানে। নয়ীম জানাযার নামায পড়িয়ে জোলায়খা ও তার সংগীদের দাফন করে চললেন তার বাড়ির পথে।

আট

রাতের বেলায় নয়ীম এক বিস্তীর্ণ মরু-প্রান্তর অতিক্রম করে চলেছেন। জোলায়খার মৃত্যুশোক, সফরের ক্লান্তি, আরো নানারকমের পেরেশানির ফলে কেমন যেনো উদাস মন নিয়ে তিনি এগিয়ে চলেছেন মনযিলে মকসুদের দিকে। জনহীন প্রান্তরে মাঝে মাঝে শোনা যায় নেকড়ে ও শিয়ালের আওয়ায। তারপরই আবার নিস্তব্ধ-

নিঝুম। খানিকক্ষণ পরে পূর্বদিগন্তে দেখা দিলো শুক্লপক্ষের চাঁদ। অন্ধকার পর্দা গেলো ছিন্ন হয়ে, নিষ্প্রভ হয়ে এলো সিতারার দীপ্তি। বাড়তি আলোয় নয়ীমের নযরে পড়তে লাগলো দূরের টিলা পাহাড়, বন-ঝাড় আর গাছপালা। মনযিলে মকসুদের কাছে এসে গেছেন তিনি। তার বস্তির আশপাশের বাগবাগিচার অস্পষ্ট ছবি ভেসে উঠছে তার চোখে। তার রঙিন স্বপ্নের কেন্দ্রভূমি যে বস্তি, যে বস্তির প্রতি ধূলিকণার সাথে রয়েছে তার দীলের সম্পর্ক, সেই বস্তি এখন তার কতো কাছে। দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে তিনি সেখানে পৌছে যেতে পারেন, তবু তার কল্পনা বার বার সেখান থেকে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বহু ক্রোশ দূরে জোলায়খার শেষ বিরাম ভূমির দিকে। জোলায়খার মওতের মর্মান্তিক দৃশ্য বারংবার ভেসে উঠছে তার দৃষ্টির সামনে। তার শেষ কথাগুলো গুঞ্জন করে যাচ্ছে তার কানে। তিনি খানিকক্ষণের জন্য ভুলে যেতে চান সে মর্মান্তিক কাহিনী, কিন্তু তিনি অনুভব করেন, যেন সারা সৃষ্টি সেই নির্যাতিত নারীর আর্তনাদ ও অশ্রুধারায় বেদনাতুর।

নিজের ঘরের হাজারো আশংকা তাকে উতলা করে তুলেছে। তিনি তার যিন্দেগীর আশা আকাঙ্খার কেন্দ্রস্থলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু তার দীলের মধ্যে নওজোয়ান-সুলভ উৎসাহ-উদ্যম আর উদ্দীপনার চিহ্ন নেই। অতীত যিন্দেগীতে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে কখনো তিনি এমনি ঢিলেঢালা হয়ে বসেন নি। চিন্তার ভারে তিনি যেনো পিষ্ট হয়ে যাচ্ছেন।

আচানক বস্তির দিক থেকে একটা আওয়াজ এলো তার কানে। তিনি চমকে উঠে শুনতে লাগলেন সে আওয়ায। বস্তির মেয়েরা দফ বাজিয়ে গান গাইছে। শাদী উপলক্ষে আরব নারীরা যে সাদাসিধা গান গাইতো, এ সেই গান। নয়ীমের দীলের স্পন্দন দ্রুততর হতে লাগলো। তার মন চায়, উড়ে ঘরে চলে যেতে কিন্তু কিছুদূর গিয়েই তার ক্রমবর্ধমান উদ্যম যেনো উবে যায়। তিনি সেই ঘরের চারদেয়ালের কাছে এসে গেলেন, যেখান থেকে ভেসে আসছে গানের আওয়ায। এ যে তারই আপন ঘর। খোলা দরযার সামনে গিয়ে তিনি ঘোড়া থামালেন। কিন্তু কি যেনো মনে করে আর এগুতে পারলেন না তিনি।

আঙিনার ভিতরে মশাল জ্বলছে। বস্তির লোক খানাপিনায় মশগুল। মেয়েরা জমা হয়েছে ছাদের উপর। মেহমানদের সমবেত হবার কারণ তিনি চিন্তা করতে লাগলেন আপন মনে। তার মনে হলো, বুঝি খোদা উযরার কিসমতের ফয়সালা করে ফেলেছেন। মনের উদাস চিন্তা ভাবনা তাকে এমন অভিভূত করলো যে, তার ঘরের জান্নাত আজ তার কাছে মনে হচ্ছে সকল আশা-আকাঙ্খার সমাধি। নীচে নেবে ঘর থেকে কয়েক কদম দূরে তিনি ঘোড়া বাঁধলেন এক গাছের সাথে। তারপর গা ঢাকা দিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন গাছের ছায়ায়।

বস্তির একটি ছেলে ছুটে বেরিয়ে এলো বাইরে। নয়ীম এগিয়ে গিয়ে তার পথ রোধ করে শুধালেন, 'এখানে কিসের দাওয়াত?'

বালক চমকে উঠে নয়ীমের দিকে তাকালো, কিন্তু গাছের ছায়া আর নয়ীমের মুখের অর্ধেকটা লৌহ শিরস্ত্রাণে ঢাকা বলে সে চিনতে পারলো না তাকে।

সে জওয়াবে বললো, 'শাদী হচ্ছে এখানে।'

'কার শাদী?'

'আবদুল্লাহর শাদী হচ্ছে। আপনি বোধ হয় বিদেশী। চলুন, আপনি এ দাওয়াতে শরীক হবেন।' কথাটি বলেই চলে যাচ্ছিল, কিন্তু নয়ীম বাযু ধরে তাকে থামালেন।

বালক পেরেশান হয়ে বললো, 'আমায় ছেড়ে দিন। আমি কাযীকে ডাকতে যাচ্ছি।'

যদিও নয়ীমের দীল এ প্রশ্নের জওয়াব আগেই দিয়েছে, তবু তার অন্তরের প্রেম ব্যর্থতা ও হতাশার শেষ দৃশ্য চোখের সামনে দেখেও আশা ছাড়লো না। তিনি কম্পিত আওয়াযে প্রশ্ন করলেন, 'আবদুল্লার শাদী হবে কার সাথে?'

'উযরার সাথে।' বালক জওয়াব দিলো।

'আবদুল্লার মা কেমন আছেন?' শুকনো গলার উপর হাত রেখে প্রশ্ন করলেন নয়ীম।

'আবদুল্লার মা? তিনিতো ইন্তেকাল করেছেন তিনচার মাস আগেই।'

বলেই বালক ছুটে চললো।

নয়ীম গাছটিকে ধরে দাঁড়ালেন। মায়ের শোক তার অন্তর তোলপাড় করে তুললো। তার চোখে নামলো অশ্রুর দরিয়া। খানিকক্ষণ পর সেই বালক কাযীকে নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো। নয়ীমের দীলের মধ্যে দুটি পরস্পর বিরোধী আকাঙ্খা জেগে উঠলো। তার দীল বলে উঠলো, এখনো তার তকদীর তার হাতের নাগালের ভিতরে। উযরা তার কাছ থেকে দূরে নয়। তার যিন্দাহ ফিরে আসার খবর জানলে আবদুল্লাহ তার যিন্দেগীর সর্বস্ব কোরবান করেও তার দীলের ভেঙ্গে পড়া বস্তি আবাদ করে দেবেন মনের খুশীতে। এখনো সময় রয়েছে।

তার বিবেক আবার দ্বিতীয় আওয়ায তুললো ঃ এই-ইতো তোমার ত্যাগ ও সবরের পরীক্ষা। উযরার প্রতি তোমার ভাইয়ের মহব্বত তো কম নয়, আর কুদরতের মনযুরও এই যে, উযরা আর আবদুল্লাহ এক হয়ে থাকবেন। আত্মত্যাগী ভাই তোমার জন্য নিজের খুশীকে কোরবান করতে তৈরী হবেন, কিন্তু তা হবে যুলুম। যদি তুমি আবদুল্লাহর কাছে সেই কোরবানীর দাবী কর, তাহলে তোমার আত্মা কখনো সন্তোষ লাভ করবে না। সিন্ধুর উপকূল পর্যন্ত তোমার সন্ধান করে শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে তিনি শাদী করছেন উযরাকে। তুমি বাহাদুর, তুমি মুজাহিদ, সংযত হয়ে থাক। 'উযরার জন্য চিন্তা কর না। সময় ধীরে ধীরে তার দীল থেকে মুছে ফেলবে তোমার স্মৃতির বেদনা। আর এমন কোন গুণ রয়েছে তোমার যা আবদুল্লাহর ভিতরে নেই?'

বিবেকের দ্বিতীয় আওয়াযই নয়ীমের কাছে ভালো লাগলো। তিনি অনুভব করলেন, যেন তার দীল থেকে নেমে যাচ্ছে এক অসহনীয় বোঝা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নয়ীমের দুনিয়া বদলে গেলো তার চোখে।

ঘরে যখন আবদুল্লাহ ও উযরার শাদী পড়ানো হচ্ছে, নয়ীম তখন বাইরে গাছের নীচে সিজদায় মাথা নত করে দোআ করছেন, 'দীন দুনিয়ার মালিক! এ শাদীতে বরকত দাও। উযরা ও আবদুল্লাহর সারা জীবন খুশি আনন্দে অতিবাহিত হোক। একে অপরের জন্য তাদের দীল-জান উৎসর্গিত হোক। সত্যিকার জীবন মরণের মালিক! আমার হিসসার তামাম খুশী তুমি ওদেরকে দাও।'

অনেকক্ষণ পর নয়ীম যখন সিজদাহ থেকে মাথা তুললেন মেহমানরা তখন চলে গেছে। মন চাইলো, তিনি ছুটে গিয়ে ভাইকে মোবারকবাদ দিয়ে আসেন, কিন্তু আর একটি চিন্তা তাকে বাধা দিলো। তিনি ভাবলেন, ভাই তাকে দেখে খুশী হবেন নিশ্চয়ই, কিন্তু লজ্জাও হয়তো পাবেন। তিনি যে যিন্দাহ রয়েছেন তাতো উযরার কাছে প্রকাশ করা চলে না। তার ফিরে আসা সম্পর্কে হতাশ হয়ে উযরা এতদিনে যে সবুর ও স্থিরতা লাভ করেছেন তা যে মুহূর্তের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তিনি মরে গেছেন, মনে করে যদি তারা শাদী করে থাকেন, তাহলে উযরার তামাম যিন্দেগী হবে অশান্তিপূর্ণ। তাকে দেখে তিনি লজ্জায় মরে যাবেন। উযরার পুরানো যখম আবার তাযা হয়ে উঠবে। তার চাইতে ভালো তিনি তাদের কাছ থেকে দূরে থাকবেন, তার দুর্ভাগ্যে শরীক করবেন না তাদেরকে। তার বিবেক এ চিন্তায় সায় দিলো। মুহূর্ত-মধ্যে মুজাহিদের দীলে জাগলো সুদৃঢ় প্রত্যয়। নয়ীম ফিরে চলবার আগে কয়েক কদম এগিয়ে গেলেন ঘরের দিকে; তারপর বেদনাতুর দৃষ্টি মেলে তাকালেন তার আশা-আকাঙ্খার শেষ সমাধির দিকে। ফিরে চলবার উপক্রম করতেই আঙিনায় কার পায়ের আওয়ায এলো তার কানে। তার মনোযোগ নিজের দিকে নিবদ্ধ হলো। আবদুল্লাহ ও উযরা কামরা থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন আঙিনায়। তিনি মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলেন, কিন্তু আবদুল্লাহকে লেবাসের বদলে বর্ম পরিহিত ও উযরাকে তার কোমরে তলোয়ার বেঁধে দিতে দেখে তিনি হয়রান হয়ে দাঁড়ালেন দরযার আড়ালে। তখখুনি তিনি বুঝলেন যে, আবদুল্লাহ জিহাদে যাচ্ছেন। এতে নয়ীমের হয়রান হবার কিছু নেই। এই প্রত্যাশাই তিনি করেছেন ভাইয়ের কাছে।

আবদুল্লাহ হাতিয়ার পরিধান করে আস্তাবল থেকে ঘোড়া নিয়ে এসে আবার দাঁড়ালেন উযরার সামনে।

'উযরা, তুমি দুঃখ পাওনি তো?' আবদুল্লাহ হাসিমুখে তার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন।

'না, আমারও তো মন চায় এমনি করে বর্ম পরে ময়দানে যেতে।' উযরা মাথা নেড়ে জওয়াব দিলেন।

'উযরা, আমি জানি, বাহাদুর তুমি, কিন্তু আজ সারাদিন আমি তোমার দিকে তাকিয়ে দেখেছি। আমি বুঝি, তোমার দীলের উপর আজও এক বোঝা চেপে রয়েছে, যা তুমি আমার কাছে গোপন করতে চাচ্ছ। নয়ীম যে ভুলে যাবার মতো ব্যক্তিত্ব নয়, তা আমার জানা আছে। 'উযরা! আমরা সবাই আল্লার তরফ থেকে এসেছি আর তারই কাছে ফিরে যাবো আমরা। সে যিন্দাহ থাকলে অবশ্যি ফিরে আসতো। সে আমার কম প্রিয় ছিলো, এমন কথা মনে করো না তুমি। আজও যদি আমার জান কোরবান করে দিয়ে

তাকে ফিরিয়ে আনতে পারতাম, তাহলে হাসিমুখে আমি জান বাজি রাখতাম। হায়! তুমি যদি ভাবতে, এ দুনিয়ায় আমিও কত একা? আমার মা ও নয়ীম চলে যাবার পর এ দুনিয়ায় আমার কেউ নেই। আমরা চেষ্টা করলে একে অপরকে খুশী রাখতে পারি।'

'আমি চেষ্টা করবো।' উযরা জওয়াবে বললেন।

'আমায় নিয়ে চিন্তা করো না, কেননা স্পেনে আমায় তেমন কোনো বিপজ্জনক অভিযানে যেতে হবে না। সে দেশ প্রায় বিজিত হয়ে গেছে। কয়েকটি এলাকা বাকী রয়েছে মাত্র। তাদেরও মোকাবিলা করবার তাকৎ নেই। শিগগীরই ফিরে এসে আমি তোমায় নিয়ে যাব সাথে। খুব বেশি হলে আমার ছ'মাস লাগবে।'

আবদুল্লাহ 'খোদা হাফিয' বলে ঘোড়ায় সওয়ার হলেন। নয়ীম তাকে বাইরে আসতে দেখে কয়েক কদম দূরে দাঁড়িয়ে গেলেন এক খেজুর কুঞ্জের আড়ালে।

দরযার বাইরে এসে আবদুল্লাহ উযরার দিকে একবার ফিরে তাকিয়ে ঘোড়া হাঁকালেন দূর বিদেশের পথে।

ভোরের আলোর আভাস দেখা দিয়েছে। আবদুল্লাহ ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন গন্তব্য পথে। পেছন থেকে আর একটি ঘোড়ার পায়ের আওয়ায তার কানে এলো। তিনি ফিরে দেখলেন, এক সওয়ার আরও জোরে ছুটে আসছেন সেই পথে। আবদুল্লাহ ঘোড়া থামিয়ে পিছনের সওয়ারকে দেখতে লাগলেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। পিছনের সওয়ারের মুখ লৌহ শিরস্ত্রাণ দিয়ে ঢাকা। আবদুল্লাহর মনে উদ্বেগ জাগলো। তিনি হাতের ইশারায় থামাতে চাইলেন তাকে। কিন্তু আবদুল্লাহর ইশারার পরোয়ানা না করে তিনি যথারীতি ছুটে চললেন তাকে ছাড়িয়ে। আবদুল্লাহর উদ্বেগ আরও বেড়ে গেলো। তিনি পিছু পিছু ঘোড়া ছুটালেন। আবদুল্লাহর তাযাদম ঘোড়া। অপর ব্যক্তিকে শাহসওয়ার মনে হলেও তিনি বেশি দূর এগিয়ে যেতে পারলেন না। তার ঘোড়ার মুখে তখন ফুটে উঠেছে ক্লান্তির চিহ্ন। আবদুল্লাহ কাছে এসে নেযাহ বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি দোস্ত হলে দাঁড়িয়ে যাও, আর দুশমন হলে মোকাবিলার জন্য তৈরী হও।'

দ্বিতীয় সওয়ার ঘোড়া থামালেন।

'আমায় মাফ করুন।' আবদুল্লাহ বললেন, 'আমি জানতি চাচ্ছি, আপনি কে? আমার এক ভাই বিলকুল আপনারই মতো ঘোড়ার উপর বসতো আর ঠিক আপনারই মতো ঘোড়ার বাগ ধরতো। তার দেহটিও ছিল ঠিক আপনারই মতো। আমি আপনার নাম জিগগেস করতে পারি?'

সওয়ার নীরব।

'আপনি কথা বলতে চান না?...আমি জিগগেস করছি, আপনার নাম কি?...আপনি বলবেন না?'

সওয়ার এবারও নীরব হয়ে রইলেন।

'মাফ করবেন, যদি মনোঃকষ্টের কারণে আপনি কথা না বলতে চান, তাহলে কমপক্ষে আপনার চেহারা দেখাতে কোনো আপত্তি থাকা উচিত হবে না। কোনো দেশের গুপ্তচর হলেও আমি আপনাকে না দেখে আজ যেতে দেবো না।' এই কথা বলে আবদুল্লাহ তার ঘোড়া আগন্তুকের ঘোড়ার কাছে নিয়ে গেলেন এবং আচানক নেযার মাথা দিয়ে তার শিরস্ত্রাণ তুলে ফেললেন। আগন্তুকের মুখের দিকে তাকিয়ে আবদুল্লাহর মুখ থেকে 'নয়ীম' বলে এক হালকা চীৎকার ধ্বনি বেরিয়ে এলো। নয়ীমের চোখ দিয়ে বয়ে চলেছে অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা।

দু'ভাই ঘোড়া থেকে নেমে পরস্পর আলিংগনাবদ্ধ হলেন।

'ভারী বেওকুফ হয়েছো তুমি।' আবদুল্লাহ নয়ীমের পেশানীর উপর হাত বুলিয়ে বললেন, কমবখত! এতটা আত্মাভিমান? আর এ তো আত্মভিমানও নয়। তোমার কিছুটা বুদ্ধি থাকা উচিত ছিলো আর এও তো ভাবা উচিত ছিল যে তোমার মা তোমার জন্য ইনতেযার করছেন। তোমার ভাই তোমার সন্ধান করে বেরিয়েছে সারা দুনিয়ায় আর উযরাও বস্তির উঁচু টিলায় চড়ে তোমার পথের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, কিন্তু কোনো কিছুর পরোয়া করলে না তুমি। খোদা জানেন, কোথায় লুকিয়ে ছিলে এতকাল। এ তুমি কি করলে?'

নয়ীম কোন জওয়াব না দিয়ে ভাইয়ের সামনে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। দীলের কথাগুলো ফুটে বেরুচ্ছে তার চোখ দিয়ে। আবদুল্লাহ তার নীরবতায় অবিভূত হয়ে নয়ীমকে আর একবার বুকে চেপে ধরে বললেন, 'কথা বলছো না তুমি। আমার উপর তোমার এতটা বিদ্বেষ যে, মুখ ঢেকে চলে যাচ্ছিলে আমার পাশ দিয়ে! কোত্থেকে এসে কোথায় চলে যাচ্ছো তুমি? আমি সিন্ধুতে তোমার খোঁজ করে কোন সন্ধান পাইনি। কেন তুমি ঘরে এলে না?'

নয়ীম এক ঠাণ্ডা শ্বাস ফেলে বললেন, ভাই, আমার ঘরে ফিরে আসা খোদার মনযুর ছিলো না।'

'কোথায় ছিলে তুমি? আবদুল্লাহ শুধালেন।

তার প্রশ্নের জওয়াবে নয়ীম তার কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করলেন, কেবল বললেন না জোলায়খার কথা। আরো বললেন যে, আগের রাত্রে তিনি ঘরের বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন। নয়ীমের কথা শেষ হলে দু' ভাই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আবদুল্লাহ প্রশ্ন করলেন, কয়েদ থেকে মুক্তি পেয়েও তুমি ঘরে এলে না কেন?

নয়ীমের মুখে জওয়াব নেই। নির্বাক হয়ে রইলেন।

'এখন ঘরে না গিয়ে কোথায় চলেছো?' আবদুল্লাহ প্রশ্ন করলেন।

'ভাই আমি ইবনে সাদেককে গ্রেফতার করবার জন্য বসরা থেকে কিছু সিপাহী আনতে যাচ্ছি।'

আবদুল্লাহ বললেন, 'আমি তোমায় একটি কথা জিজ্ঞেস করবো। আশাকরি, তুমি মিথ্যে বলবে না।

'জিজ্ঞেস করুন।'

'তুমি বল, কয়েদ থেকে মুক্তি পাবার পর কেউ তোমায় বলেছিলো যে, উযরার শাদী হতে চলেছে?'

নয়ীম মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানালেন।

'এখন তুমি জানতে পেরেছ যে, উযরার শাদী আমার সাথে হয়েছে?'

'জি হাঁ! আমি আপনাকে মোবারকবাদ দিচ্ছি।'

তুমি বস্তি হয়ে এসেছো? আবদুল্লাহ প্রশ্ন করলেন।

'হাঁ।' নয়ীম জওয়াব দিলেন।

'ঘরে গিয়েছিলে?'

'না।'

'কেন?

নয়ীম নির্বাক হয়ে গেলেন।

আবদুল্লাহ বললেন, 'আমি জানি, তোমার উপর আমি যুলুম করেছি মনে করে তুমি ঘরে যাওনি।'

'আপনার ধারণা ভুল। আপনার ও উযরার উপর যুলুম করতে চাইনি বলেই আমি ঘরে ফিরে যাইনি। আমি জানি, আপনি আমার ফিরে আশা সম্পর্কে হতাশ হয়েছিলেন এবং ভেবেছিলেন যে, উযরা দুনিয়ায় একা আর আপনাকে তার প্রয়োজন। আমি আর একবার ঘরে ফিরে পুরানো যখমগুলো তাযা করে দিয়ে উযরার যিন্দেগী তিক্ত বিস্বাদ করে দিতে চাইনি। প্রকৃতির ইশারা বারংবার আমায় বুঝিয়ে দিয়েছে যে, উযরা আমার জন্য নয়, তকদীর আপনাকেই সে আমনতের মোহাফেয মনোনীত করে নিয়েছে। তকদীরের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাই না আমি। উযরা আপনাকে আর আপনি উযরাকে খুশী রাখতে পারবেন, এই একিন আছে বলেই আমি খুশী হয়েছি। আপনাদের উভয়ের খুশীর চাইতে বড় আর কোন আকাংক্ষা নেই আমার। আপনি আমার ও উযরার একটা উপকার করবেন। উযরার দীলে এ খেয়াল কখনও আসতে দেবেন না যে, আমি যিন্দাহ রয়েছি। আপনার সাথে আমার দেখা হয়েছে, একথা ওকে বলবেন না কোনোদিন।'

নয়ীম, আমার কাছে কি গোপন করতে চাও? এতো এমন কোন রহস্য নয়, যা আমি বুঝতে পারি না। তোমার চোখ, তোমার মুখভাব, তোমার চেহারা, তোমার কথা, তোমার কণ্ঠস্বর প্রকাশ করছে যে, তুমি এক জবরদস্ত বোঝার তলায় পিষ্ট হচ্ছো। উযরা শুধু আমার মন রাখবার জন্য এ কোরাবাণী করেছে এবং তাও এই খেয়ালে যে, সম্ভবত...।'

'সম্ভবত ঃ আমি মরে গেছি।' নয়ীম আবদুল্লাহর অসমাপ্ত কথাটি পূরণ করে দিলেন।

'ওহ, নয়ীম, তুমি আমায় আর শরম দিও না। আমি তোমায় বহুত তালাশ করেছি, কিন্তু....

'খোদার মনযুর এই-ই ছিল।' নয়ীম আবদুল্লাহর কথায় বাধা দিয়ে বললেন।

নয়ীম! নয়ীম! তুমি কি মনে করছো যে, আমি...।' আবদুল্লাহ আর কিছু বলতে পারলেন না। তার চোখ দুটি অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন ভাইয়ের সামনে এক বেগুনাহ আসামীর মত।

নয়ীম বললেন, 'ভাই। একটা মামুলী কথার উপর এতটা গুরুত্ব কেন দিচ্ছেন আপনি?'

আবদুল্লাহ জওয়াব দিলেন, হায়! এ যদি সত্যি সত্যি মামুলী কথা হতো। এছিলো আম্মির নির্দেশ যে, উযরাকে যেন একা ছেড়ে না দিই। কিন্তু সে 'তোমায় আজও ভোলেনি। সে তোমারই। তোমার ও উযরার খুশীর জন্য আমি তাকে তালাক দিয়ে দেবো। তোমাদের দু'জনের ভেঙে যাওয়া ঘর আবার আবাদ করে দিয়ে আমি যে কি সন্তোষ লাভ করবো, তা আমিই জানি।'

'ভাই' খোদার ওয়াস্তে এমন কথা বলবেন না। এমন কিছু বললে আমাদের তিনজনের যিন্দেগীই হয়ে যাবে তিক্ত-বিস্বাদ, আমার নিজের চোখে আমি ছোট হয়ে যাবো। আমাদের উচিত তকদীরের উপর শোকরগুযারী করা।'

'কিন্তু আমার বিবেক আমায় কি বলবে?'

নয়ীম তার মুখের উপর এক আশ্বাসের হাসি টেনে এনে বললেন, আপনার শাদীতে আমার মরযীও শামিল ছিলো।

'তোমার মরযী? তা কি করে?'

'কাল রাত্রে আমি সেখানেই ছিলাম।'

'কোন সময়ে?'

'আপনার নিকাহ হবার খানিকক্ষণ আগে থেকেই আমি বাড়ির বাইরে থেকে সব অবস্থা জেনেছিলাম।

'ঘরে কেন এলে না'

নয়ীম নির্বাক হয়ে থাকলেন।

'এই জন্যে যে, তুমি তোমার স্বার্থপর ভাইয়ের মুখ দেখতে চাওনি।'

'না, সে জন্য নয়। আল্লার কসম, সে জন্য নয়, বরং আমি আমার বেগরয ভাইয়ের সামনে নিজের স্বার্থপরতা দেখাতে যাওয়া লজ্জাজনক মনে করেছি। আপনারই শেখানো একটি সবক আমার দীলের মধ্যে ছিল আঁকা।'

'আমার সবক'!

আমায় আপনি সবক দিয়েছিলেন যে, যে আকর্ষণ ত্যাগের মনোভাব বর্জিত, তাতে মহব্বত বলা যায় না।'

'তোমার ভিতরে এ ইনকেলাব কি করে এল, ভেবে আমি হয়রান হচ্ছি। সত্যি করে বলো তো, আর কারুর কল্পনা তোমার দীলে উযরার জায়গা তো দখল করেনি? আমার মনে এ সন্দেহ জাগেনি কখনো, তবু গোড়ার দিকে উযরা আম্মির কাছে এমনি সন্দেহ প্রকাশ করতো। আমার একিন ছিলো যে, জিহাদের এক অসাধারণ মনোভাব তোমায়

টেনে নিয়ে গেছে সিন্ধুর পথে। কিন্তু তবু মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ জেগেছে যে, তুমি জেনে শুনে হয়তো শাদী এড়িয়ে চলেছো। তোমার ঘরে ফিরে না আসার কারণ যদি তাই হয়, তবু তুমি ভাল করনি।'

নয়ীম নির্বাক। কি জওয়াব দেবেন, তা তিনি জানেন না। তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো ছেরেলাবার একটি ঘটনা। যেদিন তিনি উযরাকে নিয়ে পানিতে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন, সেদিন আবদুল্লাহ তারই জন্য না- করা অপরাধের বোঝা কাঁধে নিয়ে তাকে বাঁচিয়েছিলেন সাজা থেকে। তিনিও আজ এক না করা অপরাধ স্বীকার করে ভাইয়ের মনে এনে দিতে পারেন সন্তোষ।

নয়ীমের নীরবতায় আবদুল্লাহর মনের সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হলো। তিনি নয়ীমের বাযু ধরে ঝাঁকানী দিয়ে বললেন, বল নয়ীম।'

নয়ীম চমকে উঠে আবদুল্লাহর মুখের উপর দৃষ্টি নিবন্ধ করে হেসে বললেন, হাঁ ভাই। আমি দীলের মধ্যে আর একজনকে জায়গা দিয়ে ফেলেছি।'

আবদুল্লাহ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'এখন বল, তাকে তুমি শাদী করেছ কিনা?'

'না।'

'কেন, এর মধ্যে কোন মুশকিল রয়েছে কি?'

'না।'

'শাদী কবে করবে?'

'শিগগীরই।'

'ঘরে কবে ফিরে যাবে?'

'ইবনে সাদেকের গ্রেফতারির পর।'

'আচ্ছা, আমি বেশি কিছু জিজ্ঞেস করব না তোমায়। খুব শিগগীরই আমার আন্দালুস পৌছে যাবার হুকুম না হলে আমি তোমার শাদী দেখে যেতে পারতাম। ফিরে আসা পর্যন্ত আমি এ প্রত্যাশা করতে পারি যে, তুমি ইবনে সাদেককে গ্রেফতার করার পর ঘরে ফিরে আসবে?

ইনশাআল্লাহ।

দু'ভাই পাশাপাশি হয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হলেন। নয়ীম প্রকাশ্যে আবদুল্লাহকে আশ্বাস দিলেও তার দীল কাঁপছে তখনও। আবদুল্লাহর উপর্যুপরি প্রশ্নের আঘাতে তিনি ঘাবড়ে উঠেছেন। তামাম রাস্তায় তিনি ভাইয়ের কাছে প্রশ্ন করতে লাগলেন আন্দালুস সম্পর্কে। প্রায় দু'ক্রোশ পথ চলবার পর এক চৌরাস্তায় এসে দু'জনের পথ আলাদা হয়ে গেছে। তার কাছে এসে নয়ীম মোসাফেহার জন্য আবদুল্লাহর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে এজাযত চাইলেন।

আবদুল্লাহর হাত নয়ীমের নিজের হাতে নিয়ে শুধালেন, 'নয়ীম। যা কিছু তুমি আমায় বললে, সব সত্য, না আমার মন রাখবার জন্য বললে এসব কথা?'

'আমার উপর আপনার বিশ্বাস নেই?'

'আমার বিশ্বাস আছে তোমার উপর।'

'আচ্ছা, খোদাহাফিয।'

আবদুল্লাহ নয়ীমের হাত ছেড়ে দিলেন। নয়ীম মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে দ্রুত ঘোড়া ছুটালেন। যতক্ষণ না নয়ীমের ঘোড়া তার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো, ততক্ষণ আবদুল্লাহ নয়ীমের কথাগুলো নিয়ে চিন্তা করতে থাকলেন। নয়ীম তার নযরের বাইরে চলে গেলে তিনি হাত তুলে দোআ করলেন ঃ ওগো দীন দুনিয়ার মালিক! উযরা আমার জীবন সংগিনী হবে, এই যদি হয় তোমার মনযুর, তা হলে আমার তকদীরের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। ওগো মাওলা! নয়ীম যা কিছু বললো, তা যেনো সত্য হয়। আর যদি তা সত্য নাও হয়ে থাকে তুমি তাকে সত্য করে দেখাও। তার প্রেমিকা যেন এমন কেউ হয়, যাকে নিয়ে সে ভুলে যেতে পারে উযরাকে। ওগো রহীম! ওর দীলের ভেঙে পড়া বস্তিকে আবার আবাদ করে দাও। আমার কোনও নেকী যদি তোমার রহমতের হকদার হয়ে থাকে, তা হলে তার বদলায় তুমি নয়ীমকে দান করো দুনিয়া ও আখেরাতের সুখ-শান্তি।'

নয়ীমের বসরায় পৌছবার আগেই ইবনে সাদেককে গ্রেফতার করবার চেষ্টা চলছিলো, কিন্তু তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। নয়ীম বসরার ওয়ালীর সাথে মোলাকাত করলেন। তাকে নিজের অতীত দিনের কাহিনী শুনিয়ে তিনি আবার সিন্ধুতে ফিরে যাবার ইরাদা জানালেন।

নয়ীম যিন্দাহ ফিরে আসায় বসরার ওয়ালী আনন্দ প্রকাশ করে বললেন, সিন্ধু বিজয়ের জন্য একমাত্র মুহাম্মদ বিন কাসিমই যথেষ্ট। তিনি ঝড়ের মতো রাজা-মহারাজাদের পংগপালের মত অগুনতি সেনাদলকে দলিত করে সিন্ধুর সর্বত্র উড্ডীন করছেন ইসলামী পতাকা। এখন তুর্কিস্তানের বিরাট মুলুক পূর্ণ বিজয়ের জন্য চাই নিপুন যোদ্ধা। কুতায়বা বোখারার উপর হামলা করেছেন, কিন্তু সফল হতে পারেননি। কুফা ও বসরা থেকে প্রচুর ফউজ চলে যাচ্ছে। পরশু এখান থেকে রওয়ানা হয়ে গেছে পাঁচশ সিপাহী। চেষ্টা করলে আপনি রাস্তায় তাদের সাথে মিলিত হতে পারবেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম নিঃসন্দেহে আপনার দোস্ত, কিন্তু কুতায়বা বিন মুসলিমের মত বাহাদুর সিপাহসালারের গুণগ্রহিতাও মশহুর হয়েছেন সর্বত্র। তিনি কদর করবেন আপনাকে। আমি তার কাছে চিঠি লিখে দিচ্ছি।'

নয়ীম বেপরোয়া হয়ে জওয়াব দিলেন, কেউ আমার কদর করবে, সেজন্য তো আমি জিহাদে আসিনি। আমার মকসুদ হচ্ছে খোদার হুকুম মেনে চলা। আমি আজই এখান থেকে রওয়ানা হচ্ছি। আপনি ইবনে সাদেকের খেয়াল রাখবেন। তার অস্তিত্বই দুনিয়ার জন্য বিপজ্জনক।

তা আমি জানি। তাকে খতম করবার আমি সবরকম চেষ্টাই করছি। দরবারে খিলাফত থেকে তার গ্রেফতারীর হুকুম জারী হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও আমরা পাইনি তার সন্ধান। তার সম্পর্কে আপনিও হুঁশিয়ার থাকবেন। হতে পারে, সে হয়ত তুর্কিস্তানের দিকেই পালিয়ে গেছে।'

নয়ীম বসরা থেকে বিদায় নিলেন। যিন্দেগীর অগুনতি বিপদের ঝড় বয়ে গেছে তার উপর দিয়ে, কিন্তু মুজাহিদের ঘোড়ার গতি আর শাহাদতের আকাংখা আজও রয়েছে অব্যাহত।

নয়

মুহম্মদ বিন কাসিম সিন্ধুর উপর হামলা করবার কিছু আগে কুতায়বা বিন মুসলিম বাহেনী জৈহুন নদী পার হয়ে তুর্কীস্তানের কয়েকটি রাজ্যের উপর হামলা করেন এবং কয়েকটি বিজয়ের পর কতকটা ফউজ ও রসদের অভাবে এবং কতকটা শীতের আতিশয্যে ফিরে আসেন মরভে। গরমের মওসুম এলে তিনি আবার ছোটখাটো ফউজ নিয়ে পার হয়ে যান জৈহুন নদী এবং জয় করেন আরো কয়েকটি এলাকা।

কুতায়বা বিন মুসলিম প্রতি বছর গরমের মওসুমে জয় করে নিতেন তুর্কিস্তানের কোনো কোনো অংশ এবং শীতের মওসুমে ফিরে আসতেন মরভে। হিজরী ৮৭ সালে তিনি বিকন্দ নামে তুর্কিস্তানের এক মশহুর শহরের উপর হামলা করলেন। হাজার হাজার তুর্কিস্তানী এসে জমা হলো শহর হেফাযত করতে। ফউজ ও রসদের অভাব সত্ত্বেও কুতায়বা আত্মবিশ্বাস ও সহিষ্ণুতা সহকারে শহর অবরোধ রাখলেন অব্যাহত। দুমাস পর শহরবাসীদের উদ্যম আর রইলো না। শেষ পর্যন্ত তারা হাতিয়ার সমর্পণ করলো।

বিকন্দ জয়ের পর কুতায়বা রীতিমতো তুর্কিস্তান জয়ের জন্য হামলা চালিয়ে যেতে লাগলেন। হিজরী ৮৮ সালে সুনয়েদের এক শক্তিশালী ফউজের সাথে হলো এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। এই যুদ্ধে জয়লাভ করে কুতায়বা তুর্কিস্তানের আরও কয়েকটি রাজ্য জয় করে এসে পৌছলেন বোখারার চার দেয়াল পর্যন্ত। শীতের মওসুমে সামরিক সরঞ্জামহীন ফউজ বেশী সময় অবরোধ চালিয়ে যেতে পারলো না। কুতায়বা সেখান থেকে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরলেন, কিন্তু হিম্মৎ হারালেন না। কয়েক মাস পরেই তিনি আবার বোখারা অবরোধ করলেন। এই অবরোধ চলবার সময়ে নয়ীম এসে কুতায়বার সাথে যোগ দিয়েছেন বসরার পাঁচশ সওয়ার সাথে নিয়ে। কয়েক দিনেই তিনি হয়েছেন বাহাদুর ও সমরকুশলী সিপাহসালারের অন্তরংগ বন্ধু। বোখারা অবরোধের মাঝখানে কুতায়বার সামনে এলো কঠিন বিপদ।

কেন্দ্র থেকে দূরে এসে পড়াই ছিলো তার অসুবিধার বড় কারণ। এখানে প্রয়োজনের সময়ে ফউজ ও রসদ-সাহায্য ঠিক সময় মতো পৌছা সহজ ছিলো না মোটেই। বোখারার বাদশার সাহায্যের জন্য এসে সমবেত হলো তুর্ক ও অন্যান্য দলের বেসুমার ফউজ। মুসলমান শহরের পাঁচিলের উপর মিনজানিকের সাহায্যে পাথর ছুঁড়ছিলো এবং শেষ হামলার জন্য তারা তৈরী হয়েছিলো। ইতিমধ্যে পেছন থেকে তুর্কদের এক শক্তিশালী ফউজ এসে দেখা দেলো। মুসলিম বাহিনী শহরের খেয়াল ছেড়ে দিয়ে পেছন থেকে আগত ফউজের দিকে মনোযোগ দিলো, কিন্তু তারা মযবুত

হয়ে দাঁড়াবার আগেই শহরের বাসিন্দারা বেরিয়ে এসে হামলা করলো তাদের উপর। মুসলিম বাহিনী উভয় ফউজের হামলার নাগালের মধ্যে এসে পড়লো। একদিক দিয়ে বাইরের হামলা মাথার উপর এসে গেছে, অপরদিকে শহরের ফউজ করছে তীরবর্ষণ। মুসলিম বাহিনীর মধ্যে দেখা দিলো বিশৃংখলা। মুসলিম সিপাহীরা যখন পিছপা হচ্ছে, তখন আরব-নারীরা তাদেরকে বাধা দিয়ে তাদের ভিতরে সঞ্চার করলো নতুন উদ্দীপনা। মুসলমান আবার শুরু করলো জীবনপণ লড়াই, কিন্তু তাদের সৈন্যসংখ্যা নগণ্য। তুর্করা দু'দিক দিয়ে ফউজের মাঝখানে এসে মহিলাদের খিমায় পৌছে যাবার উপক্রম করছিলো। তখন আরব যোদ্ধারা আর একবার যিন্দাহ করে তুললো তাদের পূর্বপুরুষের শৌর্যবীর্যের ঐতিহ্য। তারা উঠতে উঠতে পড়ছে, আবার পড়তে পড়তে উঠে যাচ্ছে, এমনি করে তারা নতুন করে জাগিয়ে তুলছে কাদসিয়া ও ইয়ারমুকের স্মৃতি। দুশমনে দুরন্ত ঝড়ের উপর জয়ী হবার জন্য কুতায়বা মনে মনে স্থির করলেন এক কৌশল। ফউজের কতক অংশ সরিয়ে নিয়ে অপর দিক দিয়ে শহরে প্রবেশ করতে হবে, অথচ মাঝখানে রয়েছে এক গভীর নদী। শহর হেফাযতের জন্য তা করছে খন্দকের কায। কুতায়বা যখন এই কৌশল চিন্তা করছেন তখন নয়ীম ঘোড়া ছুটিয়ে এলেন তার কাছে। তিনিও একই পরামর্শ দিলেন।

কুতায়বা বললেন, আমিও এই কৌশলই চিন্তা করছিলাম, কিন্তু কে এ কোরবাণীর জন্য তৈরী হবে?'

'আমি যাচ্ছি।' নয়ীম বললেন, 'আমায় কিছু সিপাহী দিন।'

কুতায়বা হাত প্রসারিত করে বললেন, এমন যোদ্ধা কে আছে, যে এই নওজোয়ানের সাথে যেতে রাযী?

প্রশ্ন শুনে ওয়াকি ও হারিম নামে দু'জন তমিমী সরদার হাত প্রসারিত করে দিয়ে সম্মতি জানালো। তাদের সাথে শামিল হলো তাদের জামায়াতের আটশ যোদ্ধা। নয়ীম সেই জীবনপণ যোদ্ধাদের সাথে নিয়ে বিপক্ষ সেনাবাহিনীর সারি ভেদ করে বেরিয়ে গেলেন ময়দানের বাইরে। তারপর একটা লম্বা পথ ঘুরে গিয়ে পৌছলেন তারা শহরের উত্তর-পশ্চিম কোণের দিকে। তার ডানে-বায়ে ছিল তমিমী সওয়ারের দল। শহরের পাঁচিল ও তাদের মাঝখানে খন্দকের মত এক নদী। নয়ীম আর তার সাথী তমিমী সরদার নদীর কিনারে দাঁড়ালেন মুহূর্তকালের জন্য। নদীর প্রস্থ ও গভীরতা আন্দাজ করে নিয়ে ঘোড়া থেকে নেবে আল্লাহু আকবর ধ্বনি করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন নদীর পানিতে। পাঁচিলের ভিতর দিকে ছিল এক বিরাট গাছ। তার একটা শাখা পাঁচিলের উপর দিয়ে ঝুঁকে পড়েছিল নদীর দিকে। নয়ীম সাঁতার কেটে অপর কিনারায় গিয়ে সেই শাখায় ফাঁস ফেলে গাছ বেয়ে গেলেন পাঁচিলের উপর এবং সেখান থেকে রজ্জুর সিঁড়ি ছুঁড়ে দিলেন সাথীদের দিকে। ওয়াকি ও হারিম সেই সিঁড়ি বেয়ে পাঁচিলে উঠে ছুঁড়ে দিলো আরও কয়েকটি সিঁড়ি। এমনি করে নদীর অপর কিনার দিয়ে মুজাহিদ বাহিনী পালা করে উঠতে লাগলো পাঁচিলের উপর। একশ যোদ্ধা এমনি করে পাঁচিলের উপর উঠে গেলো। সহসা অপ্রত্যাশিতভাবে নয়ীমের নযরে পড়লো যে, প্রায় পাঁচশ সিপাহীর

একটি দল এগিয়ে আসছে। নয়ীম পঞ্চাশজন সিপাহী সেখানে রেখে বাকী পঞ্চাশজনকে নিয়ে শহরের দিকে নেবে গেলেন এবং এক প্রশস্ত বাজারের মধ্যে পৌঁছে তাদের মোকাবিলা করতে দাঁড়িয়ে গেলেন। কিছুক্ষণের জন্য তারা তাদেরকে বিব্রতকর রাখলেন। এরই মধ্যে তামাম মুসলিম ফউজ পাঁচিল পার হয়ে শহরে ঢুকে গেছে। তখন আর তুর্ক সিপাহীদের হাতিয়ার সমর্পণ ছাড়া আর কোনো উপায় রইল না। নয়ীম তার কতক সাথীকে শহরের সর্বত্র ইসলামী ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিতে বলে তিনি বাকী সিপাহীদের সাথে নিয়ে গেলেন। শহরের তামাম দরযা দখল করে নেবার হুকুম দিলেন। শহরের বড়ো দরযার দিকে, সেখানে কয়েকজন পাহারাদারকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিয়ে খন্দকের পুল উপরে তুলে দিলেন।

শহর মুসলমানদের দখলে চলে গেছে, সে খবর তুর্ক সেনাবাহিনীর জানা ছিলো না। তাই তারা বিজয়ের আশা নিয়ে জীবন-পণ লড়াই করে যাচ্ছিলো। নয়ীম মুসলিম মুজাহিদদের হুকুম দিলেন পাঁচিলের উপরে উঠে তুর্কদের উপর তীরবর্ষণ করতে। শহরের দিক থেকে তীরবর্ষণ তুর্কদের মনে হতাশা সৃষ্টি করলো। পিছনে ফিরে তাদের নযরে পড়লো শহরে মুসলমান তীরন্দায ও উড্ডীয়মান ইসলামী ঝাণ্ডা।

ওদিকে কুতায়বা এ দৃশ্য দেখে কঠিন হামলার হুকুম দিলেন। খানিক্ষণ আগে মুসলমানদের যে অবস্থা ছিলো, এখন তুর্কদের অবস্থা ঠিক তেমনি। পরাজয়ের সময়ে শহরে মযবুত দেওয়ালের ভিতরে আশ্রয় ভরসা ছিলো তাদের, কিন্তু সেদিকেও তখন মৃত্যুর ভয়ানক রূপ পড়ছে তাদের নযরে। যারা এগিয়ে গেছে সামনের দিকে, তারা দাঁড়িয়ে আছে মুসলমানদের প্রস্তর বিদীর্ণকারী তলোয়ারের মুখোমুখি। যারা পিছন দিকে হটছে, তারা ভয় করছে ভয়াবহ তীরবর্ষণের। জান বাঁচাবার জন্য তারা ছুটতে লাগলো ডানে-বাঁয়ে এবং দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে অগুণতি সৈনিক গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো খন্দকের মধ্যে।

এ মুসীবত শেষ করে দিয়ে মুসলিম বাহিনী মনোযোগ দিলো পিছন থেকে হামলাকারী ফউজের দিকে। প্রথমেই তারা শহর মুসলমানদের দখলে দেখে হিম্মৎ হারিয়ে ফেলেছে। মুসলমানদের হামলার তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে বেশির ভাগ পালালো ময়দান ছেড়ে এবং আরও অনেকে হাতিয়ার সমর্পণ করে দিলো।

কুতায়বা বিন মুসলিম ময়দান খালি দেখে এগিয়ে গেলেন। শহরের দরযায় পৌঁছে তিনি ঘোড়া থেকে নামলেন এবং আল্লার উদ্দেশ্যে সিজদায় অবনমিত হলেন। নয়ীম ভিতর থেকে খন্দকের পুল পেতে দেবার হুকুম দিলেন এবং ওয়াকি ও হাযীমকে সাথে নিয়ে এগিয়ে এলেন বাহাদুর সিপাহসালারের অভ্যর্থনার জন্য। কুতায়বা বিন মুসলিমের সাথে সাথে নয়ীমের নামও হয়ে উঠলো আলোচনার বিষয়বস্তু। তার দীলের পুরানো যখম ধীরে ধীরে মিটে গেলো। তার উচ্চ চিন্তাধারা বিজয়ী হলো স্বাভাবিক কামনার উপর। তখন তলোয়ারের ঝংকার তার কাছে প্রেমের কমনীয় সুর ঝংকারের চাইতেও মুগ্ধকর। ভাই ও উযরার খুশী তার কাছে নিজের খুশীর চাইতেও প্রিয়তর হয়ে দেখা দিলো। তার অন্তরের দো'আ তখন বেশী করে তাদেরই জন্য উৎসারিত হতে লাগলো।

কোন অবসর মুহূর্তে তিনি যখন খানিকটা চিন্তা করার সুযোগ পান তখনই তার মনে খেয়াল জাগে, হয়তো ভাই উযরাকে বলে দিয়েছেন যে আমি যিন্দাহ রয়েছি। হয়তো এখন তারা আমার সম্পর্কে আলাপ করছেন। উযরার মনে হয়তো সত্যি সত্যি প্রত্যয় জন্মেছে যে, আমি আর কোন নারীকে অন্তরে স্থান দিয়েছি। দীল দিয়ে সে হয়তো আমায় ঘৃণা করছে। হয়তো সে আমায় ভুলেই গেছে। হাঁ, আমায় ভুলে যাওয়াই ভালো তার পক্ষে।

আন্তরিক দো'আর সাথে শেষ হয় এ সব চিন্তার।

তিন বছর এমনি করে কেটে গেলো। কুতায়বার সেনাবাহিনী বিজয় ও সৌভাগ্যের ধ্বজা উড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে তুর্কিস্তানের চারদিকে। নয়ীম হয়েছেন অসাধারণ খ্যাতির অধিকারী। দরবারে খিলাফতে এক চিঠি লিখে কুতায়বা নয়ীমের সম্পর্কে জানিয়েছেন, এই নওজোয়ানের বিজয়ে আমি নিজের বিজয়ের চাইতেও বেশী গৌরব বোধ করছি।'

হিজরী ৯১ সনে তুর্কিস্তানের অনেকগুলো রাজ্যে ধূমায়িত হয়ে উঠলো বিদ্রোহের লেলিহান অগ্নিশিখা। এই আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে দূর থেকে তামাশা দেখছিলো সেই ইবনে সাদেক। নয়ীম মুক্তি পেয়ে যাবার পর প্রাণের ভয় হয়ে উঠেছে ইবনে সাদেকের নিত্যসহচর। সে পালিয়ে এসেছে কেল্লা ছেড়ে। পথে বদনসীব ভাতিজীর সাথে দেখা হলে সে দুর্বৃত্ত চাচার হাতে কয়েদ হবার চাইতে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

জানের ভয় ইবনে সাদেককে পেয়ে বসেছে। সে তার অনুচরদের সাথে নিয়ে চললো তুর্কিস্তানের দিকে। সেখানে পৌঁছে সে তার বিচ্ছিন্ন দলকে সংহত করতে শুরু করলো এবং কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করে তুর্কিস্তানের পরাজিত শাহযাদাদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করে এক চূড়ান্ত লড়াইয়ের প্রস্তুতি চালাতে লাগলো।

তুর্কিস্তানের গণ্যমান্য লোকদের মধ্যে একজন ছিলো নাযযাক। ইবনে সাদেক তার সাথে দেখা করে প্রকাশ করলো তার ধারণা। আগে থেকেই নাযযাক বিদ্রোহ ছড়াবার চেষ্টায় লিপ্ত ছিলো। তার প্রয়োজন ছিলো ইবনে সাদেকের মত মন্ত্রণাদাতার। স্বভাবের দিক দিয়ে দু'জন ছিলো অভিন্ন। নাযযাক চাইতো তুর্কিস্তানের বাদশাহ হতে, আর ইবনে সাদেকের আকাংখা ছিলো শুধু তুর্কিস্তানের নয়, বরং তামাম ইসলামী দুনিয়ায় তার নামের খ্যাতি ছড়িয়ে দেওয়া। নাযযাক ওয়াদা করলো যে, তুর্কিস্তানের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারলে সে ইবনে সাদেককে বানাবে তার উযিরে আযম। ইবনে সাদেক তাকে দিলো সাফল্যের আশ্বাস।

তুর্কিস্তানের লোকদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠতো কুতায়বার নামে। বিদ্রোহের কথা শুনলে তারা ঘাবড়ে যেতো, কিন্তু ইবনে সাদেকের দুষ্ট পরামর্শ তাদের কাছে নিস্ফল হলো না। যার কাছেই সে যায়, তাকে বলে, তোমাদের রাজ্য তোমাদেরই জন্য। অপর কারুর কোনো অধিকার নেই তার উপর। আকলমন্দ লোক অপরের হুকুমাত মেনে নিতে

পারে না। ইবনে সাদেক ও নাযযাকের চেষ্টায় তুর্কিস্তানের বহুসংখ্যক বিশিষ্ট শাহযাদা ও সরদার এসে জমা হলো এক পুরানো কেল্লায়। এই জনসমাবেশে নাযযাক এক লম্বা চওড়া বক্তৃতা করলো। নাযযাকের বক্তৃতার পর চললো দীর্ঘ বিতর্ক। কয়েকজন বৃদ্ধ সরদার মুসলমানদের শান্তিপূর্ণ হুকুমাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা তোলার বিরোধিতা করলেন। অবস্থা নাযুক দেখে ইবনে সাদেক কি যেন বললো নাযযাকের কানে।

নাযযাক তার জায়গা ছেড়ে উঠে বললো, দেশপ্রেমিক জনগণ! আমায় আফসোসের সাথে বলতে হচ্ছে, পূর্বপুরুষের খুন আর আপনাদের মধ্যে অবশিষ্ট নেই। এখন আপনাদের কাছে কিছু বলতে চান আমাদের এক সম্মানিত মেহমান। আপনারা গোলাম বলেই আপনাদের প্রতি তার হামদর্দী। নাযযাক কথাটি বলেই বসে পড়লো। ইবনে সাদেক উঠে বক্তৃতা শুরু করলো। মুসলমানদের খেলাপ যতটা বিদ্বেষ প্রচার তার সাধ্যায়ত্ত, তার সবই সে করলো। তারপর সে বললো, শাসক কওম গোড়ার দিকে শাসিত কওমকে গাফলতের ঘুম পাড়াবার জন্য কঠোর রূপ নিয়ে দেখা দেয় না, কিন্তু শাসিত কওম যখন আরামের যিন্দেগীতে অভ্যস্ত হয়, বাহাদুরীর ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়, তখন শাসকরা তাদের কর্মনীতি পরিবর্তন করে ফেলে। ইবনে সাদেক তুর্ক সরদারদের প্রভাবিত হতে দেখে আরও জোর আওয়াযে বললো, মুসলমানদের বর্তমান নরম নীতি দেখে মনে করবেন না যে, তারা হামেশা এমনি থাকবে। শিগগীরই তারা আপনাদের উপর এমন যালেমের রূপ নিয়ে দেখা দেবে যা আপনারা কল্পনাও করতে পারেন না। আপনারা শুনে হয়রান হবেন যে, কিছুকাল আগে আমিও ছিলাম মুসলমান, কিন্তু আধিপত্য লোভী এই কওম সারা দুনিয়ার আযাদ কওমকে গোলাম বানাবার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে দেখে আমি তাদের কওম থেকে আলাদা হয়ে গেছি। আপনারা তাদেরকে আমার চাইতে ভাল করে জানেন না। এরা চায় দৌলত আর শিগরীই দেখবেন যে, তারা এ মুলুকে একটি কানাকড়িও অবশিষ্ট রাখবে না। আর যদি তা না-ও হয়, তাহলে আপনাদের স্ত্রী-কন্যাকে দেখবেন শাম ও আরবের বাজারে বিক্রি হতে। ইবনে সাদেকের কথায় প্রভাবিত হয়ে তামাম সরদার পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগলো।

এক বৃদ্ধ সরদার উঠে বললেন, তোমাদের কথায় অনিষ্টের আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। আমরা নিজেরাও বেশক মুসলমানদের গোলামীকে খারাপ জানি, কিন্তু দুশমনের সম্পর্কেও মিথ্যা কথায় একিন আনা আমাদের জন্য ঠিক হবে না। মুসলমান শাসিত কওমের ইযযত ও দৌলত হেফাযত করে না, এ এক কল্পিত কাহিনী মাত্র। ইরানে গিয়ে আমি স্বচক্ষে দেখেছি, সেখানকার লোক নিজেদের হুকুমতের চাইতেও বেশি খুশী রয়েছে মুসলমানদের হুকুমাতে। দেশপ্রেমিক জনগণ! নাযযাক ও এই লোকটির কথায় বিভ্রান্ত হয়ে লোহার পাহাড়ের সাথে সংঘর্ষ লাগানোর চেষ্টা করা সংগত হবে না আমাদের পক্ষে। এই নতুন লড়াইয়ে জয়লাভের বিন্দুমাত্র উম্মীদ যদি আমি দেখতে পেতাম, তাহলে সবার আগে আমি নিজেই হাতে নিতাম বিদ্রোহের ঝাণ্ডা। কিন্তু, আমি জানি আমাদের বাহাদুরী সত্ত্বেও এ কওমের মোকাবিলা করতে আমরা পারবো না। রুম ও ইরানের মতো প্রবল শক্তি যাদের সামনে মস্তক অবনত করেছে, যে কওমের সামনে দরিয়া ও সমুদ্র সংকুচিত হয়ে যায়, আকাশচুম্বী পর্বত যাদের কাছে শির অবনত করে, তাদের উপর বিজয় হাসিল করবার কল্পনাও মনে এনো না তোমরা। আমি মুসলমানদের পক্ষে ওকালতি করছি না। কিন্তু একথা আমায় বলতেই হবে যে, আমাদের অবশিষ্ট শক্তিটুকু লোপ হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না এ বিদ্রোহের পরিণাম। এর ফলে হাজারো বাচ্চা হবে এতীম আর হাজারো নারী হবে বিধবা। কওমের গলায় ছুরি চালিয়ে নাযযাক চায় নিজের সুখ্যাতি। আর এ লোকটি কে আর কি তার মকসুদ, তা আমার জানা নেই।'

ইবনে সাদেক এ আপত্তির জওয়াব আগেই চিন্তা করে রেখেছে। সে আর একবার শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে বক্তৃতা শুরু করলো। বৃদ্ধ সরদারের মোকাবিলায় তার দুষ্ট বুদ্ধি অনেক বেশি। তাছাড়া অভিনয় সে জানে। মুখের উপর এক কৃত্রিম হাসি টেনে এনে সে আপত্তির জওয়াব দিতে লাগলো। তার যুক্তির সামনে বুড়ো সরদারের কথাগুলো লোকের মনে হলো অবাস্তব। বড় বড় সরদার তার যাদুতে ভুললো এবং আযাদী ও বিদ্রোহের আওয়ায তুলে শেষ হলো জলসা।

রাতের বেলা কুতায়বা বিন মুসলিমের খিমায় জ্বলছে কয়েকটি মোমবাতি এবং এক কোণে জ্বলছে আগুনের কুণ্ড। কুতায়বা শুকনো ঘাসের গালিচায় বসে একটি নকশা দেখছেন। তাঁর মুখের উপর গভীর উদ্বেগের চিহ্ন সুপরিস্ফুট। নকশা ভাঁজ করে এক পাশে রেখে তিনি উঠে খানিকক্ষণ পায়চারী করে গিয়ে দাঁড়ালেন খিমার দরযায় এবং দূরে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন বরফপাতের দৃশ্য। অনতিকাল মধ্যে গাছের পেছন থেকে এক সওয়ার এসে হাযির হলেন। কুতায়বা তাকে চিনতে পেরে এগিয়ে গেলেন কয়েক কদম আগে। কুতায়বাকে দেখে সওয়ার ঘোড়া থেকে নামলেন। এক পাহারাদার এসে ধরলো ঘোড়ার বাগ।

'কি খবর নিয়ে এলে, নয়ীম?' কুতায়বা প্রশ্ন করলেন।

'নাযযাক এক লাখের বেশী ফউজ সংগ্রহ করেছে। আমাদের শিগগিরই তৈরী হওয়া দরকার।'

কুতায়বা ও নয়ীম কথা বলতে বলতে খিমার ভিতরে দাখিল হলেন। নয়ীম নকশা তুলে কুতায়বাকে দেখাতে দেখাতে বললেন, 'এই যে দেখুন! বলখ থেকে প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ উত্তর-পূর্বে নাযযাক তার ফউজ একত্র করছে। এই জায়গাটির দক্ষিণ দরিয়া আর বাকী তিন দিকে পাহাড় ও নিবিড় বন। বরফপাতের দরুন এ পথ অতি দুর্গম। কিন্তু গরমের দিনের প্রতীক্ষা করা আমাদের ঠিক হবে না। তুর্কদের উদ্যম উৎসাহ দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। মুসলমানদের তারা হত্যা করে চলেছে নির্মম-নিষ্ঠুরভাবে। সমরকন্দেও রয়েছে বিদ্রোহের সম্ভাবনা।'

কুতায়বা বললেন, 'ইরান থেকে যে ফউজ আসবে, তাদের জন্য ইনতেযার করতে হবে আমাদের। তারা পৌছে গেলেই আমরা হামলা করবো।'

কুতায়বা ও নয়ীমের আলাপের মধ্যে এক সিপাহী খিমায় এসে বললো, 'এক তুর্ক সরদার আপনার মোলাকাতপ্রার্থী।'

'তাকে নিয়ে এস।' কুতায়বা বললেন।

সিপাহী চলে যাবার খানিকক্ষণ পরেই এক বৃদ্ধ সরদার খিমায় দাখিল হলেন। তিনি ছিলেন পুস্তিন ও সামুরের টুপি পরিহিত। তিনি ঝুঁকে পড়ে কুতায়বাকে সালাম করে বললেন, 'সম্ভবতঃ আপনি আমায় চিনতে পারছেন। আমার নাম নিযক।'

'আমি আপনাকে ভাল করেই চিনি। বসুন।'

নিযক কুতায়বার সামনে বসে পড়লেন। কুতায়বা তার আগমনের কারণ জানতে চাইলেন।

নিযক বললেন, 'আমি আপনাকে বলতে এসেছি, আপনি আমাদের কওমের উপর কঠোর হবেন না।'

'কঠোর!' কুতায়বা ভ্রুকুঞ্চিত করে বললেন, 'বিদ্রোহীদের সাথে যে আচরণ করা হয়, তাই করা হবে তাদের সাথে। তারা মুসলিম শিশু ও নারীর রক্তপাত করতেও দ্বিধা করছে না।'

'কিন্তু ওরা বিদ্রোহী নয়। নিযক গাম্ভীর্যের সাথে জওয়াব দিলেন, 'ওরা বেঅকুফ। এ বিদ্রোহের পূর্ণ যিম্মাদারী আপনাদেরই এক মুসলমান ভাইয়ের।'

'আমাদের ভাই? কে সে?'

'ইবনে সাদেক।' নিযক জওয়াব দিলেন।

নয়ীম এতক্ষণ মোমবাতির আলোয় বসে নকশা দেখছিলেন। ইবনে সাদেকের নাম শুনে তিনি চমকে উঠলেন। 'ইবনে সাদেক!' তিনি নিযকের দিকে তাকিয়ে বললেন।

'হাঁ, ইবনে সাদেক।'

'সে লোকটি কে?' কুতায়বা প্রশ্ন করলেন।

নিযক জয়াবে বললেন, 'সে তুর্কিস্তানে এসেছে দু'বছর আগে এবং তার কথার যাদুতে তুর্কিস্তানের সকল গণ্যমান্য লোককে আপনাদের হুকুমাতের খেলাফ বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করেছে। এর বেশি তার সম্পর্কে আমি কিছু জানি না।'

'আমি তার সম্পর্কে অনেক কিছুই জানি।' নয়ীম নকশা ভাঁজ করতে করতে বললেন, 'আজকাল কি সে তবে নাযযাকের সাথে রয়েছে?'

'না, সে কোকন্দের কাছে ওজওয়ার নামক স্থানে পাহাড়ী লোকদের জমা করে নাযযাকের জন্য এক ফউজ তৈরি করছে। সম্ভবত সে হুকুমাতে চীনের সাহায্য হাসিল করবারও চেষ্টা করবে।'

নয়ীম কুতায়বার উদ্দেশ্যে বললেন, 'আমি বহুদিন ধরে এই লোকটিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। সে যে আমার এত কাছে, তা আমি জানতাম না। আপনি আমায় এজাযত দিন। ওকে অবিলম্বে গ্রেফতার করে আনা নেহায়েত জরুরী।'

'কিন্তু লোকটি কে তাওতো জানতে হবে আমায়।'

'সে আবুজেহেলের চাইতে বড় ইসলামের দু'শমন, আবদুল্লাহ বিন উবাইর চাইতে বড় মোনাফেক, সাপের চাইতে বেশী ভয়ানক আর শিয়ালের চাইতেও বেশী ধূর্ত। তার তুর্কিস্তানে থাকায় প্রতি মুহূর্তে বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। ওর দিকে আমাদেরকে অবিলম্বে নজর দিতে হবে।'

'কিন্তু এই মওসুমে? কোকন্দের পথে রয়েছে বরফের পাহাড়।'

'তা' যাই থাক, আপনি আমায় এজাযত দিন। নয়ীম বললেন, 'কোকন্দে কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই মনে করে সে ওখানে রয়েছে। সম্ভবতঃ সে শীতের মওসুম ওখানে কাটিয়ে গরমের দিনে আর কোনও নিরাপদ জায়গা খুঁজে নেবে।'

'কবে যেতে চাও তুমি?'

'এই মুহূর্তে।' নয়ীম জওয়াব দিলেন, 'আমার একটি মুহূর্ত অপচয় করাও ঠিক হবে না।'

'এ সময়ে বরফপাত হচ্ছে। ভোরে চলে যাবে। এইমাত্র তুমি এক দীর্ঘ সফর থেকে ফিরে এলে। খানিকক্ষণ আরাম কর।'

'যতক্ষণ এ আপদ যিন্দাহ রয়েছে, ততক্ষণ আরামের অবকাশ নেই আমার। এখন একটি মুহূর্তের অপচয় আমি গুনাহ মনে করি। আমায় এজাযত দিন।'

কথাটি বলেই নয়ীম উঠে দাঁড়ালেন।

'আচ্ছা, দু'শ সিপাহী তোমার সাথে নিয়ে দাও।'

নিযক হয়রান হয়ে বললেন, 'আপনি একে কোকন্দে পাঠাচ্ছেন মাত্র দু'শ সিপাহী সাথে নিয়ে! পাহাড়ী লোকদের লড়াইর তরিকা আপনি জানেন? বাহাদুরীর দিক দিয়ে দুনিয়ার কোন কওমের চাইতে কম নয় তারা। ওর উতি বেশ বড় রকমের ফউজ নিয়ে যাওয়া। ইবনে সাদেকের কাছে সব সময় মওজুদ থাকে পাঁচশ সশস্ত্র নওজোয়ান। এখন পর্যন্ত কত ফউজ সে একত্র করেছে তাই বা কে জানে?

নয়ীম বললেন, 'এক বুযদীল সালার তার সিপাহীদের মধ্যে বাহাদুরীর ঐশ্বর্য পয়দা করতে পারে না। যদি সেই ফউজের সালার ইবনে সাদেক হয়ে থাকে তাহলে এত সিপাহীরও দরকার হবে না আমার।'

কুতায়বা মুহূর্তকাল চিন্তা করে নয়ীমকে তিনশ সিপাহী সাথে নিয়ে যাবার হুকুম দিলেন। তারপর তাকে কয়েকটি নির্দেশ দিয়ে বিদায় করে দিলেন।

এক মুহূর্ত পর কুতায়বা ও নিযক খিমার বাইরে দাঁড়িয়ে দেখলেন, নয়ীম এক ক্ষুদ্রাকার ফউজ নিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছেন সামনের এক পাহাড়ী পথ।

'বহুত বাহাদুর ছেলে।' নিযক কুতায়বাকে বললেন।

'হাঁ, ও এক মুজাহিদের বেটা। কুতায়বা জওয়াব দিলেন।

আপনারা কেন এত বাহাদুর, আমি জিজ্ঞেস করতে পারি?' নিযক আবার প্রশ্ন করলেন।

কেননা আমরা মওতকে ভয় করি না। মওত আমাদের কাছে নিয়ে আসে এক উচ্চতর যিন্দেগীর খোশখবর। আল্লার জন্য যিন্দাহ থাকবার আকাংখা ও আল্লারই পথে মৃত্যুবরণ করবার উদ্যম পয়দা করে নেবার পর কোন মানুষেরই মনে অন্যকোনো বড়ো শক্তির ভয় থাকতে পারে না।'

'আপনদের কওমের প্রত্যেক ব্যক্তিই কিএমনি বাহাদুর?'

'হাঁ, যারা তওহীদ ও রেসালাতের উপর সাক্ষ্য দীলে ঈমান আনে, তাদের প্রত্যেকেই এমনি।'

ইবনে সাদেক কোকন্দের উত্তরে একটি নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিয়ে দিন যাপন করছে। এক উপত্যকার চারদিকে উঁচু পাহাড় তার জন্য এক অপরাজেয় প্রাচীরের কাজ করছে। পাহাড়ী এলাকার দুর্দান্ত বাসিন্দারা ছোট ছোট দলে এসে জমা হচ্ছে সেই উপত্যকায়। ইবনে সাদেক এই লোকগুলোকে সোজা পথে কাটিয়ে দিচ্ছে নাযযাকের কাছে। তার গুপ্তচর তাকে এনে দেয় মুসলমানদের প্রতিনিধির খবর। মুসলমান শীতের মওসুম শেষ না হলে লড়াই শুরু করবে না। এই ধারণা নিয়ে আশ্বস্ত ছিলো ইবনে সাদেক। তার আরও বিশ্বাস ছিলো যে, প্রথমতঃ অতদূর থেকে মুসলমান তার চক্রান্তের খবর পাবে না। আর যদি খবর পেয়েও যায়, তথাপি শীতের দিনে এদিকে আসতে পারবে না। যদি শীতের পর তারা এ পথে আসেও তাহলে খোদার দুনিয়া বহু দূর বিস্তৃত।

একদিন এক গুপ্তচরের কাছ থেকে নয়ীমের অগ্রগতির খবর পেয়ে সে খুবই ঘাবড়ে গেল।

'তাঁর সাথে কত ফউজ রয়েছে?' ইবনে সাদেক খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে প্রশ্ন করলো।

'মাত্র তিনশ সিপাহী।' গুপ্তচর জওয়াব দিলো।

'কুল্লে তিনশ' লোক?' এক তাতারী নওজোয়ান অট্টহাস্য করে বললো।

ইবনে সাদেক বললো, তুমি হাসছ কেন? এই তিনশ ফউজ আমার চোখে চীন ও তুর্কিস্তানের তামাম ফউজের চাইতেও বেশি বিপজ্জনক।'

তাতারী বললো, আপনি একিন রাখবেন, ওরা এখানে পৌছাবার আগেই আমাদের পাথরের তলায় চাপা পড়ে থাকবে।'

নয়ীমের কল্পনা ইবনে সাদেকের কাছে মৃত্যুর চাইতেও ভয়ানক। তার কাছে সাতশর বেশী তাতারী মওজুদ রয়েছে, তথাপি তার মনে বিজয়ের একিন নেই। সে

জানে, খোলা ময়দানে মুসলমানদের মোকাবিলা করা খুবই বিপজ্জনক। সে তামাম পাহাড়ী রাস্তায় পাহাড়া বসিয়ে নয়ীমের ইনতেজার করতে লাগলো।

নয়ীম ইবনে সাদেকের সন্ধান করতে করতে গিয়ে বেরুলেন কোকন্দের উত্তর-পূর্ব দিকে। এখানকার অসমতল যমিনের উপর দিয়ে ঘোড়া এগুতে লাগলো অতি কষ্টে। উঁচু পাহাড়-চূড়ায় ঝলমল করছে জমাট বরফস্তূপ। নীচের উপত্যকাভূমির কোথাও কোথাও ঘন বন। কিন্তু বরফ পাতের মওসুমে বনের গাছপালা পত্রহীন। নয়ীম এক উঁচু পাহাড়ের পাশের সংকীর্ণ পথ দিয়ে যাচ্ছেন। অমনি আচানক পাহাড়ের উপর থেকে তাতারীরা শুরু করলো তীরবর্ষণ। কয়েকজন সওয়ার যখমী হয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গেলো এবং ফউজের মধ্যে দেখা দিল বিশৃংখলা। পাঁচটি ঘোড়া সওয়ার সমেত গিয়ে পড়লো এক গভীর খাদের মধ্যে। নয়ীম সিপাহীদের ঘোড়া থেকে নামবার হুকুম দিয়ে পঞ্চাশ জনকে পাহাড় থেকে খানিকটা দূরে একটা নিরাপদ জায়গায় ঘোড়াগুলো নিয়ে যেতে বললেন এবং বাকী আড়াইশ সিপাহী সাথে নিয়ে তিনি পায়দল এগিয়ে চললেন পাহাড়ের উপর। তখনো যথারীতি পাথরবর্ষণ চলছে। মুসলমানরা মাথার উপর ঢাল ধরে পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে উঠতে নয়ীমের ষাটজন সিপাহী পড়ে গেছে পাথরের আঘাত খেয়ে। নয়ীম তার বাকী লোকদের নিয়ে পাহাড় চূড়ায় মযবুত হয়ে দাঁড়িয়ে হামলা করলেন। মুসলমানদের অসাধারণ ধৈর্য দেখে তাতারীদের উৎসাহে ভাটা পড়লো। তারা চারদিক থেকে সরে এসে একত্র হতে লাগলো। ইবনে সাদেক মাঝখানে দাঁড়িয়ে উৎসাহ দিচ্ছে হামলা করতে। তার উপর নয়ীমের নযর পড়তেই তিনি জোশের আতিশয্যে আল্লাহু আকবর আওয়ায করে এক হাতে তলোয়ার আর অপর হাতে নেযাহ নিয়ে পথ সাফ করে এগিয়ে চললেন। তাতারীরা ক্রমাগত ময়দান ছেড়ে পালাতে লাগলো। ইবনে সাদেক তখন প্রাণের ভয়ে অস্থির। সে তার অবশিষ্ট ফউজকে ফেলে পালালো একদিকে। নয়ীমের চোখ তারই দিকে নিবদ্ধ। তাকে পালাতে দেখে নয়ীম তার পিছু ধাওয়া করলেন। ইবনে সাদেক পাহাড় থেকে নেবে গেলো নীচে। প্রয়োজনের সময়ে নিজের বাঁচবার বন্দোবস্ত সে আগেই করে রেখেছিলো। পাহাড়ের নীচে একটি লোক দাঁড়িয়েছিল দুটি ঘোড়া নিয়ে। ইবনে সাদেক ঝট করে এক ঘোড়ায় চেপে ছুটে চললো। তার সাথী কেবলমাত্র রেকাবে পা রেখেছে অমনি নয়ীম নেযাহ মেরে তাকে ফেলে দিল নীচে। তারপর ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ছুটে চললেন ইবনে সাদেকের পিছু পিছু।

নয়ীমের ধারণা মোতাবেক ইবনে সাদেক ছিলো শিয়ালের চাইতেও বেশী ধূর্ত। পরাজয় নিশ্চিত দেখলে কি করে নিজের জান বাঁচাতে হবে তার পুরো ইনতেযাম সে আগেই করে রেখেছে। নয়ীম আর ইবনে সাদেকের মাঝখানে দূরত্ব বড় বেশী নয়। কিন্তু কিছুক্ষণ তার অনুসরণ করার পর নয়ীম বুঝলেন যে, তাদের মাঝখানের দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছে ক্রমাগত, আর তার ঘোড়াও ইবনে সাদেকের ঘোড়ার তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম চলতে পারে। তবু নয়ীম তার পিছ ছাড়তে পারলেন না এবং তাকে চোখের আড়াল হতে দিলেন না।

ইবনে সাদেক পাহাড়ী পথ ছেড়ে উপত্যকার দিকে চললো। উপত্যকায় মাঝে মাঝে ঘন গাছপালা। এক জায়গায় ঘনসন্নিবিষ্ট গাছপালার নীচে ইবনে সাদেক কয়েকজন সিপাহী দাঁড় করিয়ে রেখেছে। সে ছুটে পালাতে পালাতে তাদেরকে ইশারা করলো, অমনি তারা গা ঢাকা দিলো গাছের আড়ালে। নয়ীম যখন সেই গাছের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন তখন এক তীর এসে লাগলো তার বাযুতে, কিন্তু তিনি ঘোড়ার গতিবেগ হ্রাস করলেন না। খানিকক্ষণ পর আর একটি তীর লাগলো তার পিছন দিকে। তারপর আর একটি তীর এসে ঘোড়ার পিঠে পড়তেই ঘোড়া ছুটে চললো আরও দ্রুতগতিতে। নয়ীম তার বাযু ও পিছন দিক থেকে তীর টেনে বের করলেন কিন্তু ইবনে সাদেকের পিছু ছাড়লেন না। আরও কিছুদূর চলবার পর একটি তীর এসে লাগলো নয়ীমের কোমরে। আগেই প্রচুর রক্তপাত হয়েছে তার দেহ থেকে। তৃতীয় তীর লাগবার পর তার দেহের শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসতে লাগলো, কিন্তু যতক্ষণ জ্ঞান থাকল, ততক্ষণ মুজাহিদের হিম্মৎ থাকলো অটুট। ততক্ষণ তিনি ঘোড়ার গতিবেগ কম হতে দিলেন না। গাছের সারি শেষ হয়ে গেল, এবার দেখা দিল প্রশস্ত ময়দান। ইবনে সাদেক অনেকখানি আগে চলে গেছে, কমযোরী নয়ীমের উপর জয়ী হচ্ছে। তার চোখে নেমে আসছে নিবিড় অন্ধকার। তার মাথা ঘুরছে, কানের ভিতরে শাঁ শাঁ করছে। নিরুপায় হয়ে ঘোড়া থেকে নামতেই তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়লেন যমিনের উপর উপুড় হয়ে। বেহুঁশ অবস্থায় তার কয়েক মুহূর্ত কাটলো। যখন কিছুটা হুঁশ ফিরে এল, তখন তার কানে ভেসে এলো কারুর দূরাগত সংগীতের আওয়ায। বহুদিন এমন মধুর আওয়ায নয়ীমের কানে আসেনি। বহুক্ষণ নয়ীম অজ্ঞানের মত পড়ে শুনলেন সে সুরঝংকার। অবশেষে তিনি হিম্মৎ করে মাথা তুললেন। তার কাছেই চরে বেড়াচ্ছে কয়েকটি ভেড়া। যে গান গাইছে তাকে দেখতে চান নয়ীম, কিন্তু দুর্বলতার দরুন আবার তার চোখের সামনে নামলো অন্ধকারের পরদা এবং তিনি নিরুপায় হয়ে মাথা রাখলেন যমিনের উপর। একটি ভেড়া নয়ীমের কাছে এলো এবং নয়ীমের কানের কাছে মুখ নিয়ে তার দেহের ঘ্রাণ নিতে লাগলো। তারপর তার নিজের ভাষায় আওয়ায দিয়ে ডাকলো আর একটি ভেড়াকে। দ্বিতীয় ভেড়াটিও তেমনি আওয়ায করে বাকী ভেড়াগুলোকে খবর দিয়ে এগিয়ে এলো। কিছুক্ষণের মধ্যে অনেকগুলো ভেড়া নয়ীমের আশেপাশে জমা হয়ে কোলাহল শুরু করলো। এক তুর্কিস্তানী তরুণী ছড়ি হাতে ভেড়ার ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাগুলোকে তাড়িয়ে যথারীতি গান গেয়ে চলেছে। একই জায়গায় এতগুলো ভেড়ার সমাবেশ দেখে সে এগিয়ে এলো। ভেড়াগুলোর মাঝখানে নয়ীমকে রক্তাক্ত পড়ে থাকতে দেখে সে চীৎকার করে উঠলো। তারপর কয়েক কদম দূরে দাঁড়িয়ে আঙুল কামড়াতে লাগলো হতবুদ্ধির মতো।

নয়ীম বেহুঁশ অবস্থার মধ্যে একবার মাথা তুলে দেখলেন, তার সামনে দাঁড়িয়ে তারই দিকে তাকিয়ে রয়েছে প্রকৃতির সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি এক পাহাড়ী যুবতীর রূপ নিয়ে। দীর্ঘ আকৃতির সাথে দৈহিক স্বাস্থ্য, নিখুঁত অঙ্গপ্রত্যংগ মিলিত হয়ে তার নিষ্পাপ সৌন্দর্যকে যেনো আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। তার মোটা অমসৃণ কাপড়ের তৈরী লেবাস তার স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে ম্লান করেনি। সামুরের একটা টুকরা তার গর্দানে জড়ানো। মাথায় টুপি। সুন্দরী তরুণীর মুখ খানিকটা লম্বা এবং তাতে তার মুখখানাকে যেন গম্ভীর করে দিয়েছে। বড় বড় কালো উজ্জ্বল চোখ, নওবাহারের ফুলের চাইতেও মুগ্ধকর পাতলা নাযুক ঠোঁট, প্রশস্ত ললাট ও মযবুত চিবুক—সবকিছু মিলে তাকে করে তুলেছে অপরূপ। নয়ীম একবার তার দিকে তাকিয়ে দেখলেন উযরার রূপ, আর একবার দেখলেন জোলায়খার প্রতিচ্ছবি। যুবতী নয়ীমের দেহে রক্তের দাগ দেখে খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকার পর সাহস করে কাছে এগিয়ে বললো, আপনি কি যখমী?

নয়ীম তুর্কিস্তানে থেকে তাতারী জবানের যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করেছেন। সুন্দরী তরুণীর প্রশ্নের জওয়াব না দিয়ে তিনি উঠে বসতে চাইলেন, কিন্তু পারলেন না, মাথা ঘুরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে রইলেন।

দশ

নয়ীম আবার জ্ঞান ফিরে পেলেন, তখন তিনি রয়েছেন খোলা ময়দানের পরিবর্তে এক পাথরের ঘরে। তাঁর আশেপাশে কয়েকটি পুরুষ ও নারী। যে সুন্দরী যুবতীর অস্পষ্ট ছবি তখনো নয়ীমের মগজে রয়ে গেছে, সে এক হাতে দুধের পেয়ালা নিয়ে অপর হাত নয়ীমের মাথার নীচে দিয়ে তাকে উপরে তুলবার চেষ্টা করছে। নয়ীম খানিকটা ইতস্তত করে মুখ লাগালেন পিয়ালায়। কিছুটা দুধ পান করার পর তিনি হাত দিয়ে ইশারা করলে যুবতী তাকে আবার বিছানায় শুইয়ে দিলো। তারপর বিছানার একপাশে সরে বসলো সে। কমযোরীর দরুন নয়ীম কখনো চোখ মুদে থাকেন, আবার কখনো অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখেন তরুণী ও আর সবার দিকে। এক নওজোয়ান এসে দাঁড়ালো ঘরের দরযায়। তার এক হাতে নেযাহ, অপর হাতে ধনুক।

তরুণী তার দিকে তাকিয়ে বললো, ভেড়াগুলোকে এনেছ?'

'হাঁ, এনেছি, আর এখই আমি যাচ্ছি।'

'কোথায়?' তরুণী প্রশ্ন করলো।

'শিকার খেলতে যাচ্ছি। একটা জায়গায় আমি এক ভালুক দেখে এসেছি। খুব বড়ো ভালুক। উনি এখন আরামে আছেন?'

'হাঁ, কিছুটা হুঁশ ফিরেছে।'

'যখমের উপর পট্টি বেঁধে দিয়েছো?'

'না, আমি তোমার জন ইনতেযার করছি, ওটা আমি খুলতে পারবো না।' তরুণী নয়ীমের বর্মের দিকে ইশারা করলো।

নওজোয়ান এগিয়ে এসে নয়ীমকে কোলের কাছে তুলে নিয়ে তাঁর বর্ম খুলে দিলো। কামিয উপরে তুলে সে তাঁর যখম দেখলো। তার উপর প্রলেপ লাগিয়ে বেঁধে দিয়ে বললো, 'এবার শুয়ে থাকুন। যখম খুবই বিপজ্জনক, কিন্তু এ প্রলেপে শিগগীরই সেরে যাবে। নয়ীম কিছু না বলে শুয়ে পড়লেন এবং নওজোয়ান চলে গেলো বাইরে। আর সব লোকও একে একে চলে গেলো। নয়ীম তখন পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন এবং তিনি যে জীবনের সফর শেষ করে জান্নাতুল ফিরদাউসে পৌছে গেছেন, সে ধারণাও ধীরে ধীরে মিটে গেছে তাঁর মন থেকে।

'আমি কোথায়?' তরুণীর দিকে তাকিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন।

'আপনি এখন আমাদেরই ঘরে।' তরুণী জবাব দিলো, 'বাইরে আপনি পড়েছিলেন বেহুশ হয়ে। আমি এসে আমার ভাইকে খবর দিয়ে ছিলাম। সে আপনাকে তুলে এনেছে এখানে।'

'তুমি কে?' নয়ীম প্রশ্ন করলেন।'

'আমি ভেড়া চরিয়ে বেড়াই।'

'তোমার নাম কি?'

'আমার নাম নার্গিস।'

'নার্গিস।'

'জিহাঁ!'

নয়ীমের কল্পনায় তারই সাথে সাথে আরো দুটি তরুণীর ছবি ভেসে উঠলো। তার নামের সাথে তার স্মরণ পড়লো আরো দুটি নাম। দীলের মধ্যে উযরা, জোলায়খা ও নার্গিসের নাম আবৃত্তি করতে করতে তিনি গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে তাকিয়ে রইলেন ঘরের ছাদের দিকে।

'আপনার ক্ষিধে পেয়েছে নিশ্চয়ই।' তরুণী নয়ীমের মনোযোগ আকর্ষণ করে বললো। তারপর উঠে সামনের কামরা থেকে কয়েকটি সেবা ও শুকনো মেওয়া এনে রাখলো নয়ীমের সামনে। সে নয়ীমের মাথার নীচে হাত দিয়ে উপরে তুললো এবং ভর দিয়ে উঁচু হয়ে বসবার জন্য একটা পুস্তিকন এনে দিলো তার পেছন দিকে। নয়ীম কয়েকটি সেব খেয়ে নার্গিসকে জিজ্ঞেস করলেন, যে নওযোযান এখন এসেছিল, সে কে?

'ও আমার ভোট ভাই।'

'কি নাম ওর?'

'হুমান।' নার্গিস জওয়াব দিলো।

নার্গিসকে আরো কয়েকটি প্রশ্ন করে নয়ীম জানলেন যে তার বাপ-মা আগেই মারা গেছেন। সে তার ভাইয়ের সাথে থাকে এই ছোট্ট বস্তিতে আর হুমান হচ্ছে বস্তির রাখালদের সরদার। বস্তির বাসিন্দাদের সংখ্যা প্রায় ছয়শ।'

সন্ধ্যা বেলায় হুমান ফিরে এসে জানালো যে, তার শিকার মেলেনি।

নার্গিস ও হুমান নয়ীমের শুশ্রূষার কোন কসুর করে না। গভীর রাত পর্যন্ত জেগে বসে থাকে তারা নয়ীমের শয্যার পাশে। নয়ীমের চোখে যখন নেমে আসে ঘুমের মায়া, নার্গিস তখন উঠে যায় অপর কামরায় আর হুমান তাঁর পাশেই শুয়ে পড়ে ঘাসের বিছানায়। রাতভর নয়ীম দেখতে থাকেন কতো মুগ্ধকর স্বপ্ন। আবদুল্লাহর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসার পর এই প্রথম রাত স্বপ্নের ঘোরে নয়ীমের কল্পনা জংগের ময়দান ছেড়ে উঠে গেছে আর এক নতুন দেশে। কখনো তিনি দেখছেন যেনো তাঁর মরহুম ওয়ালেদা তাঁর যখমের উপর প্রলেপ লাগিয়ে পট্টি বেঁধে দিচ্ছেন আর উযরার মুহব্বত ভরা দৃষ্টি তাঁকে দিচ্ছে শান্তির পয়গাম। আবার তিনি দেখছেন, যেনো জোলায়খা তাঁর আলোক-দীপ্ত মুখের আলোয় উজ্জ্বল করে তুলেছেন কয়েদখানার অন্ধকার কুঠরী।

ভোরের আলোয় চোখ খুলে তিনি দেখলেন, নার্গিস আবার দুধের পিয়ালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার শিয়রে, আর হুমান তাঁকে জাগাচ্ছে ঘুম থেকে।

নার্গিসের পিছনে দাঁড়িয়ে বস্তির আর একটি তরুণী তার দিকে তাকাচ্ছে একাগ্র দৃষ্টিতে। নার্গিস বললো, 'বস, যমররুদ!' অমনি সে নীরবে বসে পড়লো এক পাশে।

এক হফতা পরে নয়ীমের চলা-ফেরার শক্তি ফিরে এল। তিনি বস্তির নির্দোষ আবহাওয়া উপভোগ করতে শুরু করলেন। ভেড়া-বকরী চরিয়ে দিন গুযরান করে বস্তির লোকেরা। আশেপাশে সুন্দর শ্যামল চারণভূমি, তাই তাদের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। কোথাও কোথাও সেব ও আঙ্গুরের বাগিচা। ভেড়া-বকরী পালন ছাড়া সেকানকার লোক আনন্দ পায় জংলী জানোয়ার শিকার করে। বস্তির লোকেরা শিকার করতে চলে যায় দূরের বরফ ঢাকা এলাকায়, আর ভেড়া চরিয়ে বেড়ায় বিশেষ করে বস্তির যুবতী মেয়েরা। দেশের রাজনীতির ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না এরা। তাতারীদের বিদ্রোহের সমর্থন বা বিরোধিতা-কোনোটারই ধার ধারে না এরা। রাতের বেলা বস্তির যুবক-যুবতীরা এসে জমা হয় এক মস্ত বড়ো খিমায়; সেখানে তারা গান গায় আর নাচে। রাত্রির একভাগ কেটে গেলে মেয়েরা চলে যায় নিজ নিজ ঘরে, আর পুরুষরা অনেক রাত জেগে ছোট্ট ছোট্ট দলে ভাগ হয়ে কাটায় গল্পগুজবে। কেউ শুনায় আগেকার দিনের বাদশাহদের কাহিনী, কেউ বলে তার নিজের ভালুক-শিকারের মুগ্ধকর ঘটনা, আর কেউ বসে যায় জিন, ভূত-প্রেতের অসংখ্য মনগড়া কিস্সা নিয়ে। এরা অনেকটা কুসংস্কার পরস্ত, তাই মন দিয়ে শোনে ভূতের কিস্সা। কিছুদিন ধরে তাদের কাহিনীর বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছেন এক শাহ্যাদা। কেউ বলে তাঁর চেহারা ও রূপের কথা, কেউ তারিফ করে তাঁর লেবাসের, কেউ তাঁর যখমী হয়ে বস্তিতে আসায় প্রকাশ করে হয়রাণী, আবার কেউ কেউ বলে, রাখালদের বস্তিতে দেবতারা পাঠিয়েছে এক বাদশাহকে, আর হুমানকে তিনি বানাবেন তাঁর উযির। সোজা কথায়, বস্তির লোকেরা নয়ীমের নাম না নিয়ে তাকে বলতো শাহ্যাদা।

ওদিকে বস্তির মেয়েদের মধ্যে জল্পনা চললো যে, নবাগত শাহ্যাদা নার্গিসকে বানাবেন তাঁর বেগম। নার্গিসের সৌভাগ্যে গাঁয়ের মেয়েরা ঈর্ষান্বিতা। শাহ্যাদা নিরুপায় হয়ে তাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন বলে কেউ তাঁকে জানায় মোবারকবাদ, আবার কেউ কথায় কথায় তাঁকে করে বিদ্রুপ। নার্গিস প্রকাশ্যে রাগ করে, কিন্তু সখীদের মুখে এই ধরনের কথা শুনলে তার দীলে জাগে কম্পন। তার সফেদ গালের উপর খেলে যায় রক্তিম আভা। পল্লীর লোকদের মুখ দিয়ে নয়ীমের নতুন নতুন তারিফের কথা শুনবার জন্য তার কান হয়ে থাকে বেকারার।

নয়ীম এর সব কিছু সম্পর্কে বে-খবর অবস্থায় হুমানদের বাড়ির এক কামরায় কাটিয়ে দিচ্ছেন তাঁর যিন্দেগীর নিরুপদ্রব শান্তিপূর্ণ দিনগুলো। গাঁয়ের পুরুষ ও মেয়েরা হররোয এসে দেখে যায় তাঁকে। তাঁর শুশ্রূষার জন্য নয়ীম তাদেরকে জানান অকুণ্ঠ শোকরিয়া। সবাই তাঁকে শাহ্যাদা মনে করে আদরের সাথে দাঁড়িয়ে থাকে দূরে এবং তাঁর অবস্থা জানবার জন্য বড় বেশী প্রশ্ন করে না, কিন্তু নয়ীমর শান্ত স্বভাব তাদের সব কুণ্ঠা কাটিয়ে দেয় সহজেই। তাই কয়েকদিনের মধ্যেই আদব ও শ্রদ্ধা ছাড়া নয়ীমকে তারা মহব্বতের পাত্র করে নেয়।

❦

একদিন সন্ধ্যাবেলায় নয়ীম নামায পড়ছেন। নার্গিস তার সখীদের সাথে ঘরের দরযায় দাঁড়িয়ে একাগ্রচিত্তে দেখছে তাঁর কার্যকলাপ।

'উনি কি করছেন?' এক কিশোরী হয়রান হয়ে প্রশ্ন করলো।

'উনি যে শাহ্যাদা।' যমররুদ শিশুর মতো জওয়াব দিলো, 'দেখ, কি চমৎকার উঠা বসা করছেন!...ভাগ্য নার্গিসের, তুমিও অমনি করে থাক, নার্গিস?'

'চুপ।' নার্গিস ঠোঁটের উপর আঙ্গুল রেখে বললো।

নয়ীম নামায শেষ করে দো'আর জন্য হাত বাড়ালেন। তরুণীরা দরযার খানিটা দূরে সরে কথা বলতে লাগলো।

'চল, নার্গিস!' যমররুদ বললো, 'ওখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে সবাই।'

'আমি তোমাদের আগেই বলেছি, ওঁকে এখানে একা ফেলে যেতে পারবো না আমি।'

'চলো ওঁকেও সাথে নিয়ে যাবো।'

'তোমার মাথা বিগড়ে গেছে, কমবখত? উনি শাহ্যাদা না খেলনা?' আর এক বালিকা বললো।

মেয়েরা যখন এমনি করে কথা বলছে, তখন হুমানকে ঘোড়ায় চড়ে আসতে দেখা গেলো। সে নেমে এলে নার্গিস এগিয়ে ঘোড়ার বাগ ধরলো। হুমান সোজা গিয়ে নয়ীমের কামরায় প্রবেশ করলো।

যমররুদ বললো, 'চল নার্গিস! এবার তোমার ভাই-ই তো ওঁর কাছে বসবে।'

'চলো নার্গিস।' আর একজন বললো।

'চল, চল।' বলতে বলতে মেয়েরা নার্গিসকে ঠেলে নিয়ে গেলো একদিকে।

হুমান ভিতরে প্রবেশ করলে নয়ীম প্রশ্ন করলেন, 'বল ভাই, কি খবর নিয়ে এলে?'

'আমি সবগুলো জায়গা ঘুরে দেখে এসেছি। আপনার ফউজের কোন খবর মিললো না। ইব্‌নে সাদেক যেনো কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে। একটি লোকের কাছ থেকে জানলাম, শিগগিরই আপনাদের ফউজ হামলা করবে সমরকন্দের উপর।'

হুমান ও নয়ীমের মধ্যে কথাবার্তা চললো অনেকক্ষণ। নয়ীম এশার নামায পড়লেন। আরাম করবেন বলে তিনি শুয়ে পড়লেন। হুমান উঠে আর এক কামরায় চলে যাচ্ছিলো। ইতিমধ্যে গাঁয়ের লোকদের গানের আওয়ায ভেসে এলো তাঁদের কানে।

'আপনি আমাদের গাঁয়ের লোকদের গান শোনেন নি, কেমন?' হুমান বললো।

'আমি এখানে শুয়ে শুয়ে কয়েকবার শুনেছি।'

'চলুন, ওখানে নিয়ে যাব আপনাকে। ওরা আপনাকে দেখলে খুবই খুশী হবে। আপনি জানেন, ওরা আপনাকে শাহ্যাদা মনে করে?'

'শাহ্যাদা?' নয়ীম হাসিমুখে বললেন, 'ভাই, আমাদের ভেতরে না আছে কোনও বাদশাহ না আছে শাহযাদা।'

'আমার কাছে আপনি গোপন করছেন কেন?'

'গোপন করে আমার লাভ?'

'তা হলে আপনি কে?'

'এক মুসলমান।'

'হয়তো আপনারা যাকে মুসলমান বলেন, আমরা তাকে বলি শাহ্যাদা।'

গানের আওয়ায ক্রমাগত জোরদার হতে লাগলো। হুমান শুনলো নিবিষ্টমনে। 'চলুন।' হুমান আর একবার বললো, 'গাঁয়ের লোক আমায় কতোবার অনুরোধ করেছে আপনাকে ওদের মজলিসে নিয়ে যেতে, কিন্তু আমি আপনার উপর যবরদস্তি করতে সাহস করিনি।'

'আচ্ছা চলো।' নয়ীম উঠতে উঠতে জওয়াব দিলেন।

কয়েকটি লোক সানাই আর ঢোল বাজাচ্ছে। এক বুড়ো তাতারী গাইছে গান। নয়ীম ও হুমান খিমায় ঢুকতেই সব শান্ত-নিশ্চুপ।

'তোমরা চুপ করলে কেন?' হুমান বললো. 'গাও।'

আবার গান শুরু হলো।

এক ব্যক্তি একটা পুস্তিন বিছিয়ে দিয়ে নয়ীমকে অনুরোধ করলো বসতে। নয়ীম খানিকটা ইতস্ততঃ করে বসলেন। যন্ত্রীরা যখন সঙ্গীতের সুরের সাথে সাথে তাল বদল করলো, অমনি তামাম পুরুষ ও নারী উঠে একে অপরের হাত ধরে শুরু করলো নৃত্য। হুমানও উঠে যমররুদের হাত ধরে শরীক হলো নৃত্যে।

তামাম নর্তক-নর্তকীর দৃষ্টি নয়ীমের দিকে নিবদ্ধ। নার্গিস তখনো একা দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রয়েছে নয়ীমের দিকে। এক বৃদ্ধ মেষ পালক সাহস করে নয়ীমের কাছে এসে বললো. 'আপনিও উঠুন। আপনার সাথী ইনতেযার করছে আপনার।'

নয়ীম নার্গিসের দিকে তাকালেন। অমনি নার্গিস দৃষ্টি অবনত করলো। নয়ীম নীরবে আসন ছেড়ে উঠে খিমার বাইরে গেলেন। নয়ীম বেরিয়ে যাওয়া মাত্র খিমায় ছেয়ে গেলো একটা গভীর নিস্তব্ধতা।

'উনি আমাদের নাচ পছন্দ করেন না। আচ্ছা আমি ওঁকে ঘরে রেখে এখখুনি ফিরে আসছি।' এই কথা বলে হুমান খিমা থেকে বেরিয়ে ছুটে গেলো নয়ীমের কাছে।

'আপনি খুব ঘাবড়ে গেলেন?' সে বললো।

'ওহ্হো, তুমিও এসে গেলে?'

'আমি আপনাকে ঘর পর্যন্ত রেখে আসবো?'

'না যাও। আমি খানিকক্ষণ এদিকে ফিরে ঘরে যাবো।'

হুমান ফিরে চলে গেলে নয়ীম বস্তির এদিক ওদিক ঘুরে থাকার জায়গার কাছে পৌঁছে ঘরের বাইরে এক পাথরের উপর বসে আসমানের সিতারার সাথে ভাব জমালেন। তাঁর দীলের মধ্যে ভেসে আসতে লাগলো নানা রকমের চিন্তা, 'কি করছি আমি এখানে? এখানে বেশী সময় থাকা ঠিক হবে না। এক হফতার মধ্যে আমি ঘোড়ায় সওয়ার হতে পারবো। আমি শিগগিরই চলে যাবো এখান থেকে। এ বস্তি মুজাহিদের দুনিয়া থেকে অনেক-অনেক দূর। কিন্তু এ লোকগুলো কতো সাদাসিধা। এদেরকে নেক রাস্তা দেখানো প্রয়োজন।'

নয়ীম এমনি করে ভাবছেন আর ভাবছেন, হঠাৎ পিছন থেকে কারুর পদধ্বনি শোনা গেলো, তিনি ফিরে দেখলেন, নার্গিস আসছে। সে কি যেনো চিন্তা করে ধীরে পা ফেলে এলো নয়ীমের কাছে। তারপর ধরা গলায় বললো,

'আপনি এ ঠাণ্ডার ভিতরে বাইরে বসে রয়েছেন?'

নয়ীম চাঁদের মুগ্ধকর রৌশনীতে তার মুখের দিকে নযর করলেন। এ যেমন সুন্দর, তেমনি নিষ্পাপ। তিনি বললেন, 'নার্গিস, তোমার সাথীদের ছেড়ে কেন এলে তুমি?'

'আপনি চলে এলেন। আমি ভাবলাম...আপনি...একাই রয়েছেন হয়তো।'

এই ভাঙা ভাঙা কথাগুলো নয়ীমের কানে বাজিয়ে গেলো অনন্ত সুরঝংকার। এক লহমার জন্য তিনি নিশ্চল-নিঃসাড় হয়ে চেয়ে রইলেন নার্গিসের দিকে। তারপর আচানক উঠে একটি কথাও না বলে লম্বা লম্বা কদম ফেলে গিয়ে ঢুকলেন তাঁর কামরায়। নার্গিসের কথাগুলো বহু সময় ধরে তাঁর কানের কাছে গুঞ্জর করে ফিরতে লাগলো এবং তিনি শয্যায় আশ্রয় নিয়ে পাশ ফিরতে লাগলেন বারংবার।

ভোরে নয়ীম ঘুম থেকে জেগে বাইরে গিয়ে ঝরণার পানিতে ওযু করে কামরায় ফিরে এসে ফজরের নামায পড়লেন। তারপর বেরিয়ে গেলেন বেড়াতে। ফিরে এসে কারায় ঢুকতে গিয়ে দেখলেন, বেশীর ভাগ সময়ে তিনি যেখানে নামায পড়েন, হুমান সেখানে চোখ বন্ধ করে কেবলার দিকে মুখ করে রুকু ও সিজদার অনুকরণ করছে। নয়ীম নীরবে দরযায় দাঁড়িয়ে তার নির্বিকার অনুকরণ দেখে হাসতে লাগলেন। হুমান যখন নয়ীমের মতো বসে খানিকক্ষণ ঠোঁট নাড়াচাড়া করে ডানে-বায়ে তাকিয়ে দেখলো, তখন তার নযর পড়লো নয়ীমের উপর। সে ঘাবড়ে গিয়ে উঠে এলো এবং তার পেরেশানি সংযত করতে গিয়ে বললো, 'আমি আপনার নকল করছিলাম। গাঁয়ের অনেক যুবক-যুবতী এমনি করছে। তারা বলে, যারা এমনি করে থাকে, তাদেরকে খুব ভালো লোক মনে হয়। আমি যখন আপনার কামরায় গেলাম, তকন নার্গিসও এমনি করছিলো। আমি....।'

নয়ীম বললেন, 'হুমান, সব কিছুতেই তুমি কেন আমায় নকল করবার চেষ্টা করছো?'

'কেননা আপনি আমাদের চাইতে ভালো, আর আপনার প্রত্যেক কথাই আমাদের চাইতে ভালো।'

'আচ্ছা বেশ, আজ গাঁয়ের তামাম লোককে এক জায়গায় জমা করো। আমি তাদের কাছে কিছু কথা বলবো।'

'ওরা আপনার কথা শুনে খুব খুশী হবে। আমি এখখুনি তাদেরকে একত্র করছি।' হুমান দেরী না করে ছুটে চললো।

দুপুরের আগেই তামাম লোক এক জায়গায় জমা হলো। নয়ীম প্রথম দিন খোদা ও তাঁর রসূল (সঃ)-এর তারিফ করলেন। তিনি তাদেরকে বললেন, 'আগুন পাথর আর সব জিনিসই খোদার সৃষ্টি। এসব জিনিসের সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে সৃষ্ট জিনিসের পুজা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আমাদের কওমের অবস্থাও একদিন ছিলো তোমাদের কওমেরই মতো। তারাও পাথরের মূর্তি তৈরী করে তার পুজা করতো। তারপর আমাদের মাঝে পয়দা হলেন খোদার মনোনীত এক রসূল (সঃ)। তিনি আমাদেরকে দেখালেন এক নতু

পথ।' নয়ীম রসূলে মদনী (সঃ)-এর যিন্দেগী কাহিনী শোনালেন তাদেরকে। এমনি করে চললো আরও কয়েকটি বক্তৃতা। বস্তির তামাম লোককে তিনি টেনে আনলেন ইসলামের দিকে। সবার আগে কলেমা পড়লো নার্গিস আর হুমান।

কয়েকদিনের মধ্যে বস্তির আবহাওয়া সম্পূর্ণ বদলে গেলো। মনোমুগ্ধকর শ্যামল চারণভূমি মুখর হয়ে উঠলো নয়ীমের আযান ধ্বনিতে। নাচ গানের বদলে চালু হলো পাঁচ ওয়াক্তের নামায।

নয়ীম এবার পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তিনি কয়েকবার ফিরে যাবার ইরাদা করছেন, কিন্তু বরফপাতের দরুণ পাহাড়ীপথ বন্ধ থাকায় আরও কিছুকাল দেরী না করে উপায় ছিলো না।

নয়ীম বেকার বসে দিন কাটাতে অভ্যস্ত নন। তাই তিনি কখনও বস্তির লোকদের সাথে যান শিকার করতে। একদিন ভালুক শিকারে নয়ীম দিলেন অসাধারণ সাহসের পরিচয়। এক ভালুক শিকারীর তীরে যখমী হয়ে এমন হিংস্র হামলা শুরু করলো যে, শিকারীরা এদিক ওদিক পালাতে লাগলো। তারা নিজ নিজ জান বাঁচাবার জন্য বড়ো বড়ো পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে তীর ছুঁড়তে লাগলো ভালুকের দিকে। নয়ীম নেহায়েত স্বস্তির সাথে দাঁড়িয়ে রইলেন নিজের জায়গায়। ক্রুদ্ধ ভালুক তাঁর উপর হামলা করতে এগিয়ে এলো। নয়ীম বাম হাতে ঢাল তুলে আত্মরক্ষা করলেন এবং ডান হাতের নেযাহ ঢুকিয়ে দিলেন তার পেটে। ভালুক উল্টে পড়ে গেলো, কিন্তু পরক্ষণেই তীব্র চীৎকার করে উঠে হামলা করলো নয়ীমের উপর। ইতিমধ্যে তিনি তলোয়ার কোষমুক্ত করে হাতে নিয়েছেন। ভালুক থাবা মারবার আগেই নয়ীমের তলোয়ার গিয়ে লাগলো তার মাথায়। ভালুক পড়ে গিয়ে তড়পাতে তড়পাতে ঠাণ্ডা হয়ে গেলো।

শিকারীরা তাদের আশ্রয়স্থান থেকে বেড়িয়ে এসে হয়রাণ হয়ে তাকাতে লাগলো নয়ীমের দিকে। এক শিকারী বললো, 'আজ পর্যন্ত এত বড়ো ভালুক আর কেউ মারতে পারেনি। আপনার জায়গায় আজ আমাদের মধ্যে কেউ থাকলে তার ভালো হতো না। আজ পর্যন্ত কতো ভালুক আপনি মেরেছেন?'

'আজই প্রথমবার।' নয়ীম তলোয়ার কোষবদ্ধ করতে করতে বললেন।

'প্রথমবার?' সে হয়রাণ হয়ে বললো, 'আপনাকে তো নিপুণ শিকারী বলেই মনে হচ্ছে।'

তার জওয়াবে এক বৃদ্ধ শিকারী বললো, 'দীলের বাহাদুরী, বাযুর হিম্মৎ আর তলোয়ারের তেজ যেখানে রয়েছে, সেখানে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই।'

গাঁয়ের লোকদের কাছে নয়ীম হয়ে উঠলেন মানবতার সর্বোচ্চ আদর্শ এবং তাঁর প্রতিটি কথা, প্রতিটি কাজ হলো তাদের কাছে অনুকরণীয়। এ বস্তিতে এসে তাঁর দেড়মাস কেঁটে গেছে। তাঁর একিন রয়েছে যে, কুতায়বা বসন্ত কালের আগে হামলা করতে এগিয়ে আসবেন না। তাই প্রকাশ্যে তাঁর সেখানে আরও কিছু কাল থাকায় কোনো বাঁধা ছিলো না, কিন্তু এক নতুন অনুভূতি নয়ীমকে অনেকখানি অশান্ত-চঞ্চল করে তুললো।

নার্গিসের চাল-চলন তাঁর শান্ত-সমাহিত অন্তরে আবার তুললো এক ঝড়। ধারণার দিক দিয়ে তিনি প্রথম যৌবনের রঙিন স্বপ্ন সম্পর্কে নির্বিকার হয়ে গেছেন, কিন্তু প্রকৃতির বর্ণগন্ধময় রূপের প্রভাব আর একবার তাঁর মনে জাগিয়ে তুলতে চাচ্ছে সেই ঘুমন্ত অনুভূতিকে।

বস্তির লোকদের মধ্যে নার্গিস রূপ, গুণ, আকৃতি, স্বভাব ও চালচলনের দিক দিয়ে অনেকটা স্বতন্ত্র হয়ে দেখা দিয়েছে তাঁর চোখে। গোড়ার দিকে বস্তির লোকেরা যখন নয়ীমকে ভালো করে জানতো না, তখন নার্গিস অসংকোচে তাঁর সামনে এসেছে। কিন্তু বস্তির লোকেরা যখন তাঁর সাথে অসংকোচে মেলামেশা করতে লাগলো, তখন নার্গিসের অসংকোচ সংকোচে রূপান্তরিত হলো। আকাংক্ষার চরম আকর্ষণ তাকে নিয়ে যায় নয়ীমের কামরায়, কিন্তু চরম সংকোচ-শরম তাকে সেখানে দাঁড়াতে দেয় না। নয়ীমকে অচঞ্চল দৃষ্টিতে সে দেখবে সারাদিন, মনে করে সে যায় তাঁর কামরায় কিন্তু নয়ীমের সামনে গেলেই তার সব ধারণা ভুল হয়ে যায়। অন্তরের আশা-আকাংক্ষার কেন্দ্র মানুষটির দিকে তাকালেই তার দৃষ্টি অবনত হয়ে পড়ে এবং কম্পিত দীলের সকল আবেদন, অনুনয় ও প্রেরণা সত্ত্বেও আর একবার নযর তুলবার সাহস সঞ্চয় করতে পারে না সে কিছুতেই। যদি বা কখনো সে সাহস যোগায়, তথাপি নয়ীম ও তার মাঝখানে এসে দাঁড়ায় হায়া-শরমের দুর্ভেদ্য নেকাব। এমনি অবস্থায় নয়ীম তাকে দেখছেন ভেবে সে হয়তো আশ্বাস পায়, কিন্তু যখন সে ভুল করে এক আধবার তাঁর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তখন দেখে যে, তিনি গর্দান নীচু করে পুস্তিনের পশমের উপর হাত বুলাচ্ছেন অথবা হাত দিয়ে একটির পর একটি শুকনো ঘাস ছিঁড়ছেন। এসব দেখে শুনে তার অন্তরের ধূমায়িত অগ্নিশিখা নিভে আসে, তার শিরা-উপশিরায় বয়ে যায় হিমশীতল রক্তপ্রবাহ। তার কানে গুঞ্জরিত সংগীত-ঝংকার নির্বাক হয়ে আসে, তার চিন্তার সূত্র যায় ছিন্নভিন্ন হয়ে। দীলের মধ্যে এক অসহনীয় বোঝা নিয়ে সে উঠে নয়ীমের দিকে হতাশ দৃষ্টি হেনে বেরিয়ে যায় কামরা থেকে।

গোড়ার দিকে যেখানে এক নিষ্পাপ যুবতীর মুহব্বত একটি মানুষের অন্তরে আকাংক্ষার তুফান আর ধারণা-কল্পনার ঝড় পয়দা করে দেয়, সেখানেই কতকগুলো অসাধারণ চিন্তা তাঁকে কর্ম ও সংগ্রামের সাহস থেকে করে বঞ্চিত।

নয়ীম হয়ে উঠেছেন নার্গিসের ধারণা , আকাংক্ষা ও স্বপ্নের ছোট্ট দুনিয়ার কেন্দ্রবিন্দু। তার অন্তর আনন্দে উচ্ছল। কিন্তু ভবিষ্যতের চিন্তা করতে গেলেই সংখ্যাতীত আশংকা তাকে করে তোলে পেরেশান। সে তাঁর সামনে না গিয়ে চুপি চুপি তাঁকে দেখে। কখনো এক কাল্পনিক সুখের চিন্তা তার দীলকে করে দেয় আনন্দোজ্জ্বল,

আবার এক কাল্পনিক বিপদের আশংকা তাকে প্রহরের পর প্রহর করে রাখে অশান্ত-চঞ্চল।

নয়ীমের মত আত্মসচেতন লোকের পক্ষে নার্গিসের দীলের অবস্থা আন্দায করা মোটেই মুশকিল ছিলো না। মানুষের মন জয় করবার যে শক্তি তাঁর ভিতরে রয়েছে তা তাঁর অজানা নেই, কিন্তু এ বিজয়ে তিনি খুশী হবেন কিনা, তার মীমাংসা করে উঠতে পারে না আপন মনে।

একদিন এশার নামাযের পর নয়ীম হুমানকে তাঁর কামরায় ডেকে ফিরে যাবার ইরাদা জানালেন। হুমান জওয়াবে বললো, 'আপনার মরযীর খেলাফ আপনাকে বাঁধা দেবার সাহস নেই আমার, কিন্তু আমায় বলতেই হবে যে, বরফ-ঢাকা পাহাড়ী পথ এখনও সাফ হয়নি। কমসে-কম আরও একমাস আপনি দেরী করুন। মওসুম বদল হলে সহজ হবে আপনার সফর।'

নয়ীম জওয়াব দিলেন, 'বরফপাতের মওসুম তো এখন শেষ হয়ে গেছে, আর সফরের ইরাদা আমার কাছে সতমতল ও বন্ধুর দুর্গম পথ একই রকম করে দেয়। আমি কাল ভোরেই চলে যাবার ইরাদা করে ফেলেছি।'

'এত জলদী! কাল তো আমরা যেতে দেবো না!'

'আচ্ছা, ভোরে দেখা যাবে।' বলে নয়ীম বিছানার উপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন। হুমান উঠলো নিজের কামরায় যাবার জন্য। পথে দাঁড়িয়ে রয়েছে নার্গিস। হুমানকে আসতে দেখে সে দাঁড়িয়ে গেলো গাছের আড়ালে। হুমান অপর কামরায় চলে গেলে নার্গিসও এসে তার পিছু পিছু ঢুকলো।

'নার্গিস, বাইরে ঠান্ডা। এর মধ্যে তুমি কোথায় ঘুরছো?' হুমান বললো।

'কোথাও না, এমনি বাইরে ঘুরছিলাম আর কি!' নার্গিস জওয়াব দিলো।

কামরাটি নয়ীমের বিশ্রামের কামরা থেকে একটুখানি দূরে। মেঝের উপর শুকনো ঘাস বিছানা। কামরার এক কোণে শুয়ে পড়লো হুমান, অপর কোণে নার্গিস।

হুমান বললো, 'নার্গিস, উনি কাল চলে যাবার ইরদা করছেন।'

নার্গিস আগেই নিজের কানে নয়ীম ও হুমানের কথাবার্তা শুনেছে, কিন্তু ব্যাপারটা তার কাছে এমন নয় যে, সে চুপ করে থাকবে।

সে বললো 'তা তুমি ওঁকে কি বললে?'

'আমি ওকে দেরি করতে বললাম, কিন্তু ওঁকে অনুরোধ করতেও ভয় লাগে আমার। উনি চলে গেলে গাঁয়ের লোকেরও আফসোস হবে খুবই। ওদেরকে আমি বলবো, সবাই মিলে ওঁকে বাধ্য করবে থেকে যেতে।'

হুমান নার্গিসের সাথে কয়েকটি কথা বলেই ঘুমিয়ে পড়লো। নার্গিস বারংবার পাশ ফিরে ঘুমোবার ব্যর্থ চেষ্টা করবার পর উঠে বসলো। 'উনি যদি চলেই যাবেন এমনি করে, তাহলে এলেন কেন?' এই কথা ভাবতে ভাবতে সে বিছানা ছেড়ে উঠলো। ধীরে ধীরে কদম ফেলে কামরার বাইরে নয়ীমের কামরার চারদিকে ঘুরে দেখলো। তার পর ভয়ে ভয়ে দরযা খুললো, কিন্তু সামনে কদম ফেলবার সাহস হলো না। ভিতরে মোমবাতি জ্বলছে আর নয়ীম পুস্তিনে গা ঢেকে ঘুমোচ্ছেন। তাঁর মুখ চিবুক পর্যন্ত খোলা। নার্গিস আপন মনে বললো,

'শাহ্‌যাদা আমার, তুমি চলে যাচ্ছ! জানি না, কোথায় যাচ্ছো। তুমি, তুমি কি জানো, তুমি কি ফেলে যাচ্ছো এখানে, আর কি নিয়ে যাচ্ছো, এই পাহাড়, এই চারণভূমি, বাগ-বাগিচা আর ঝরণার সবটুকু সৌন্দর্য, সবটুকু আকর্ষণ তুমি নিয়ে যাবে তোমার সাথে, আর এখানে পড়ে থাকবে তোমার স্মৃতি। ......শাহ্‌যাদা......শাহ্‌যাদা আমার!.........না, না, তুমি আমার নও, আমি তোমার যোগ্য নই।' ভাবতে ভাবতে সে কাঁদতে লাগলো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। সে আবার ঢুকলো কামরার ভিতরে এবং নিশ্চল-নিঃসাড় হয়ে তাকিয়ে রইলো নয়ীমের দিকে।

আচানক নয়ীম পাশ ফিরলেন। নার্গিস ভয় পেয়ে বেরিয়ে নিঃশব্দ পদক্ষেপে নিজের কামরায় গিয়ে শুয়ে পড়লো। 'ওহ্‌, রাত এত দীর্ঘ!' কয়েকবার উঠে উঠে সে আবার শুয়ে পড়ে বললো আপন মনে।

ভোরে এক রাখাল আযান দিলো। বিছানা ছেড়ে নয়ীম ওযু করতে গেলেন ঝরণার ধারে। নার্গিস আগে থেকেই রয়েছে সেখানে। তাকে দেখেও নয়ীমের কোন ভাবান্তর হলো না। তিনি বললেন, 'নার্গিস, আজ তুমি সকালে এসে গেছো এখানে?'

রোজ নার্গিস এই গাছের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে নয়ীমকে। আজ সে নয়ীমের নির্বিকার ঔদাসীন্যের জন্য অভিযোগ জানাতে তৈরী হয়ে এসেছে, কিন্তু নীয়ম বেপরোয়া হয়ে আলাপ করায় তার উৎসাহের আগুন নিভে গেলো। তথাপি সে সংযত হয়ে থাকতে পারলো না। অশ্রুসজল চোখে সে বললো, 'আপনি আজই চলে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ নার্গিস, এখানে এসে আমার বহুত দিন কেটে গেলো। আমার জন্য কত তকলীফই না করলে তোমরা। হয়তো আমি তার শোকরিয়া জানাতে পারবো না। খোদা তোমাদেরকে এর প্রতিদান দিন।'

কথাটি বলে নয়ীম একটা পাথরের উপর বসে ওযু করতে লাগলেন ঝরণার পানিতে। নার্গিস আরও কিছু বলতে চায়, কিন্তু নয়ীমের কার্য-কলাপ তার উৎসাহ নিভিয়ে দেয়। দীলের মধ্যে যে ঝড় বইছিলো তা থেমে আসে। গাঁয়ের বাকী লোকেরা ঝরণার কাছে ওযু করতে এলে নার্গিস সরে পড়ে সেখান থেকে।

ইসলাম কবুল করবার আগে যে বড়ো খিমায় গাঁয়ের লোকেরা নাচ-গানে কাটাতো অবসর সময়, এখন সেখানেই হচ্ছে নামায। নয়ীম ওযু করে খিমায় ঢুকলেন। গাঁয়ের লোকদের নামায পড়ালেন এবং দোয়া শেষ করে তাদেরকে জানালেন চলে যাবার ইরাদা।

নয়ীম হুমানকে সাথে নিয়ে বাইরে এলেন। বাড়িতে পৌছে নয়ীম গেলেন তাঁর কামরায়। হুমান নয়ীমের সাথে ঢুকতে গিয়ে পেছনে গাঁয়ের লোকদের আসতে দেখে ফিরে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে তাকালো।

'সত্যি সত্যি উনি চলে যাচ্ছেন তা হলে?' এক বৃদ্ধ প্রশ্ন করলো।

'হ্যাঁ, উনি থাকবেন না বলে আমার আফসোস হচ্ছে'। হুমান বললো।

'আমরা অনুরোধ করলেও থাকবেন না?'

'তা হলে হয়তো থাকতে পারেন, কিন্তু ঠিক বলতে পারি না। তবু আপনারা ওঁকে বলে দেখুন। উনি যেদিন এলেন, সেদিন থেকে আমার মনে হচ্ছে যেনো দুনিয়ার

বাদশাহী পেয়ে গেছি। আপনারা বয়সে আমার বড়ো, আপনারা অবশ্য চেষ্টা করুন। আপনাদের কথা উনি মানতেও পারেন।'

নয়ীম বর্ম-পরিহিত অস্ত্র-সজ্জিত হয়ে এলেন। তাঁকে আজ সত্যি মনে হচ্ছে যেনো এক শাহযাদা। গাঁয়ের লোকেরা তাঁকে দেখেই সমস্বরে কোলাহল শুরু করলো, 'যেতে দেবো না আমরা, কিছুতেই যেতে দেবো না।'

নয়ীম তাঁর বিশ্বস্ত মেযবানদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন এবং খানিক্ষণ নীরব থেকে হাত বাড়িয়ে দিলে তারা সবাই চুপ করলো।

নয়ীম এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করলেন, 'বেরাদারণ! কর্তব্যের আহবানে বাধ্য না হলে আমার আরও কিছু দিন এখানে থাকতে আপত্তি হতো না, কিন্তু আপনাদের জেনে রাখা প্রয়োজন যে, জিহাদ এমন এক ফরয, যাকে কোনোও অবস্থায়ই উপেক্ষা করা যায় না। আপনাদের মুহব্বতের জন্য অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আশা করি, খুশী হয়ে আপনারা আমায় এজাযত দেবেন।'

নয়ীম তাঁর কথা শেষ না করতেই একটি ছোট ছেলে চীৎকার করে উঠলো, 'আমরা যেতে দেবো না।' নয়ীম এগিয়ে গিয়ে ছোট্ট বাচ্চাটিকে তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরে বললেন, 'আপনাদের উপকার হামেশা আমার মনে থাকবে। এ বস্তির কল্পনা হামেশা আমার মন আনন্দে ভরপুর করে রাখবে। এ বস্তিতে আমি এসেছি অপরিচিত। আজ এই কয়েক হফতার পর এখান থেকে বিদায় নিতে গিয়ে আমি অনুভব করছি যে, আমি আমার প্রিয়তম ভাইদের কাছ থেকে জুদা হয়ে যাচ্ছি। আল্লাহ চাহেতো আর একবার আমি এখানে আসবার চেষ্টা করবো।'

এরপর নয়ীম তাদেরকে কিছু উপদেশ দিয়ে দো'আ করে সকলের সাথে মোসাফেহা করতে শুরু করলেন। হুমানও আর সব লোকদের মতো রাযী হলো তার মরযীর বিরুদ্ধে। নয়ীমের জন্য সে নিয়ে এলো তার খুবসুরত সাদা ঘোড়াটি এবং নেহায়েত আন্তরিকতা সহকারে অনুরোধ করলো এ তোহফা কবুল করতে।

নয়ীম তাকে শোকরিয়া জানালেন। হুমান ও গাঁয়ের আরও পনেরো জন নওজোয়ান নয়ীমের সাথে যেতে চাইলো জিহাদে যোগ দিতে। কিন্তু সেনাবাহিনীর ছাউনীতে পৌছে প্রয়োজন মতো নয়ীম তাদেরকে ডেকে পাঠাবেন, এই ওয়াদা পেয়ে তারা আশ্বস্ত হলো। বিদায় নেবার আগে নয়ীম এদিক ওদিক তাকালেন, কিন্তু নার্গিসকে দেখতে পেলেন না। তার কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে তিনি যেতে চান না, কিন্তু সেই মুহূর্তে তার কথা কারুর কাছে জিজ্ঞেস করাটাও ভালো দেখায় না।

হুমানের সাথে মোসাফেহা করতে গিয়ে একবার তাকালেন মেয়েদের ভিড়ের দিকে। নার্গিস হয়তো তাঁর মতলব বুঝে ফেলেছে। তাই সে ভিড় থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে দাঁড়ালো নয়ীমের কাছ থেকে কিছুটা দূরে। নয়ীম ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে নার্গিসের দিকে হানলেন বিদায়ী দৃষ্টি। এই প্রথম বার নয়ীমের চোখের সামনে দৃষ্টি অবনত হলো না। এক পাথরের মূর্তির মতো নিঃসাড় নিশ্চল হয়ে এক দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইলো নয়ীমের মুখের দিকে। তার মুখে ফুটে উঠেছে এক অব্যক্ত বেদনার অভিব্যক্তি, কিন্তু চোখে তাঁর অশ্রু নেই। বেদনার আতিশয্যে চোখের পানি শুকিয়ে যায়, তা জানা আছে

নয়ীমের। তিনি যেন সইতে পারেন না এ মর্মন্তুদ দৃশ্য। তাঁর দীল ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, তবু থেকে যাওয়া তাঁর পক্ষে মুশকিল। নয়ীম আর একদিকে মুখ ফিরালেন। হুমান ও গাঁয়ের আরও কতো লোক তাঁর সাথে যেতে চাইলো কিছুদূর, কিন্তু তাদেরকে মানা করে তিনি ঘোড়া ছুটালেন দ্রুত গতিতে।

উঁচু উঁচু টিলায় চড়ে লোকেরা দেখতে লাগলো নয়ীমের চলে যাবার শেষ দৃশ্য; কিন্তু নার্গিস সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো। তার পা যেন যমিনে বসে গিয়েছে,নড়বার শক্তিও যেনো নেই তার। কয়েকজন সখী এসে জমা হলো তার পাশে। তার সব চাইতে অন্তরংগ ও ঘনিষ্ঠ যমররুদ বিষণ্ণ মুখে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। গাঁয়ের মেয়েদের জমা হতে দেখে সে বললো 'তোমরা কি দেখছো এখানে? নিজ নিজ ঘরে চলে যাও'।

মেয়েদের অনেকেই চলে গেলো সেখান থেকে, কিন্তু কেউ কেউ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো। যমররুদ নার্গিসের কাঁধে হাত রেখে বললো, 'চল নার্গিস!'

নার্গিস চমকে উঠে যমররুদের দিকে তাকালো। তারপর কোন কথা না বলে তার সাথে সাথে খিমার ভিতর প্রবেশ করলো। নয়ীম যে পুস্তিনটি ব্যবহার করতেন, তা সেখানেই পড়েছিল। নার্গিস বসতে বসতে সেটি হাতে তুলে নিলো। পুস্তিনটি দিয়ে মুখ ঢাকতেই তার দু'চোখ বেয়ে নামলো অশ্রুর বন্যা। যমররুদ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো তার পাশে। অবশেষে নার্গিসের বাযু ধরে নিজের দিকে টেনে এনে সে বললো, 'নার্গিস! তুমি হতাশ হলে? উনি কতবার ওয়ায করতে গিয়ে বলেছেন, খোদার রহমত সম্পর্কে কখখনো হতাশ হতে নেই। প্রার্থীকে তিনি সব কিছুই দিতে পারেন। ওঠ নার্গিস, বাইরে যাই। তিনি নিশ্চয়ই ফিরে আসবেন।'

নার্গিস অশ্রু মুছে ফেলে যমররুদের সাথে বেরিয়ে গেলো। বস্তির সব কিছুই তার চোখে হয়ে এসেছে ম্লান।

❦

দুপুরের সূর্য নীল আসমানে পূর্ণ গৌরবে তার কিরণ-জাল বিকিরণ করছে। বস্তির বাইরে এক খেজুর-কুঞ্জের ঘন ছায়ায় কয়েকটি লোক জমা হয়েছে। তাদের মধ্যে কতক লোক বসে কথা বলছে, আর বাকী লোকেরা পড়ে ঘুমুচ্ছে। তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে কুতায়বা, মুহাম্মদ বিন্ কাসিম ও তারিকের বিজয়-কাহিনী।

'আচ্ছা এ তিন জনের মধ্যে বাহাদুর কে?' এক নওজোয়ান প্রশ্ন করলো।

'মুহম্মদ বিন্ কাসিম।' একজন কিছুক্ষণ চিন্তা করে জওয়াব দিলো। একটি লোক ঘুমের নেশায় ঝিমুচ্ছিল। মুহাম্মদ বিন্ কাসিমের নাম শুনে সে বসলো হুশিয়ার হয়ে।

'মুহম্মদ বিন্ কাসিম? আরে, তিনি আবার বাহাদুর? সিন্ধুর ভীতু রাজাদের তাড়িয়েছেন, এইতো! তাতেই হলেন বাহাদুর! লোক যে তাঁকে ভয় করে, তার কারণ তিনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ভাতিজা। তাঁর চাইতে তারিক অনেক বড়ো।' লোকটি এই কথা বলে চোখ মুদলো আবার।

তার কথা শুনে মুহম্মদ বিন্ কাসিমের সমর্থক বিরক্ত হয়ে বললো, 'চাঁদের দিক থুথু ফেললে তা পড়ে নিজেরই মুখে। আজকের ইসলামী দুনিয়ায় কেউ নেই মুহম্মদ বিন্ কাসিমের মোকাবিলা করবার মতো।'

তৃতীয় এক ব্যক্তি বললো, 'মুহম্মদ বিন্ কাসিমকে আমরা দেখি ইয্যতের দৃষ্টিতে, কিন্তু এ কথা কখখনো স্বীকার করবো না যে, ইসলামী দুনিয়ায় তাঁর মোকাবিলার যোগ্য কেউ নেই। আমার ধারণা, তারিকের মোকাবিলা করবার যোগ্য নেই আর কোন সিপাহী।'

চতুর্থ ব্যক্তি বললো, 'এও ভুল। কুতায়বা এঁদের দুজনেরই চাইতে বাহাদুর।'

তারিকের সমর্থক বললো......'লা হাওলা ওয়ালা কুওৎ। কোথায় তারিক আর কোথায় কুতায়বা। কুতায়বা মুহম্মদ বিন্ কাসিমের চাইতে বাহাদুর, এ কথা আমি মানি, কিন্তু তারিকের সাথে তাঁর তুলনা চলে না।'

'তোমার ছোট মুখে মুহম্মদ বিন্ কাসিমের নামও শোভা পায় না।'মুহম্মদ বিন্ কাসিমের সমর্থক আবার বললো বিরক্তির স্বরে।

'আর তোমার ছোট মুখে আমার সাথে কথা বলাও শোভা পায় না।' তারিকের সমর্থন জওয়াব দিলো।

এরপর দু'জনেই তালোয়ার টেনে নিয়ে পরস্পরের মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে গেলো। তাদের মধ্যে যখন লড়াই শুরু হয়ে যাচ্ছে, তখনই দেখা গেলো, আবদুল্লাহ্ আসছেন ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে। আবদুল্লাহ্ দূর থেকে এ দৃশ্য লক্ষ্য করে ঘোড়া হাঁকালেন দ্রুতগতিতে। দেখতে দেখতে তিনি এসে দাঁড়ালেন তাদের মাঝখানে এবং তাদের কাছে জানতে চাইলেন লড়াইয়ের কারণ।

এক ব্যক্তি উঠে বললো, 'তারিক বড়ো না মুহাম্মদ বিন্ কাসিম বড়ো, এই প্রশ্নের মীমাংসা করছে এরা।'

'থাম!' আবদুল্লাহ্ হেসে বললেন এবং যুদ্ধরত লোক দুটিও তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলো।

'তোমরা দু'জনই ভুল করছো। মুহম্মদ বিন্ কাসিম ও তারিক তোমাদের নিন্দা-প্রশংসার ধার ধারেন না। তোমরা কেন মুফতে একে অপরের গর্দান কাটতে যাচ্ছো? শোন, তারিককে কেউ মুহম্মদ বিন্ কাসিমের চাইতে বড়ো বললে তিনি তা পছন্দ করবেন না, আর মুহম্মদ বিন্ কাসিমও শুনে খুশী হবেন না যে, তিনি তারিকের চাইতে বড়ো। যারা জংগের ময়দানে যান আল্লাহ্র হুকুমে সব কিছু কোরবান করবার আকাংক্ষা নিয়ে, এমনি বাজে কথার ধার ধারেন না তাঁরা। তোমরা তলোয়ার কোষবদ্ধ কর। তাঁদেরকে নিয়ে মাথা ঘামিও না।'

আবদুল্লাহ্র কথায় সবাই চুপ করে গেলো এবং লড়াই করতে উদ্যত লোক দুটি লজ্জায় অধোবদন হয়ে তলোয়ার কোষবদ্ধ করলো। সবাই একে একে আবদুল্লাহ্র সাথে মোসাফেহা করতে লাগলো। আবদুল্লাহ্ এক ব্যক্তির কাছে নিজের বাড়ির খবর জানতে চাইলেন। সে জওয়াব দিলো, 'আপনার বাড়ির সবাই কুশলে আছেন। কাল আমি আপনার বাচ্চাকে দেখালাম মাশাআল্লাহ্, আপনারই মতে জোয়ান মরদহবে।'

'আমার বাচ্চা!' আবদুল্লাহ্ প্রশ্ন করলেন।

'ওহো, এখনও আপনি খবর পাননি। তিন চার মাস হলো, মাশাআল্লাহ্ আপনি এক সুদর্শন ছেলের বাপ হয়েছেন। কাল আমার বিবি আপনার বাড়ি থেকে তাকে নিয়ে এলো। আমার বাচ্চা তাকে নিয়ে অনেকক্ষণ খেলা করেছে। চমৎকার স্বাস্থ্যবান ছেলে।'

আবদুল্লাহ্ লজ্জায় চোখ অবনত করলেন এবং সেখান থেকে উঠে বাড়ির পথ ধরলেন। তাঁর মন চায় এক লাফে বাড়িতে পৌঁছে যেতে, কিন্তু এতগুলো লোকের সামনে লজ্জায় তিনি মামুলী গতিতে ঘোড়া ছুটালেন। গাছ-গাছড়ার আড়ালে গিয়েই তিনি ঘোড়া ছুটালেন পূর্ণ গতিতে।

আবদুল্লাহ্ বাড়িতে ঢুকে দেখলেন, উযরা খেজুরের ছায়ায় চারপায়ীর উপর শুয়ে রয়েছেন। তাঁর ডান পাশে শায়িত এক খুবসুরত বাচ্চা তার হাতের আঙুল চুষছে। আবদুল্লাহ্ নীরবে এক কুরসী টেনে উযরার বিছানার কাছে বসে পড়লেন। উযরা স্বামীর মুখের উপর লজ্জাভারাবনত দৃষ্টি হেনে উঠে বসলেন। আবদুল্লাহ্ হেসে ফেললেন। উযরা দৃষ্টি অবনত করে বাচ্চাকে কোলে তুলে নিয়ে হাত বুলাতে লাগলেন তার মাথায়। আবদুল্লাহ্ হাত বাড়িয়ে উযরার হাতে চুমো খেলেন! তারপর ধীরে বাচ্চাকে তুলে নিলেন এবং তার পেশানীতে হাত বুলিয়ে তাকে কোলে শুইয়ে দিয়ে তাকিয়ে রইলেন তার মুখের দিকে। বাচ্চা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো আবদুল্লাহ্র কোমরে ঝুলানো খনজরের চমকদার হাতলের দিকে। সে যখন এদিক-ওদিক হাত চালিয়ে হাতলটি ধরলো, তখন আবদুল্লাহ্ নিজে তাঁর খনজরের হাতল তুলে দিলেন তার হাতে। বাচ্চা হাতলটি মুখে নিয়ে চুষতে লাগলো।

উযরা তার হাত থেকে খনজরের হাতল ছাড়াবার চেষ্টা করে বললেন, 'চমৎকার খেলনা নিয়ে এসেছেন আপনি।'

আবদুল্লাহ্ হেসে বললেন, 'মুজাহিদের বাচ্চার জন্য এর চাইতে ভালো খেলনা কি হবে?'

'যখন এ ধরনের খেলনা নিয়ে খেলবার সময় আসবে, তখন দেখবেন, ইনশাআল্লাহ্ খারাপ খেলোয়ার হবে না ও।'

'উযরা, ওর নাম কি?'

'আপনি বলুন।'

'উযরা, একটি নামই তো আমার ভাল লাগে।'

'বলুন!'

'নয়ীম!' আবদুল্লাহ্ বিষণ্ণ আওয়াযে জওয়াব দিলেন।

শুনে উযরার চোখ দুটি খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, 'আমার একিন ছিলো যে, এই নামই আপনি পছন্দ করবেন। তাই আগেই আমি ওর এই নাম রেখে দিয়েছি।'

নার্গিসদের বস্তি থেকে বিদায় নিয়ে প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করে নয়ীম তাতারী পশু-পালকদের এক বস্তিতে গিয়ে রাত কাটালেন। সেখানকার লোকদের চালচলন ও রীতিনীতির সাথে তিনি পরিচিত। তাই আশ্রয়স্থান খুঁজে নিতে অসুবিধা হয়নি তাঁর। বস্তির সরদার তাঁকে ইসলামী ফউজের এক অফিসার মনে করে যথাসম্ভব আদর আপ্যায়ন করলো! সন্ধ্যায় খানা খেয়ে নয়ীম বেরুলেন ঘুরতে। বস্তি থেকে কিছুদূর যেতেই শোনা গেলো ফউজী নাকারার আওয়ায। পিছু ফিরে তিনি দেখলেন, গাঁয়ের লোকেরা ঘর ছেড়ে পালাচ্ছে এদিক ওদিক। নয়ীম ছুটে তাদের কাছে গিয়ে জানতে চাইলেন তাদের পেরেশানীর কারণ।

গাঁয়ের সরদার বললো, 'নাযযাকের সেনাবাহিনী মুসলমানদের লশকরের উপর ব্যর্থ হামলা করে পিছু হটে এসে এগিয়ে যাচ্ছে ফারগানার দিকে। আমি খবর পেয়েছি যে, তাদের রাস্তায় যে বস্তিই আসছে, তার উপর তারা চালাচ্ছে লুটপাট। আমার ভয় হচ্ছে, তারা এ পথ দিয়ে গেলে আমাদের ভীষণ ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। আপনি এখানেই থাকুন। আমি ওই পাহাড়ে চড়ে তাদের খোঁজ নিচ্ছি।

নয়ীম বললেন, 'আমিও যাচ্ছি আপনার সাথে।'

নয়ীম ও তাতারী সরদার ছুটে চলে গেলেন পাহাড়ের চূড়ায়। সেখান থেকে দেড়ক্রোশ দূরে তাতারী লশকর আসতে দেখা গেলো। সরদার খানিকক্ষণ দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর খুশীতে উছলে উঠে বললো, 'সত্যি বলছি, ওরা এদিকে আসবে না। ওরা ভিন্ন পথ ধরেছে। খানিকক্ষণ আগেও আমি মনে করেছি যে, আপনার আগমন আমাদের জন্য এক অশুভ ইংগিত, কিন্তু এখন আমার একিন জন্মেছে, আপনি মানুষ নন, এক আসমানী দেবতা। আপনার কারামতেই এই ক্ষুধিত নেকড়ের দল আমাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছে।' এই কথা বলে সে নয়ীমের হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে নেমে গেলো নীচের দিকে। বস্তির লোকদের সে খোশখবর শোনালো। অমনি তারা সবাই চাক্ষুষ দেখবার জন্য উঠে গেলো পাহাড়ের উপর।

গোধূলির ম্লান আভা মিশে গেলো রাতের অন্ধকারে। বস্তির খানিকটা দূরে ফারগানা গামী রাস্তায় ফউজের অগ্রগতির অস্পষ্ট দৃশ্য দেখা যায়। ঘোড়ার আওয়ায ও নাকারার ধ্বনি ক্রমেই স্তিমিত হয়ে আসে। বস্তির লোকেরা আশ্বস্ত হয়ে হল্লা করে, দাপাদাপি করে, নেচে গেয়ে ফিরে এলো বস্তির দিকে।

এশার নামায শেষ করে শুয়ে পড়তেই নয়ীমের চোখে নামলো গভীর ঘুম। স্বপ্নের আবেশে মুজাহিদ আর একবার দ্রুতগামী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে তীরবৃষ্টি ও তলোয়ারের হামলা উপেক্ষা করে দুশমনের সারি ভেদ করে এগিয়ে চললেন সামনের দিকে। ভোরে উঠে নামায পড়ার পর তিনি রওয়ানা হলেন মনযিলে মকসুদের দিকে।

আরও কয়েক মনযিল অতিক্রম করে যাবার পর একদিন ইসলামী লশকরের তাঁবু নয়ীমের নযরে পড়লো। মরভ থেকে তাঁর লশকর অপ্রত্যাশিতভাবে এগিয়ে যাওয়ায় তিনি হয়রান হয়েছিলেন। তথাপি তাঁর ধারণা হলো, হয়তো তাতারীদের হামলা তাদেরকে সময়ের আগেই এগিয়ে যেতে বাধ্য করেছে।

কুতায়বা বিন মুসলিম বাহেলী তাঁর প্রিয় সালারকে জানালেন সাদর অভ্যর্থনা। অন্যান্য সালাররাও তাঁর আগমনে অসীম আনন্দ প্রকাশ করলেন।

নয়ীমকে অনক প্রশ্ন করা হলো। তার জওয়াবে তিনি সংক্ষেপে শোনালেন তার পর কাহিনী। তার নয়ীম কয়েকটি প্রশ্ন করলেন কুতায়বা বিন মুসলিমের কাছে। জওয়াবে তিনি জানালেন যে, কুতায়বা তাতারীদের পরাজিত করে নাযযাকের পিছু ধাওয়া করছেন।

রাতের বেলায় কুতায়বা বিন মুসলিম তাঁর সালার ও মন্ত্রণাদাতাদের মজলিসে অগ্রগতির বিভিন্ন পরামর্শ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। নয়ীম তাকে বুঝালেন যে, ইবনে সাদেক তার নতুন চক্রান্তের কেন্দ্র করে তুলবে এবার ফারগানাকে। তাই তার অনুসরণ করতে দেরী করা উচিত হবে না।

ভোরবেলা সেনাবাহিনীর অগ্রগতির জন্য নাকারা বেজে উঠলো। কুতায়বা সেনাদলকে দু'ভাগে বিভক্ত করে এগিয়ে যাবার জন্য দু'টি ভিন্ন রাস্তা নির্দেশ করে দিলেন। অর্ধেক ফউজের নেতৃত্ব থাকলো তাঁর নিজের উপর আর বাকী অর্ধেকের নেতৃত্ব সোপর্দ করলেন তাঁর ভাইয়ের উপর। নয়ীম ছিলেন দ্বিতীয় দলের শামিল। পথ-ঘাটের খুঁটিনাটি সব ব্যাপারে নয়ীমের জানা আছে বলেই কুতায়বার ভাই তাঁকে রাখলেন অগ্রগামী সেনাদলে।

নার্গিস এক পাথরের উপর বসে ঝরণার স্বচ্ছ পানি নিয়ে খেলছে। ছোট ছোট কাঁকর তুলে সে ছুঁড়ে ফেলছে পানিতে, তারপর কি করে তা ধীরে ধরে পানির তলায় চলে যাচ্ছে, তাই সে দেখছে আপন মনে। একটি কাঁকর এমনি করে তলায় গিয়ে পৌঁছলে সে আর একটি ছুঁড়ে মারছে পানির উপর। কখনো বা তার মন এ খেলা থেকে সরে গিয়ে নিবিষ্ট হচ্ছে সামনের ময়দানের দিকে। ময়দানের বিস্তীর্ণ প্রসারের শেষে ঘন গাছপালার সবুজ লেবাসে ঢাকা পাহাড়রাজি দণ্ডায়মান। এসব পাহাড়ের পরেই উঁচু উঁচু পাহাড়ের সফেদ বরফ ঢাকা চূড়াগুলো পড়ে নজরে। বসন্ত মওসুমের সূচনা করে মুশ্ককর হাওয়া বইতে শুরু করেছে। ডান দিকে সেব গাছ আর আঙ্গুর লতায় ফল ধরতে শুরু করেছে।

নার্গিস তার আপন চিন্তায় বিভোর, অমনি পেছন থেকে যমররুদ নিঃশব্দ পদক্ষেপে এসে পাথর তুলে মারলো পানির উপর। উছলে ওঠা পানির ছিটা এসে পড়লো নার্গিসের কাপড়ের উপর। নার্গিস ঘাবড়ে গিয়ে তাকালো পেছন দিকে। যমররুদ অট্টহাস্যে ফেটে পড়লো, কিন্তু নার্গিসের দিক থেকে কোন সাড়া এলো না। যমররুদ হাসি সংযত করে মুখের উপর নার্গিসেরই মতো গাম্ভীর্য টেনে এনে তার কাছে এসে বসলো।

'নার্গিস! আমি তোমায় আজ বহুত খুঁজছি। এখানে কি করছো তুমি?'

'কিছুই না।' নার্গিস একহাতে পানি নিয়ে খেলতে খেলতে জওয়াব দিলো।

'তুমি আর কতকাল এমনি করে তিলে তিলে জান দেবে। তোমার দেহ যে আধখানা হয়ে গেছে। কি রকম পাণ্ডুর হয়ে গেছো তুমি।'

'যমরুদ! বার বার আমায় বিরক্ত করো না। যাও।'

'আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করতে আসিনি, নার্গিস! তোমায় দেখে আমি কতটা পেরেশান হয়েছি, তা' খোদাই জানেন।'

যমররুদ নার্গিসের গলায় বাহু বেষ্টন করে তার মাথাটা টেনে নিয়ে বুকে চেপে ধরলো। নার্গিসও এক রুগ্ন বাচ্চার মত তার কাছে নিজকে সমর্পণ করে দিলো।

'হায়! আমি যদি তোমার জন্য কিছু করতে পারতাম!' যমররুদ নার্গিসের পেশানীর উপর হাত বুলাতে বুলাতে বললো। নার্গিসের চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। ব্যাথাতুর কণ্ঠে সে বললো, 'আমার যা হবার, হয়ে গেছে। পাহাড় -চূড়ার মুগ্ধকর দৃশ্য আমি দেখেছি, কিন্তু দুর্গম পথের চিন্তা করিনি। যমরুদ! উনি আমার জন্য নন। আমি তাঁর যোগ্যই নই। তাঁর সম্পর্কে কোনও নালিশও নেই আমার। হয়তো আমার মতো হাজারো মেয়ে তাঁর পায়ের ধূলাকে চোখের সুরমা বানাবার জন্য উদগ্রীব। কিন্তু....কেন তিনি এলেন এখানে? যদি এলেন তো কেন চলে গেলেন? কেন তাঁকে দেখেই আমি এমন বেকারার—এমন পেরেশান হলাম? আমি তাঁকে সব কিছুই খুলে বলতাম, কিন্তু তাঁর কোন্ শক্তি আমার যবানকে এমন করে দাবিয়ে রাখলো? তিনি আমাদের থেকে অনেক খানি স্বতন্ত্র, জেনে-শুনেও কেন আমি নিজকে তাঁর পায়ে সঁপে দিতে চেষ্টা করলাম? এ পরিণামের ভয় আমি করেছি, কিন্তু হায়! ভয় যদি আমায় ফিরিয়ে রাখতো! যমরুদ! ছোটবেলা থেকেই আমি স্বপ্ন দেখেছি আসমান থেকে এক শাহ্যাদা নেমে আসবেন, আমি তাঁর কাছে দীল-যান সমর্পন করে দিয়ে আপনার করে নেবো তাঁকে। আমার শাহ্যাদা এলেন, কিন্তু তাঁকে আমি আপনার করে নিতে পারিনি ভয়ে। যমরুদ! এও কি এক স্বপ্ন? এ স্বপ্নের কি কোন অর্থ আছে? যমরুদ! যমরুদ!! আমার কি হলো? তুমি কি এখনও বলবে, আমি সবর করিনি? হায়, সবর করবার ক্ষমতা যদি আমার থাকতো!'

'নার্গিস! প্রত্যেক স্বপ্নের সাফল্যের সময় ঠিক থাকে। অনন্ত হতাশার মধ্যেও ইনতেযার আর উম্মীদ হবে আমাদের শেষ অবলম্বন। খোদার কাছে দো'আ করো। এমনি বিলাপ করে কোন ফায়দা নেই। ওঠ, এবার ঘুরে আসিগে'।

নার্গিস উঠে যমরুদের সাথে সাথে চললো। কয়েক কদম চলতেই ডান দিকে এক সওয়ারকে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে দেখা গেলো। সওয়ার তাদের কাছে এসে ঘোড়া থামালেন। তাঁকে দেখে যমররুদ চীৎকার করে বললো, 'নার্গিস! নার্গিস!! তোমার শাহ্যাদা এলেন!' নার্গিস নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তার দীলের রাজ্যের বাদশাহ্ তার সামনে দাঁড়িয়ে। সে তার চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না যেনো। অন্তহীন খুশী অথবা অন্তহীন বিষাদের ভিতরে মানুষ যেমন নিশ্চল হয়ে যায়, নার্গিসের অবস্থাও তাই। ঘুমের ঘোরে স্বপ্নাবেশে চলবার মত দু'তিন কদম সামনে গিয়েই সে পড়ে গেলো যমিনের উপর। নয়ীম তখখুনি ঘোড়া থেকে নেমে নার্গিসকে ধরে তুললেন।

'নার্গিস! কি হলো তোমার?'

'কিছু না।' নার্গিস চোখ খুলে নয়ীমের দিকে তাকিয়ে জওয়াব দিলো।

'আমায় দেখে ভয় পেলে তুমি?'

নার্গিস কোন জওয়াব না দিয়ে নয়ীমের দিকে তাকিয়ে রইলো একদৃষ্টে। এতো কাছে থেকে তাঁকে দেখা তার প্রত্যাশার অতীত, কিন্তু নয়ীম তার অবস্থা সম্পর্কে আশ্বস্ত হয়ে দু'তিন কদম দূরে সরে দাঁড়ালেন। নার্গিস তার আঁচলে আসা ফুলের বিচ্ছেদ বরদাশত করতে পারলো না। তার দেহের প্রতি শিরা উপ-শিরায় জাগলো এক অপূর্ব কম্পন। নারীসুলভ সংকোচের বাঁধা কাটিয়ে সে এগিয়ে গিয়ে মুজাহিদের পায়ের উপর ঝুঁকলো।

নয়ীমের সংযম বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে। তিনি নার্গিসের বাযু ধরে তুলে যমরুদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যমরুদ! একে ঘরে নিয়ে যাও।'

নার্গিস একবার নয়ীমের দিকে, আবার যমররুদের দিকে তাকাতে লাগলো। তার চোখ থেকে নামলো অশ্রুর বন্যা। সে মুখ ফিরিয়ে নিলো অপর দিকে। তারপর একবার নয়ীমের দিকে ফিরে তাকিয়ে ধীরে ধীরে পা ফেলে ঘরের দিকে চললো। নয়ীম যমরুদের দিকে তাকালেন। সে দাঁড়িয়ে আছে একই জায়গায়।

নয়ীম বিষণ্ণ স্বরে বললেন, 'যাও যমরুদ, ওকে সান্ত্বনা দাওগে।'

যমরুদ জওয়াব দিলো, 'কেমন সান্ত্বনা? আপনি এসে ওর শেষ অবলম্বনটুকুও ভেঙে চুরমার করে দিলেন। এর চাইতে না আসাইতো ছিলো ভালো।'

'আমি হুমানের সাথে দেখা করতে এসেছি। সে কোথায়?'

'সে গেছে শিকার করতে।'

'তা হলে ঘর পর্যন্ত যাওয়া আমার পক্ষে নিরর্থক। হুমানকে আমার সালাম দিয়ে বলবে, নিরুপায় বলেই আমি দেরী করতে পারিনি। আমাদের ফউজ এগিয়ে যাচ্ছে ফারগানার দিকে।'

কথাটি বলেই নয়ীম ঘোড়ায় সওয়ার হলেন, কিন্তু যমরুদ এগিয়ে গিয়ে ঘোড়ার বাগ ধরে বললো, 'আমি মনে করেছিলাম, আপনার চাইতে নরমদীল মানুষ আর নেই, কিন্তু আমার ধারণা ভুল। আপনি মাটির তৈরী নন, আর কোন জিনিষের তৈরী। এখন বদনসীবের দেহে জানটুকুও বাকী রইলো না।'

'যমরুদ! ওদিকে তাকাও!' নয়ীম একদিকে ইশারা করে বললো। যমরুদ তাকিয়ে দেখলো, এক শলকর এগিয়ে আসছে।

'হয়তো কোন ফউজ আসছে।' সে বললো।

নয়ীম বললেন, 'ওই যে আমাদেরই ফউজ আসছে। আমি হুমানের সাথে কয়েকটা কথা বলবার জন্য ফউজের আগে চলে এসেছিলাম।'

যমরুদ বললো, 'আপনি দেরী করুন। সে আজ রাত্রেই এসে পড়বে হয়তো।'

'এ মুহূর্তে আমার দেরী করা অসম্ভব। আমি আবার আসবো। নার্গিসের দীলে হয়তো কোন ভুল ধারণা পয়দা হয়েছে আমার সম্পর্কে। তুমি গিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিও।

ওর দীল এতটা কমজোর, তা জানতাম না। ওকে আশ্বাস দিও যে, আমি নিশ্চয়ই আসবো। ওর দীলের খবর আমি জানি।'

'কথায় যতোটা সম্ভব, আমি ওকে সান্ত্বনা দিয়ে থাকি আগে থেকেই, কিন্তু এখন হয়তো ও আমার কথায় বিশ্বাস করবে না। হায়! আপনি নিজের মুখে যদি ওকে একটি কথা বলেও সান্ত্বনা দিতেন! এখন যদি আপনি ওর জন্য কোন নিশানী দিতে পারেন, তাহলে হয়তো ওকে সান্ত্বনা দিতে পারবো।'

নয়ীম এক লহমা চিন্তা করে জেব থেকে রুমাল বের করে দিলেন যমররুদের হাতে। তারপর বললেন, 'এটা ওকে দিও।'

বস্তির লোকেরা ফউজ আসার খবরে ঘাবড়ে গিয়ে এদিক ওদিক পালাতে লাগলো। নয়ীম ঘোড়া ছুটিয়ে তাদের কাছে গিয়ে বললেন যে, কোন বিপদের কারণ নেই। তারা আশ্বস্ত হয়ে নয়ীমের আশেপাশে জমা হতে লাগলো। তিনি ঘোড়া থেকে নেমে তাদের প্রত্যেকের কাছে গিয়ে আলাপ করতে লাগলেন ঘনিষ্ঠ হয়ে। ইতিমধ্যে ফউজ এসে পৌঁছলো বস্তির কাছে। ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বিচিত্র আকর্ষণ! বস্তির লোকেরা নয়ীমের সাথে গেলো ইসলামী ফউজকে অভ্যর্থনা জানাতে। নয়ীম সিপাহ্সালারের সাথে প্রত্যেকের পরিচয় করিয়ে দিলেন। ফউজের লক্ষ্যের সাথে পরিচিত হবার পর কতক লোক জিহাদে যাবার আকাংক্ষা প্রকাশ করলো। সিপাহ্সালার তখনি তৈরী হয়ে নেবার হুকুম দিলেন তাদেরকে। এদের মধ্যে সব চাইতে বেশী আগ্রহ নার্গিসের চাচা বারমাকের। যিন্দেগীর পঞ্চাশটি বসন্ত ঋতু অতিক্রম করে আসার পরও তার সুগঠিত দেহ ও অটুট স্বাস্থ্য অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। বস্তির নয়া সিপাহীদের প্রস্তুতির জন্য খানিকক্ষণ দেরী করতে হল ফউজকে।

খানিকক্ষণ পর বিশজন সিপাহী তৈরী হয়ে এলে ফউজকে এগিয়ে চলবার হুকুম দেওয়া হলো। বস্তির মেয়েরা ফউজের অগ্রগতির দৃশ্য দেখবার জন্য এসে জমা হলো এ পাহাড়ের উপর। নয়ীম সবার আগে অগ্রগামী দলের পথনির্দেশ করে চলেছেন। নার্গিস ও যমররুদ আর সব মেয়েদের দল থেকে আলাদা হয়ে ফউজের আরও কাছে দাঁড়িয়ে পরস্পর কথা বলে যাচ্ছে। নার্গিসের হাতে নয়ীমের রুমাল।

'নার্গিস, তোমার শাহ্যাদা তো সত্যি শাহ্যাদা হয়েই বেরিয়েছেন।' নয়ীমের দিকে ইশারা করে যমররুদ বললো।

নার্গিস জওয়াব দিলো, 'আহা! তিনি যদি সত্যি আমার হতেন।!'

'তোমার এখনও একিন আসছে না'?

'একিন আসছে, আবার আসছে না। গভীর হতাশার মধ্যে যখন একবার আশার প্রদীপ নিভে যায়, তখন তাকে আর একবার জ্বেলে নেওয়া বড়ই মুশকিল। সত্যি বললে তোমার কথায়ও পুরোপুরি একিন আসে না আমার। যমররুদ! সত্যি করে বলো তো, তুমি আমার সাথে ঠাট্টা তো করছো না!'

'না, তোমার একিন না এলে ওঁকেই ডাকো'। এখনও বেশী দূরে যাননি। কেমন?'

'না, যমররুদ, কসম খাও।'

'কোন্ কসম খেলে তুমি বিশ্বাস করবে?'

'তোমার শাহ্যাদার কসম খাও।'

'কোন শাহ্যাদার?'

'হুমানের।'

'যে সে আমার শাহ্যাদা, তা তোমায় কে বললো?'

'তুমিই বলেছো'

'কবে?'

'যে দিন সে ভালুক শিকার করতে গিয়ে যখমী হয়ে ফিরে এলো, আর তুমি সারা রাত জেগে কাটালে।'

'তাতে তুমি কি আন্দায করলে'?

'যমররুদ! আচ্ছা, আমার কাছ থেকে কি গোপন করবে তুমি? এমন মুহূর্ত আমারও কেটেছে। উনিও যে যখমী হয়ে এসেছিলেন, তা তোমার মনে নেই?'

'আচ্ছা, তা হলে আমি ওর কসম খেলে তুমি বিশ্বাস করবে?'

'হয়তো করবো।'

'আচ্ছা, হুমানের কসম করেই বলছি, আমি ঠাট্টা করছি না।'

'যমররুদ! যমররুদ!!' নার্গিস তাকে বুকে চেপে ধরে বললো, 'তুমি আমায় বারংবার সান্ত্বনা না দিলে হয়তো আমি মরেই যেতাম! উনি কবে আসবেন, কেন জিজ্ঞেস করলে না তুমি?'

'উনি খুব শিগ্গীরই আসবেন।'

যদি শিগ্গীরই না আসেন, তাহলে .... তাহলে?' নার্গিস ঘাবড়ে গিয়ে প্রশ্ন করলো।

যমররুদ সলজ্জভাবে বললো, 'তাহলে আমি তোমার ভাইকে পাঠিয়ে দেবো ওঁকে নিয়ে আসতে।'

এগারো

ছয় মাস কেটে গেলো, কিন্তু নয়ীম আসেন না। ইতিমধ্যে কুতায়বা নাযযাককে কতল করে তুর্কিস্তানের বিদ্রোহের ধূমায়িত অগ্নিশিখা অনেকখানি ঠান্ডা করে এনেছেন। নাযযাকের যবরদস্ত সমর্থক শাহে জর্জানও নিহত হয়েছেন। এই অভিযান শেষ করে কুতায়বা সুগদের বাকী এলাকা জয় করতে গিয়ে পৌঁছলেন সিস্তানে। সেখান থেকে আবার উত্তর দিকে এগিয়ে গেলেন খারেযম পর্যন্ত। খারেযম-শাহ জিযিয়া দেবার ওয়াদা করে শান্তি স্থাপন করলেন। খারেযম থেকে খবর পাওয়া গেলো যে, সমরকন্দবাসীরা চুক্তিভংগ করে চালিয়ে যাচ্ছে বিদ্রোহের প্রস্তুতি।

কুতায়বা ফউজের কয়েকটি দল সাথে নিয়ে হামলা করলেন সমরকন্দের উপর এবং শহর অবরোধ করলেন। বোখারার মতই সুদৃঢ় প্রাচীর ও মযবুত কেল্লা এ শহরটিকেও নিরাপদ করে রেখেছিলো। কুতায়বা আত্মবিশ্বাস সহকারে অবরোধ জারী রাখলেন।

তিন মাস কেটে যাবার পর শাহে-শমরকন্দ পাঠালেন শান্তির আবেদন। জওয়াবে কুতায়বা সন্ধির শর্ত লিখে পাঠালেন। বাদশাহ্ শর্ত মনযুর করে নিলে শহরের দরজা খুলে দেওয়া হলো।

সমরকন্দের এক মন্দিরে ছিলো এক মহাসম্মানিত প্রস্তরমূর্তি। লোকে বলতো, সে মূর্তির গায়ে কেউ হাত লাগালে তার মৃত্যু সুনিশ্চিত। কুতায়বা মন্দিরে ঢুকে 'আল্লাহু আকবার' তক্‌বীর ধ্বনি করে একই আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিলেন সে ভয়ংকর মূর্তিকে। মূর্তির পেট থেকে বেরুলো পঞ্চাশ হাজার মিস্‌কাল সোনা। কুতায়বা যখন এমনি সাহসের পরিচয় দিয়েও দেবতার রোষ থেকে নিরাপদ রইলেন, তখন সমরকন্দের বেশুমার লোক পড়লো কালেমায়ে তওহীদ।

কুতায়বা বিন্ মুসলিম বিজয় ও খ্যাতির সর্বোচ্চ সীমায় পৌছে গেলেন। হিজরী ৯৫ সালে তিনি অভিযান চালালেন ফার্‌গানার দিকে। বহু শহর তিনি জয় করলেন। এরপর তিনি ইসলামী ঝান্ডা উড়িয়ে পৌছলেন কাশগড় পর্যন্ত। এর পরেই চীন সীমান্ত।

কাশগড় থেকে কুতায়বা শুরু করলেন চীন আক্রমণের প্রস্তুতি। চীনের শাহ্ কুতায়বার উদ্যোগ আয়োজনের খবর পেয়ে এক দূত পাঠিয়ে শান্তি আলোচনার জন্য একদল দূত প্রেরণের আবেদন জানালেন। দূত-দলের কর্তব্য পালনের যোগ্য মনে করে কুতায়বা হুবায়রা ও নয়ীম ছাড়া আরও পাঁচজন অভিজ্ঞ অফিসারকে মনোনীত করলেন চীন যাবার জন্য।

চীনের বাদ্‌শার দূতাবাসে হুবায়রা, নয়ীম ও তাঁদের সাথীরা এক মনোরম গালিচার উপর বসে আলাপ আলোচনা করছেন।

'কুতায়বাকে কি খবর পাঠান যায়?' হুবায়রা নয়ীমের কাছে প্রশ্ন করলেন, 'চীনের বাদশার লশ্‌কর আমাদের মোকাবিলায় অনেক বেশি। আপনি লক্ষ্য করেছেন, কতটা গর্ব সহকারে তারা আমাদের সামনে এসেছে!'

নয়ীম জওয়াবে বললেন, 'শাহে ইরানের চাইতে বেশি ক্ষমতা-গর্বিত নয় এরা। ক্ষমতার দিক দিয়েও এরা তাঁর চাইতে বড় নয়। এখানকার আরামপিয়াসী ভীতু সিপাহীরা আমাদের ঘোড়ার খুরের দাপটেই ভয় পেয়ে পালাবে। আমাদের শর্ত পেশ করে দিয়েছি আমরা, তার জওয়াবের ইন্তেযার করুন। আপাততঃ কুতায়বাকে লিখে দিন যে, চীন জয়ের জন্য নতুন ফউজের প্রয়োজন হবে না। লড়াই যদি করতেই হয়, তাহলে তুর্কিস্তানে যে ফউজ মওজুদ রয়েছে, এদেশ জয় করার জন্য তারাই হবে যথেষ্ট।'

এক সভাসদ কামরায় প্রবেশ করে নত মস্তকে হুবায়রা ও তাঁর সাথীদের সালাম জানিয়ে বললেন, 'জাহাঁপনা আর একবার আপনাদের সাথে আলাপ করতে চাচ্ছেন।'

হুবায়রা জওয়াব দিলেন, 'আপনি গিয়ে বাদশাহকে বলেন, আমাদের শর্তে কোন রদবদল করবো না আমরা। আমাদের শর্ত মনযুর না হলে আমাদের মধ্যে তলোয়ার দিয়েই বিরোধ মীমাংসা হবে।'

'জাহাঁপনা শর্ত ছাড়া আরও কিছু জানতে চান আপনাদের কাছে। আপনাদের মধ্যে একজনকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবার হুকুম হয়েছে আমার উপর। অতদূর থেকে ধন-দৌলতের আকাংক্ষায় লুটপাট করতে করতে আপনারা এখানে এসেছেন, তাই জাহাঁপনা আপনাদেরকে কিছু ধন-দৌলত উপহার দিয়ে বন্ধুর মত বিদায় করতে চান। আরও তিনি কিছু জানতে চান আপনাদের দেশ ও কওম সম্পর্কে।'

নয়ীম তাঁর তলোয়ার সভাসদকে দিয়ে বললেন, 'এখানি নিয়ে যান। এ আপনাদের বাদশার যে কোন সওয়ালের জওয়াব দেবে।'

'আপনার তলোয়ার?' সভাসদ হয়রাণ হয়ে বললেন।

'হাঁ, আপনার বাদশাহকে বলবেন, এই তলোয়ারের মুখেই আমাদের কওমের তামাম ইতিহাস লেখা হয়েছে, এবং তাঁকে আরও বলবেন যে, তাঁর তামাম ধন-ভান্ডারকে আমরা মুজাহিদের ঘোড়ার পায়ের ধুলার সমানও মনে করি না।'

সভাসদ লজ্জিত হয়ে বললেন, 'জাহাঁপনার মক্‌সুদ আপনাদের নারায করা নয়। আপনাদের সাহসের তারিফ করেন তিনি। আপনারা আর একবার মোলাকাত করুন, আমার বিশ্বাস, তার ফল ভালই হবে।'

হুবায়রা নয়ীমকে আরবী জবানে বললেন, 'বাদশাহকে আর একবার সুযোগ দেওয়া আমাদের উচিত। আপনি গিয়ে তবলীগ করুন।'

নয়ীম জওয়াব দিলেন, 'আপনি আমার চাইতে বেশি অভিজ্ঞ।'

'আমি আপনাকে পাঠাচ্ছি, তার কারণ, আপনার জবান ও তলোয়ার-দুই-ই সমান তীক্ষ্ণধার। আপনার আলাপ আমার চাইতে বেশি কার্যকরী হবে।'

শুনে নয়ীম উঠে সভাসদের সাথে চললেন।

দরবারে প্রবেশের আগে এ শাহী গোলাম সোনার পাত্রে একটি বহুমূল্য পোষাক নিয়ে হাযির হলো, কিন্তু নয়ীম তা পরিধান করতে অস্বীকার করলেন। সভাসদ বললেন, 'আপনার কামিয বড়ই পুরানো। আপনি বাদশার দরবারে যাচ্ছেন।'

নয়ীম জওয়াব দিলেন, 'এ সব দামী লেবাস আপনাদেরকে বাদশার দরবারে মাথা নত করতে বাধ্য করে, কিন্তু আপনি দেখবেন, আমার পুরানো জীর্ণ কামিয আমায় আপনাদের বাদশার সামনে মাথা নীচু করতে দেবে না।'

নয়ীমের মোটা শক্ত চামড়ার জুতোজোড়াও ধূলি-মলিন। এক গোলাম নুয়ে পড়ে রেশমী আপড় দিয়ে তা সাফ করে দিতে চাইলো। নয়ীম তার বাযু ধরে তুলে দিয়ে কিছু না বলেই এগিয়ে চললেন।

চীনের বাদশাহ তাঁর পত্নীকে সাথে নিয়ে এক সোনার তখতে সমাসীন। তাঁর পান্ডুর মুখের উপর বার্ধক্যের রেখা সুস্পষ্ট। তাঁর পত্নী যদিও অর্ধবয়সী তথাপি তাঁর সুডৌল মুখের উপর অতীত যৌবনের বিগত বসন্তের রূপের আভাস এখনো মিলিয়ে যায়নি। তিনি ফারগানার শাহী খান্দানের সাথে সম্পর্কিত। চীনা নরীদের তুলনায় তাঁর মুখশ্রী অধিকতর কমনীয়। রাজ্যের ওলী আহাদের গলায় জওয়াহেরাতের এক বহুমূল্য মালা। বাদশার ডান দিকে একদল সুন্দরী পরিচারিকা শারাবের জাম ও সোরাহী নিয়ে দন্ডায়মান। তাদের মাঝখানে হুসনেআরা নামী এক ইরানী নর্তকী। রূপলাবণ্যে সে

অপর পরিচারিকাদের থেকে অসামান্যা। তার দীর্ঘ সোনালী কেশদাম ছড়িয়ে আছে কাঁধের উপর দিয়ে। তার মাথায় সবুজ রঙের এক রুমাল। গায়ে কালো রঙের কামিয। কোমরের উপর দিকে তা দেহের সাথে এমন আঁটসাঁট হয়ে আছে যে, তার উন্নত বক্ষযুগল সুস্পষ্টভাবে নযরে পড়ে। নীচে উজ্জ্বল রঙের ঢিলা পাজামা। হুসনেআরা আর সব মেয়েদের তুলনায় উঁচু।

নয়ীম বিজয়ী বেশে দরবারে প্রবেশ করলেন। তিনি বাদশাহ ও দরবারীদের দিকে দৃষ্টি হেনে 'আস্সালামু আলাইকুম' বললেন।

বাদশাহ দরবারীদের দিকে আর দরবারীরা বাদশার দিকে তাকাতে লাগলেন। সালামের জওয়াব না পেয়ে নয়ীম তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালেন বদশাহের দিকে। বদশাহ মুজাহিদের তেজোব্যঞ্জক দৃষ্টির সামনে দৃষ্টি অবনত করলেন। ওলী আহাদ আসন ছেড়ে উঠে নয়ীমের দিকে হাত বাড়ালেন। নয়ীম তাঁর সাথে মোসাফেহা করে তাঁর ইশারায় একটি খালি কুরসিতে বসে পড়লেন।

বাদশাহ তাঁর পত্মীর দিকে তাকিয়ে তাতারী যবানে বললেন, 'এ লোকগুলোকে দেখে আমি কৌতুক অনুভব করি। এঁরাই এসেছেন আমাদের জয় করতে। এঁর লেবাসটা দেখে নাও।'

নয়ীম জওয়াব দিলেন, 'সিপাহীর শক্তি তার লেবাস দিয়ে আন্দায করা যায় না, তা আন্দায করতে হয় তার তলোয়ারের তেজ ও বাযুর কুওৎ দেখে।'

চীনের বাদশার ধারণা, নয়ীম তাতারী যবান জানেন না, কিন্তু জওয়াব পেয়ে তিনি পেরেশান হলেন। তিনি বললেন, 'শাবাশ। তুমি তাতারী যবানও জানো দেখছি। নওজোয়ান! তোমার সাহসের প্রশংসা করি আমি, কিন্তু তোমাদের শক্তি-পরীক্ষার জন্য আর কোন প্রতিদ্বন্দী বাছাই করে নিলেই হয়তো ভালো হতো তোমাদের জন্য চীন সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারীকে তুর্কিস্তনের ক্ষুদ্র শাসকদের সমকক্ষ মনে করে তোমরা ভুল করছো। আমার বিদ্যুৎ গতি অশ্ব তোমাদের গর্বিত শির ধূলোয় পিষে দিবে। তোমরা যা কিছু হাতে পেয়েছো, তাই নিয়ে খুশী থাক। এমনও তো হতে পারে যে, চীন জয় করতে গিয়ে তুর্কিস্তানও হারিয়ে ফেলবে তোমরা।

নয়ীম জোশের সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি ডান হাত তলোয়ারের হাতলের উপর রেখে বললেন, 'গর্বিত বাদশাহ! এ তলোয়ার ইরান ও রুমের শাহানশাহদেরকে মিশিয়ে দিয়েছে মাটিতে। এ আঘাত সহ্য করবার ক্ষমতা নেই আপনাদের। আপনাদের ঘোড়া ইরানীদের হাতীর চাইতে বেশি শক্তিশালী নয়।'

নয়ীমের কথা শুনে দরবারে স্তব্ধতা ছেয়ে গেলো। বাদশাহ একটুখানি মাথা নাড়লেন। অমনি হুসনেআরা এগিয়ে এসে শারাবের জাম পেশ করে আবার গিয়ে দাঁড়ালো নিজের জায়গায়।

এক পরিচারিকা হুসনেআরার কানের কাছে চুপি চুপি বললো, 'জাহাঁপনার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হচ্ছে। এ নওজোয়ান সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।'

হুসনেআরা মনোমুগ্ধকর হাসি সহকারে নয়ীমের দিকে তাকিয়ে বললো, 'এর বাহাদুরী বেঅকুফীর সীমানা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের সাহসের মূল্য কি, তা জানা নেই ওর।'

বাদশাহ কয়েক ঢোক শারাব গিলে নয়ীমের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নওজোয়ান! আমি আর একবার তোমার সাহসের তারিফ করছি। আজ পর্যন্ত কেউ সাহস করেনি আমার দরবারে এত বড়ো কথা বলতে। আমরা তোমাদের ধর্মকে ভয় পেয়ে যাব, মনে করা ঠিক হবে না। তোমাদের বাহাদুরীর পরীক্ষাও হবে, কিন্তু আমি জানতে চাই, দুনিয়ার সব শান্তিপূর্ণ সালতানাতে কেন তোমরা পয়দা করছো অশান্তি। হুকুমাতের লোভ থাকলে আগেই তো তোমরা বহুদূর প্রসারিত সালতানাতের মালিক হয়েছো। দৌলতের লালসা থাকলে আমরা তোমাদের অনেক কিছুই দেবো খুশী হয়ে। সোনা চাঁদি দিয়ে ভরে দিলেও আমাদের ধনভাণ্ডারে দৌলতের কমতি হবে না। যা খুশী, তোমরা চেয়ে নাও।'

নয়ীম জওয়াব দিলেন, 'আমরা আমাদের শর্ত পেশ করেছি। আপনি আমাদের সম্পর্কে ভুল ধারণা করছেন। দুনিয়ায় বিশৃংখলা পয়দা করতে আমরা আসিনি, কিন্তু এমন শান্তির সমর্থক আমরা নই, যাতে অসহায় কমযোর মানুষ শক্তিমানের যুলুম নীরবে সয়ে যেতে বাধ্য হয়। সারা দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা কায়েম করতে চাই এক বিশ্বজয়ী কানুন—যাতে শক্তিমানের হাত কমযোরকে আঘাত দিতে পারবে না, মনিব ও গোলামের প্রভেদ থাকবে না, বাদশাহ আর তাঁর প্রজাদের মধ্যে থাকবে না কোন দূরত্ব। এই কানুনই হচ্ছে ইসলাম। দৌলত ও হুকুমাতের লোভ নেই আমাদের, বরং দুনিয়ার পাশব শক্তির হাত থেকে মযলুম মানবতার হারানো অধিকার ফিরিয়ে আনবার জন্যই এসেছি আমরা। আপনি হয়তো জানেন না, দুনিয়ার বিস্তীর্ণতম হুকুমাতের মালিক হয়েও আমাদের নযর নেই দুনিয়ার ঐশ্বর্য-আড়ম্বরের দিকে।'

নয়ীম কথা শেষ করে বসলেন। দরবারে আর একবার স্তব্ধতা ছেয়ে গেলো।

হুসনেআরা তার পাশের পরিচারিকাকে বললো, 'এই সুদর্শন নওজোয়ানকে দেখে আমার মনে জাগে দয়া। যিন্দেগী এর কাছে ভার হয়ে এসেছে, মনে হয়। জাহাঁপনার একটি মাত্র মামুলী ইশারা ওকে নীরব করে দেবে চিরদিনের জন্য, কিন্তু আমি দেখে হয়রাণ হচ্ছি, জাহাঁপনা আজ প্রয়োজনের চাইতে বেশি দয়ার পরিচয় দিচ্ছেন। দেখি, এর পরিণাম কি হয়। এমনি ভরা-যৌবনে মৃত্যুর পথ খোলাসা করা কতো বড়ো নির্বুদ্ধিতা।'

নয়ীমের কথার মধ্যে বাদশাহ দু'একবার চঞ্চল হয়ে উঠে এপাশ- ওপাশ করেছেন এবং কোন জওয়াব না দিয়ে তামাম দরবারীর মুখের দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করেছেন। তারপর তাঁর পত্নীর কাছে চীনা ভাষায় কি যেনো বলে নয়ীমের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমরা এ ব্যাপার নিয়ে আবার আলোচনা করবো। আজ আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক কিছু অবাঞ্ছিত আলোচনা হয়েছে। আমার ইচ্ছা, মজলিসে কিছুটা আনন্দ পরিবেশন করা হোক।' বলে বাদশাহ হুসনেআরার দিকে হাত দিয়ে ইশারা করলেন। হুসনেআরা এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে গেলো দরবারীদের মাঝখানে। নয়ীমের দিকে তাকিয়ে সে হেসে ফেললো। তার পা দুটি নৃত্য-চঞ্চল হয়ে উঠতেই সে দু'টি হাত প্রসারিত করলো দু'দিকে। রেশমী পর্দার পেছন থেকে জেগে উঠলো বিচিত্র বাদ্য-ধ্বনি। স্তিমিত সুরের সাথে সাথে হুসনেআরা ধীরে ধীরে পা ফেলে তখতের কাছে এসে দুই জানুর উপর ভর

করে বসে পড়লো। বাদশাহ্ সামনে হাত বাড়ালে হুসনেআরা সসম্ভ্রমে তাতে চুমু খেলো এবং উঠে ধীরে ধীরে পিছনে সরে যেতে শুরু করলো। বাদ্য -বাজনার আওয়াজ সহসা উঁচু হয়ে উঠলো। হুসনেআরা বিজলী-চমকের মতো দ্রুতগতিতে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগলো। তার দেহের প্রতিটি অংগ-প্রত্যংগ কেমন যেন নাযুক ও মুগ্ধকর হয়ে দেখা দিলো। কখনও সে মাথা নত করে তার দীর্ঘ কেশদাম ছড়িয়ে দিচ্ছে সুন্দর মুখের উপর, আবার মাথায় নাড়া দিয়ে তা সরিয়ে নিচ্ছে পিঠের উপর এবং মুখখানিকে আবরণমুক্ত করে দর্শকদের মুগ্ধ বিস্ময় লক্ষ্য করে হাসছে। কখনও সে তার সুডোল সফেদ বাহু মাথার উপর উঁচু করে ধরে আহত ফণিনীর মতো দোলাচ্ছে। নৃত্যের তালে কখনও সে এগুচ্ছে সামনে, আবার পিছিয়ে যাচ্ছে। কখনও কখনও কোমরে হাত রেখে সে সামনে ও পেছনে এতটা ঝুঁকছে, যেনো তাঁর চুলগুলো যমিন ছুঁয়ে যায়। তার প্রতিটি অংগভংগী যেনো বিজলীর বিচিত্র খেলা। নেচে নেচে সে এক সোনার ফুলদানীর কাছে গিয়ে একটি গোলাপ তুলে নিয়ে গেলো নয়ীমের কাছে। তারপর তাঁর সামনে বসে পড়লো দুই জানুর উপর। নর্তকীর কার্যকলাপে তখন তাঁর বুক কাঁপছে। তাঁর কান ও গালে অনুভূত হচ্ছে একটা তীব্র জ্বালা। নর্তকী ফুলটি তার ঠোঁট লাগিয়ে দু'হাতে নিয়ে এগিয়ে ধরলো নয়ীমের সামনে। নয়ীম চোখ তুলছেন না দেখে সে হাত দু'টি আরও এগিয়ে দিলো। এবার তার আঙুল গিয়ে তাঁর বুক স্পর্শ করলো। নয়ীম তার হাত থেকে ফুলটি নিয়ে ছুঁড়ে ফেললেন নিচে এবং তখখুনি উঠে দাঁড়ালেন। নর্তকী অস্থিরভাবে ঠোঁট কামড়ে উঠে দাঁড়ালো এবং মুহূর্তের জন্য নয়ীমের দিকে রোষ দীপ্ত চাউনী হেনে ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেলো দরযার রেশমী পর্দার পিছনে। হুসনেআরা চলে যেতেই বাদ্য-বাজনার আওয়ায বন্ধ হয়ে গেলো। দরবারে নেমে এলো গভীর নিস্তব্ধতা।

বাদশাহ্ বললেন, 'এ নৃত্য-গীত বুঝি আপনার ভালো লাগলো না?'

নয়ীম জওয়াবে বললেন, 'আমাদের কানে কেবল সেই সুরই ভালো লাগে, যা তলোয়ারের ঝংকার থেকে পয়দা হয়। আমাদের তাহ্যীব নারীকে নৃত্য করবার অনুমতি দেয় না। নামাযের সময় হয়ে এলো। আমার এখখুনি যেতে হচ্ছে-' বলে নয়ীম লম্বা লম্বা পা ফেলে দরবার থেকে বেরিয়ে গেলেন। হুসনেআরা দরযায় দাঁড়িয়ে। নয়ীমকে আসতে দেখে সে মুখ ফিরিয়ে নিলো বিরক্তির সাথে। নয়ীম বেপরোয়া হয়ে বেরিয়ে গেলেন। হুসনেআরার মনে আর একবার জাগলো পরাজয়ের অনুভূতি।

'অতি তুচ্ছ তুমি। তোমায় আমি অন্তর দিয়ে ঘৃণা করি।' নয়ীমের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করে সে বললো তাতারী যবানে, কিন্তু নয়ীম একবার পিছু ফিরেও তাকালেন না! সে তখন আপন মনে গর্জাতে লাগলো নিষ্ফল আক্রোশে। নয়ীম চলে গেলে সে ফিরে গেলো হতাশ হয়ে। যিন্দেগীতে এই প্রথমবার সে মাথা নীচু করে চললো।

রাতের বেলায় নয়ীম বিছানায় পড়ে ঘুমোবার নিষ্ফল চেষ্টা করছেন। তাঁর সাথীরা গভীর নিদ্রামগ্ন। কামরায় জ্বলছে অনেকগুলো মোমবাতি। দিনের ঘটনাগুলো বার বার তাঁর মস্তিষ্কে এসে তাঁকে পেরেশান করে তুলছে। হুসনেআরার কল্পনা বার বার চিন্তার গতি ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নার্গিসের দেশে। দু'জনের চেহারায় কতো মিল। পার্থক্য শুধু এই যে, হুসনেআরা সুন্দরী এবং সৌন্দর্যের অনুভূতিও রয়েছে তার মনে। কিন্তু সে অনুভূতি এমন বিপজ্জনক রূপ নিয়েছে তার ভিতরে যে, সে তার পুরোপুরি সুযোগ নিতে গিয়ে বঞ্চিত করেছে আপনাকে পবিত্রতা ও নিষ্পাপ সৌন্দর্য থেকে। তার রূপে-তার আকৃতিতে আন্তরিকতার পরিবর্তে প্রধান্য লাভ করেছে লালসা চরিতার্থ করবার অদম্য স্পৃহা।

আর নর্গিস? নার্গিস প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক সরল, নিষ্পাপ ও অকৃত্রিম প্রতিচ্ছবি। বার বার নয়ীমের মনে পড়ে নার্গিসের কাছ থেকে তাঁর শেষ বিদায়ের দৃশ্য। নয়ীমের কাছে নার্গিস তার মনের যে পরিচয় দিয়েছে, তা তিনি আজও ভোলেননি। তিনি জানেন, নার্গিসের নিষ্পাপ দীলের গভীরে তিনি পয়দা করেছেন মুহাব্বতের তুফান।

গত কয়েক মাসে কতোবার তাঁর মনে জেগেছে নার্গিসকে আর একবার দেখা দেবার ওয়াদা পূরণ করবার দূরন্ত সাধ, কিন্তু মুজাহিদের উদ্দীপনায় তা চাপা পড়ে গেছে প্রতিবার। প্রত্যেক বিজয় তাঁর সামনে খুলে দিয়েছে নতুন অভিযানের পথ। নয়ীম প্রত্যেক নয়া অভিযানকে শেষ অভিযান মনে করে নার্গিসের কাছে যাবার ইরাদা মুলতবী রেখেছেন প্রতিবার। কিন্তু তাঁর নির্বিকার ঔদাসিন্যের কারণ শুধু তাই নয়। নয়ীমের অবস্থা সেই মুসাফিরের মতো, দীর্ঘ সফরের পথে যে তার মূল্যবান ও জরুরি পাথেয় ডাকাতের হাতে সমর্পণ করে এমন হতাশ হয়ে যায় যে, অবশিষ্ট সামান্য জিনিসগুলোকে নিজের হাতে পথের ধুলোয় ফেলে দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে শূন্য হাতে।

জোলায়খার মৃত্যু আর উযরার কাছ থেকে চিরদিনের বিচ্ছেদ দুনিয়ার সুখ, শান্তি ও আরাম শব্দগুলোকে করে তুলেছে নয়ীমের কাছে অর্থহীন। যদিও নার্গিসের সাথে তাঁর শেষ মোলাকাত এ শব্দগুলোকে আবার কিছুটা অর্থপূর্ণ করে তুলেছে, কিন্তু সে অর্থের গভীরতা তাতে ডুবে যাবার মতো যথেষ্ট নয়। নার্গিসকে তিনি যেমন করে চান, তাতে তার নৈকট্য ও দূরত্ব একই কথা। তথাপি নার্গিসের কথা ভাবতে ভাবতে কখনও কখনও তাঁর মনে হয়, সেই তাঁর যিন্দেগীর শেষ অবলম্বন। তার কাছ থেকে চিরদিনের জন্য বিচ্ছেদের কল্পনা তাঁর কাছে কতো ভয়ংকর!

বিছানায় শুয়ে শুয়ে তাঁর মনে চিন্তা জাগে, খোদা জানেন, নার্গিস কি অবস্থায় কি ধারণা নিয়ে তাঁর পথ চেয়ে রয়েছে। যদি সে ... যোলায়খা... অথবা উযরার মতো, ... না, না, খোদা যেনো তা না করেন। নার্গিসের সম্পর্কে হাজারো চিন্তা নয়ীমকে পেরেশান করে তোলে, আর তিনি সান্ত্বনা দেন নিজের দীলকে।

মানুষের স্বভাব, যখন সে গোড়ার দিকে কোনো গৌরবময় সাফল্যের অধিকার লাভ করে, হতাশার ভয়াবহ গভীরতার ভিতরেও সে তখন জ্বালিয়ে রাখে আশার দ্বীপ-শিখা। কিন্তু গোড়াতেই যে লোক ব্যর্থতার চরমে পৌছে গেছে, সে তো কোনো কিছুকেই বানাতে পারে না তার আশার কেন্দ্রস্থল, আর যদি তা পারেও তথাপি লক্ষ্য অর্জনের প্রত্যয় সত্ত্বেও সে আশ্বস্ত হয় না। হাজারো বিপদের কল্পনা ছাড়া এক পা'ও সে এগুতে পারে না গন্তব্য লক্ষ্যের পথে, আর লক্ষ্য অর্জনের পরও তার অবস্থা হয় এক দেউলিয়া

মানুষেরই মতো-যে পথের মাঝে জওয়াহেরাতের স্তূপ পেয়েও মালদার হবার খুশির পরিবর্তে পুনরায় সর্বস্ব হারানোর ভয়ে থাকে বিব্রত।

হাজারো চাঞ্চল্যকর চিন্তায় ঘাবড়ে গিয়ে নয়ীম ঘুমোবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু দীর্ঘ সময় এপাশ ওপাশ করেও ঘুম এলো না। বেকারার হয়ে তিনি পায়চারী করতে লাগলেন কামরার মধ্যে। পায়চারী করতে করতে তিনি কামরার বাইরে এসে দেখতে লাগলেন চাঁদের মুগ্ধকর স্নিগ্ধ রূপ।

মহলের অপর দিকে এক সুদৃশ্য কামরায় হুসনেআরা আবলুস কাঠের এক কুরসীতে বসে বসে তার দেবতাদের কাছে অভিযোগ জানাচ্ছে নয়ীমের কার্যকলাপের। তার পরিচারিকা মারওয়ারিদ সামনে এক গালিচায় বসে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। হুসনেআরার দীলের মধ্যে এখনও জ্বলছে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার অদম্য অগ্নিশিখা।

'একি সম্ভব যে, সে আমার চাইতে বেশি সুন্দরী কোনো নারীকে দেখেছে? ভাবতে ভাবতে কুরসী থেকে উঠে সে প্রাচীরের গায়ে লাগানো একটা বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের রূপ দেখে নিলো এবং কামরার মধ্যে পায়চারী করতে লাগলো। মারওয়ারিদ একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখতে লাগলো তার কার্যকলাপ।

'আপনি আজ ঘুমোবেন না' মারওয়ারিদ প্রশ্ন করলো।

'যতক্ষণ সে আমার পায়ে এসে না পড়বে, ততক্ষণ ঘুম নেই আমার।'

বলে হুসনেআরা আরও খানিকটা দ্রুত পায়ে ঘুরতে লাগলো এদিক ওদিক। মারওয়ারিদ উঠে কামরার খিড়কী দিয়ে তাকিয়ে রইলো পাইন বাগিচার দিকে। আচানক তার নযরে পড়লো, একটি লোক বাগিচায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাতের ইশারায় হুসনেআরাকে কাছে ডেকে সে বাগিচার দিকে ইশারা করে বললো, 'দেখুন! বিলকুল আপনারই মত বেকারার হয়ে কে যেন পায়চারী করছে বাগিচায়।'

হুসনেআরা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। লোকটি গাছের ছায়া থেকে বেরিয়ে এলে চাঁদের পূর্নরৌশনী যখন তাঁর মুখের উপর পড়লো, তখন হুসনেআরা নয়ীমকে চিনে ফেললো। হুসনেআরার বিষণ্ন মুখে খেলে গেলো একটা হাসির রেখা।

'মারওয়ারিদ আমি এখখুনি আসছি'-বলে হুসনেআরা কামরার বাইরে চলে গেলো এবং দেখতে দেখতে বাগিচায় গিয়ে নয়ীমকে দেখতে লাগলো এক গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে। নয়ীম যখন ঘুরতে ঘুরতে সেই গাছের কাছে এলেন, অমনি হুসনেআরা এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালো গাছের আড়াল থেকে। নয়ীমও চমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি হয়রান হয়ে তাকাতে লাগলেন তার দিকে।

'আপনি ঘাবড়ে গেলেন? আমি দুঃখিত।'

'তুমি কি করে এখানে এলে?'

'আমিও আপনার কাছে তাই জানতে চাচ্ছি।' হুসনেআরা আরো এক কদম এগিয়ে এসে বললো।

'আমার তবিয়ৎ ভালো ছিলো না।'

'খুব! তাহলে আপনারও তবিয়ৎ বিগড়ে যায়! আমি তো ভেবেছিলাম আপনি বুঝি আমাদের মতো মানুষ থেকে আলাদা ধরনের। তবিয়ৎ বিগড়ে যাবার কারণটা জানতে পারি কি?'

'তোমার প্রত্যেকটি সওয়ালেরই জওয়াব দিতে হবে, এটা তো আমি জরুরী মনে করছি না।' বলে নয়ীম চলে যেতে চাইলেন।

তার চোখের যাদুতে আকৃষ্ট হয়ে নয়ীম রাতের বেলা এমনি পায়চারী করে বেড়াচ্ছেন, হুসনেআরা এই ধারণা নিয়ে এসেছে, কিন্তু তার সে ধারণা কেমন যেনো ভুল হয়ে গেলো। এ ঘৃণা, না মুহাব্বত? সে যাই হোক, হুসনেআরা সাহস করে সামনে এগিয়ে এসে নয়ীমের পথ রোধ করে দাঁড়ালো। নয়ীম অপর দিক দিয়ে চলে যেতে চাইলেন, কিন্তু সে তার জামার এক প্রান্ত ধরে ফেললো। নয়ীম ফিরে বললেন, 'কি চাও তুমি?'

হুসনেআরার মুখে জওয়াব যোগায় না। তার ঠোঁট কাঁপতে থাকে। তার সকল গর্ব সে ঢেলে দিয়েছে মুজাহিদের পায়ে। নয়ীম তার কম্পিত হাত থেকে জামার প্রান্তটি ছাড়িয়ে একটি কথাও না বলে দ্রুত পায়ে চলে গেলেন তাঁর কামরার দিকে।

হুসনেআরা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। লজ্জায় তার দেহে ঘাম বেরিয়ে এসেছে। ঘাম মুছে ফেলে রাগে কাঁপতে কাঁপতে সে চলে গেলো নিজের কামরায়। আয়নায় আর একবার নিজের মুখ দেখে নিয়ে রাগে শারাবের একটা সোরাহী ছুঁড়ে মারলো আয়নার উপর।

'জংলী কোথাকার! আমি কেন ওর পায়ে পড়তে গেলাম?' বলে আর একবার সে কামরার মধ্যে তেমনি পায়চারী করতে লাগলো বেকারার হয়ে। 'আমি কেন ওর পায়ে পড়লাম! কেন আমি ওর কাছে গেলাম!' বলতে বলতে হুসনেআরা ভাঙ্গা আয়নার একটা টুকরা তুলে মুখ দেখে নিজের মুখের উপর এক চাপড় মারলো। তারপর নয়ীম ছাড়া গোটা দুনিয়াকে গাল দিতে দিতে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলো ফুঁপিয়ে।

এ ঘটনার এক মাস পর নয়ীম কাশগড় পৌঁছে কুতায়বার কাছ থেকে ছয় মাসের ছুটি নিলেন। আরব ও ইরানের যেসব মুজাহিদ ছুটি নিয়ে দেশে যাচ্ছে, নয়ীম হলেন তাদের সফরের সাথী। নয়ীমের পুরানো দোস্ত ওয়াকি ছিলেন এই ক্ষুদ্র কাফেলায় শামিল। নয়ীম তাঁর কাছে খুলে বলেছিলেন দীলের কথা। কয়েক মনযিল অতিক্রম করে নয়ীম কাফেলা থেকে আলাদা হয়ে যেতে চাইলে সাথীরা জানালো যে, তারা তাঁকে মনযিলে মকসুদে পৌঁছে দিয়ে যাবে।

নার্গিস এক পাহাড়-চুড়ায় বসে উঁচু উঁচু পাহাড়ের মুগ্ধকর রূপ দেখছে। যমররুদ তাঁকে দেখে পাহাড়-চুড়ায় ছুটে এলো।

'নার্গিস, নার্গিস!!'

নার্গিস উঠে যমরুরুদকে দেখে তার সাড়া দিয়ে বসে পড়লো।

'নার্গিস! নার্গিস!!' যমরুরুদ কাছে আসতে আসতে আবার ডাকলো।

'নার্গিস, উনি এসেছেন! তোমার শাহ্যাদা এসেছেন!'

পাহাড়ের মাটি আচানক সোনা হয়ে গেলেও নার্গিস হয়তো এতেটা হয়রান হতো না। সে তার কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। যমরুরুদ আবার একই কথা বললো, 'তোমার শাহ্যাদা এসে গেছেন!

নার্গিসের মুখ খুশীর দীপ্তিতে ঝলমল করে উঠলো। সে উঠলো, কিন্তু বুকের ধড়ফড়ানি ও দেহের কম্পন সংযত করতে না পেরে বসে পড়লো আবার। যমরুরুদ এগিয়ে এসে দু'হাতে তাকে ধরে তুললো। তারা দু'জন আলিংগনা বদ্ধ হলো।

'আমার স্বপ্ন সফল হলো।' নার্গিস লম্বা লম্বা শ্বাস ফেলে বললো।

'নার্গিস! আমি আরও এক খোশখবর এনেছি।'

'বলো যমরুরুদ, বলো। এর চাইতে বড় খোশখবর আর কি হতে পারে?'

'আজ তোমার শাদী।'

'আজ! ... না!'

'নার্গিস, এখখুনি।'

নার্গিস দ্রুত এক পা পিছিয়ে দাঁড়ালো। তার আনন্দ-দীপ্ত মুখ আবার পাণ্ডুর হলো। সে বললো, 'যমরুরুদ! এ ধরনের ঠাট্টা ভাল নয়।'

'না, না, তোমার শাহ্যাদার কসম, তিনি এসে গেছেন। এসেই তিনি তোমার কথা জানতে চেয়েছেন। আমি সব কিছু বলেছি তাঁকে। তাঁর সাথে এসেছেন এক বৃদ্ধ। তিনি চুপিচুপি তোমার ভাইকে কি যেনো বললেন, আর তোমার ভাই আমায় পাঠালো তোমার খোঁজে। হুমানকে আজ খুব খুশী দেখাচ্ছে। চলো নার্গিস!'

নার্গিস যমরুরুদের সাথে পাহাড় থেকে নীচে নামলো। যমরুরুদ খুব দ্রুত গতিতে চলছে, কিন্তু নার্গিসের পা দু'টি কাঁপছে। সে বললো, 'যমরুরুদ! একটু ধীরে চলো। অত তাড়াতাড়ি চলতে পারছি না আমি।'

গাঁয়ের বহুলোক এসে জমা হয়েছে হুমানের ঘরে। ওয়াকি নয়ীম ও নার্গিসের নিকাহ্ পড়ালেন। দুল্হা-দুল্হিনের উপর চারদিক থেকে হলো পুষ্পবৃষ্টি।

যমরুরুদ এক কোণে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রয়েছে হুমানের দিকে। হুমানের মুখ খুশির দীপ্তিতে উজ্জ্বল। এক বৃদ্ধ তাতারীর কানের কাছে সে কি যেনো বললো। আর বৃদ্ধ তাতারী যমরুরুদের বাপের কাছে গিয়ে বললো কয়েকটি কথা। যমরুরুদের বাপ সম্মতি জানালে সে এসে হুমানকে ধরে নিয়ে গেলো খিমার বাইরে।

'আজই?' যমরুরুদের বাপ বললেন।

'যদি আপনার আপত্তি না থাকে।'

'বহুত আচ্ছা! আমি ঘরে গিয়ে পরামর্শ করে আসছি।' যমরুরুদের বাপ ঘরে চলে গেলেন।

সন্ধ্যার খানিকক্ষণ আগে সব লোক যমরুরুদের ঘরে এসে জমা হলো। হুমান ও যমরুরুদের নিকাহ্ পড়াবার ভারও পড়লো ওয়াকির উপর।

দুল্হিনকে হুমানের ঘরে আনা হলে যখন নার্গিস ও যমরুরুদ নির্জন আলাপের সুযোগ পেলো, তখন নার্গিস একটি ছোট্ট চামড়ার বাক্স খুললো।

'যমরুরুদ! তোমার শাদীর দিনে আমি তোমায় একটি উপহার দিতে চাচ্ছি।' বলে সে নয়ীমের দেওয়া রুমালখানি বের করে তার হাতে দিয়ে বললো, 'এই মুহূর্তে এর চাইতে দামী আর কিছু নেই আমার কাছে।'

যমরুরুদ বললো, 'তোমার শাহ্যাদা না এলে এতটা মহৎ প্রাণের পরিচয় দিতে না তুমি।'

নার্গিস যমরুরুদকে বুকে চেপে ধরে বললো, 'যমরুরুদ! এখনো আমার খোশনসীবের কল্পনা করতে ভয় পাই আমি। আজকের সবগুলো ঘটনা যেন একটা স্বপ্ন।'

যমরুরুদ হেসে বললো, 'যদি সত্যি সত্যি এটা একটা স্বপ্ন হয়?'

'তাহলে আমি সে মন-ভোলান স্বপ্ন ভংগের পর বেঁচে থাকতে চাইবো না।' নার্গিস জওয়ার দিলো।

ওয়াকি আর তাঁর সাথীরা সেখানেই রাত কাটালেন। ফজরের নামাযের পর তাঁরা তৈরী হলেন সফরের জন্য। বিদায় বেলায় নয়ীম বললেন, তিনিও শিগগীরই পৌছবেন বসরায়।'

হুমানের ঘরের যে কামরায় কিছুকাল আগে নয়ীম অপরিচিত মেহমান ছিলেন, আজ নার্গিস ও তাঁর থাকার জায়গা হলো সেই কামরায়। নয়ীমের কাছে এ বস্তি আজ জান্নাতের প্রতিরূপ। দুনিয়ার সব কিছুই তাঁর কাছে আজ আগের চাইতে বেশী মুগ্ধকর। ফুলের ঘ্রাণ, হাওয়ার মর্মরধ্বনি, পাখীদের কলগুঞ্জন-সব কিছুই প্রেম ও মিলনের এক সুর-মূর্ছনায় বিভোর।

বারো

খলিফা ওয়ালিদের হুকুমাতের শেষভাগে ভূমধ্যসাগর থেকে শুরু করে কাশগড় ও সিন্ধু পর্যন্ত মুসলমানদের বিজয় ঝাণ্ডা উড্ডীন হয়েছিলো। ইসলামী ইতিহাসের তিনজন সিপাহ্সালার পৌছে গিয়েছিলেন খ্যাতি ও যশের সর্বোচ্চ শিখরে। পূর্বদিকে মুহাম্মদ বিন্ কাসিম সিন্ধু নদের কিনারে ডেরা ফেলে হিন্দুস্তানের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড জয়ের প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

কুতায়বা কাশগড়ের এক উঁচু পাহাড়-চূড়ায় দাঁড়িয়ে ইনতেযার করছিলেন দরবারে খিলাফত থেকে চীন সাম্রাজ্যের দিকে এগিয়ে যাবার হুকুমের জন্য।

পশ্চিমে মুসার লশ্কর চেষ্টা করছিলো ফিরেনিজের পাহাড়শ্রেণী অতিক্রম করে ফ্রান্সের সীমানায় প্রবেশ করবার, কিন্তু হিজরী ৯৪ সালে খলিফা ওয়ালিদের মৃত্যু ও তাঁর স্থলে খলিফা সুলায়মানের অভিষেকের খবর ইসলামী বিজয়-অভিযানের নকশা বদলে দিলো। বহুদিন ধরে সুলায়মানের দীলের মধ্যে জ্বলছিলো খলিফা ওয়ালিদ ও তাঁর সহকারীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও প্রতিশোধের আগুন। খলিফার মস্নদে বসেই তিনি

ডেকে পাঠালেন ওয়ালিদের প্রিয় সিপাহ্‌সালারদের। হাজ্জাজ বিন্ ইউসুফের জন্য তিনি কঠিনতম শাস্তি নির্ধারিত করে রাখলেন, কিন্তু যিন্দেগীর দুঃখময় দিন আসবার আগেই তিনি দুনিয়া ছেড়ে গেলেন। হাজ্জাজের মৃত্যুতেও সুলায়মানের সিনা ঠাণ্ডা হলো না। চাচার উপর তার প্রতিহিংসার ফল ভাতিজার উপর ফললো। মুহাম্মদ বিন্ কাসিমকে সিন্ধু থেকে ডেকে এনে কঠিন পীড়ণের পর হত্যা করা হলো। মুসার খেদমতের বদলায় তাঁর সর্বস্ব বাজেয়াফ্‌ত করা হলো এবং তাঁর নওজোয়ান পুত্রের মস্তক ছেদন করে তাঁর সামনে পেশ করা হলো। এই নৃশংস যুলুমে ইব্‌নে সাদেক ছিলো সুলায়মানের ডান হাত। এই বৃদ্ধ শৃগাল ঝড়-ঝঞ্জার হাজারো আঘাত খেয়েও হিম্মৎ হারায়নি। খলিফা ওয়ালিদের মৃত্যু তার কাছে ছিলো এক আনন্দের বার্তা। হাজ্জাজ আগেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। তাঁর প্রিয়জনদের কাউকে কয়েদ করা হলো, আর কাউকে পাঠানো হলো মৃত্যুর দেশে। দুনিয়ায় ইব্‌নে সাদেকের আর কোনো আশংকা রইলো না। সে তার নির্জন আবাস থেকে বেরিয়ে এসে হাজির হলো সুলায়মানের দরবারে। সুলায়মান তাঁর পুরানো দোস্তকে চিনতে পেরে তাকে যথেষ্ট সমাদর করলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই ইব্‌নে সাদেক হলো খলিফার প্রধান মন্ত্রণাদাতাদের অন্যতম।

মুহাম্মদ বিন্ কাসিমের সম্পর্কে খলিফার অন্যান্য মন্ত্রণাদাতা যখন মত দিলেন যে, তিনি নিরপরাধ এবং নিরপরাধকে হত্যা করা জায়েয নয়, তখন ইব্‌নে সাদেক এমনি খাঁটি লোকের বেঁচে থাকা তার নিজের পক্ষে বিপজ্জনক মনে করলো। সে মুহাম্মদ বিন্ কাসিমের হত্যা শুধু জায়েয নয়, জরুরী প্রমাণ করবার জন্য বললো, 'আমীরুল মুমেনিনের দুশমনের যিন্দাহ্ থাকবার কোনো অধিকার নেই। এ লোক হাজ্জাজের ভাতিজা। সুযোগ পেলেই এ ধরনের লোক বিপজ্জনক হয়ে দেখা দেবে।'

মুহাম্মদ বিন্ কাসিমের ভয়াবহ পরিণামের পর মুসার আহত দীলের উপর নুনের ছিটা দেওয়া হলো। এরপর সুলায়মান কুতায়বাকে জালে ফেলবার চক্রান্ত শুরু করলো। কুতায়বার ব্যক্তিত্ব তামাম ইসলামী সাম্রাজ্যের শ্রদ্ধা অর্জন করেছে। আরবী ও ইরানী ফউজ ছাড়া তুর্কিস্তানের নও মুসলিমরাও তাঁকে ভক্তি করতো মনে প্রাণে। সুলায়মানের মনে আশংকা জাগলো, বিদ্রোহ করে বসলে তিনি হয়ে উঠবেন তাঁর শক্তিমান প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর কার্যকলাপের ফলে যারা তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছে, তারা সবাই হবে বিদ্রোহের সমর্থক। এই মুশকিল থেকে বাঁচবার কোনো পন্থা তাঁর মাথায় এলো না। তাই তিনি ইব্‌নে সাদেকের কাছে চাইলেন পরামর্শ। ইব্‌নে সাদেক বললো, 'হুজুর! ওঁকে দরবারে হাযির হবার হুকুম পাঠিয়ে দিন। যদি আসে তো ভালো, নইলে আর কোন তরিকা অবলম্বন করা যাবে।'

'কেমন তরিকা?' সুলায়মান প্রশ্ন করলেন।

'হুজুর! সে কর্তব্য এ বান্দার উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন, ওঁকে তুর্কিস্তানেই কতল করা যাবে।'

নার্গিসের সাহচর্যে নয়ীমের কয়েক হফ্‌তা কেটে গেলো এক সোনালী স্বপ্নের মতো। উপত্যকা ও পাহাড়ের প্রতিটি প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁর মনে জাগায় এক স্বপ্নময় ভাবালুতা। তারই বর্ণচ্ছটায় বিভোর হয়ে নয়ীম ঘরে ফিরে যাবার ইরাদা কিছুদিনের জন্য মুলতবী রাখলেন, কিন্তু তাঁর দীলের এ ভাবাবেগ বেশি দিন থাকলো না। একদিন তিনি ঘুম থেকে জেগে নার্গিসকে বললেন, 'আমি এতগুলো দিন এখানে কি করে কাটিয়ে দিয়েছি, তা নিজেই ভাবতে পারি না। এখন আমার শিগগীরই চলে যাওয়া দরকার। আমাদের বস্তি এখান থেকে বহু মাইল দূরে। সেখানে গিয়ে তোমার মন কেমন করবে না তো?'

'মন কেমন করবে? হায়! আমার দীলে আপনার দেশ দেখবার কি যে আগ্রহ, আর সে পবিত্র ধূলি চোখে লাগাবার জন্য আমি কতোটা বেকারার, তা যদি আপনি জানতেন!'

'আচ্ছা, পরশু আমরা এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাবো'। বলে নয়ীম ফজরের নামায পড়বার জন্য তৈরি হ'তে লাগলেন। ইতিমধ্যে হুমান ভিতরে প্রবেশ করলো। সে নয়ীমকে বললো যে, 'বস্তির বারমাক নামে এক সিপাহী কুতায়বা বিন্ মুসলিমের পয়গাম নিয়ে এসেছে।' নয়ীম পেরেশান হয়ে বাইরে গেলেন। বারমাক ঘোড়ার বাগ ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে ভালো খবর নিয়ে আসেনি বলে নয়ীমের মনে জাগলো সন্দেহ। নয়ীমের প্রশ্নের অপেক্ষা না করেই বারমাক বললো, 'আমার সাথে যাবার জন্য আপনি এখ্খুনি তৈরি হয়ে নিন।'

'খবর ভাল তো? নয়ীম প্রশ্ন করলেন।'

বারমাক কুতায়বার চিঠি পেশ করলো। নয়ীম চিঠি খুলে পড়লেন। তাতে লেখা রয়েছে, 'তোমায় বিশেষভাবে তাগিদ দেওয়া হচ্ছে যে চিঠি পাওয়ামাত্র সমরকন্দে পৌঁছে যাবে। আমীরুল মুমেনিনের মৃত্যুতে যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, তারই জন্য তোমায় এ হুকুম দেওয়া হচ্ছে। বিস্তারিত বিবরণ বারমাকের কাছে শুনতে পাবে।'

নয়ীম হয়রান হয়ে বারমাকের কাছে প্রশ্ন করলেন, 'সমরকন্দ থেকে বিদ্রোহের খবর আসেনি তো?'

'না।' বারমাক জওয়াব দিলো।

'তা হলে আমায় সমরকন্দে যাবার হুকুম কেন দেওয়া হলো?'

'কুতায়বা তাঁর তামাম সালারকে নিয়ে কি যেনো পরামর্শ করবেন।'

'কিন্তু তিনি তো কাশগড়ে ছিলেন।'

'না, নানা কারণে তিনি সমরকন্দ চলে গেছেন।'

'কি ধরনের কারণ?

বারমাক বললো, 'আমীরুল মুমেনিনের ওফাতের পর পরবর্তী খলিফা সুলায়মান হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নিযুক্ত বহু অফিসারকে কতল করে ফেলেছেন। মুসা বিন্ নুছায়েরের পুত্রকে ও সিন্ধু-বিজয়ী মুহাম্মদ বিন্ হাসিমকে হত্যা করা হয়েছে। আমাদের সালারকেও হুকুম দেওয়া হয়েছে দরবারে খিলাফতে হাযির হতে। তিনি সেখানে যেতে বিপদের আশংকা করছেন, কেন না খলিফার কাছ থেকে ভালো কিছুর আশা নেই। তাই

তিনি তাঁর সালারদের জমা করে পরামর্শ করতে চাচ্ছেন। তাই আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য তিনি আমায় পাঠিয়েছেন।'

নয়ীম বারমাকের কথার শেষের দিকটা মন দিয়ে শুনতে পারেন নি। মুহাম্মদ বিন্ কাসিমের কতলের খবর শোনার পর আর কোনও কথার উপর তিনি গুরুত্ব দেননি মোটেই।

অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে তিনি বললেন, 'বারমাক! তুমি বড়োই দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছো। বসো, আমি তৈরী হয়ে আসছি।'

নয়ীম ফিরে গিয়ে নামাযে দাঁড়ালেন। তাঁর বিষণ্ন মুখ দেখে নার্গিসের মনে হাজারো দুর্ভাবনা জেগে উঠেছে। নামায শেষ হোলে নার্গিস সাহস করে তাঁকে প্রশ্ন করলেন, আপনি খুবই পেরেশান হয়েছেন, দেখছি। কেমন খবর নিয়ে এলো লোকটি?'

'নার্গিস, আমরা এখখুনি সমরকন্দ চলে যাচ্ছি। তুমি জলদী তৈরী হয়ে নাও।'

নয়ীমের জওয়াবে নার্গিসের বিষণ্ন মুখ খুশীতে দীপ্ত হয়ে উঠলো। নয়ীমের সাথে থেকে যিন্দেগীর সব রকম বিপদের মোকাবিলা করবার সাহস মওজুদ রয়েছে তাঁর দীলের মধ্যে, কিন্তু যে কোনো মুসীবতে তাঁর কাছ থেকে জুদা হওয়া তাঁর কাছে মৃত্যুর চাইতেও বেশি ভয়ংকর। নয়ীমের সাথে তিনি যাচ্ছেন, এই তাঁর কাছে যথেষ্ট। কোথায় আর কি অবস্থার ভিতরে, সে সব প্রশ্নের জওয়াব পাবার চেষ্টা তাঁর কাছে অবান্তর।

❦

সমরকন্দের কেল্লার এক কামরায় কুতায়বা তার বিশ্বস্ত সালারদের মাঝখানে বসে তাঁদের সাথে আলাপ-আলোচনা করছেন। কামরার চারদিকে প্রাচীরের সাথে ঝুলানো বিভিন্ন দেশের বড় বড় নকশা। কুতায়বা চীনের নকশার দিকে ইশারা করে বললেন, আমরা আর কয়েকমাসের মধ্যে এই বিস্তীর্ণ ভূ-খন্ড জয় করে ফেলতাম, কিন্তু নয়া খলিফা আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন বড়ো দুঃসময়ে। তোমরা জানো, ওখানে আমার সাথে কেমন ব্যবহার করা হবে?

এক সালার জওয়াব দিলেন, 'মুহাম্মদ বিন কাসিমের সাথে যে ব্যবহার করা হয়েছে, তা-ই হবে।'

'কিন্তু কেন?' কুতায়বা তেজোদীপ্ত আওয়াযে বললেন, 'মুসলমানদের এখনো আমার খেদমতের প্রয়োজন রয়েছে। চীন জয় করবার আগে আমি কিছুতেই খলিফার কাছে আত্মসমর্পণ করবো না।'

কুতায়বা আবার নকশা দেখতে শুরু করলেন।

আচানক নয়ীম এসে কামরায় প্রবেশ করলেন। কুতায়বা এগিয়ে এসে তাঁর সাথে মোসাফেহা করে বললেন, 'আফসোস! তোমায় এ অসময়ে তকলীফ দেওয়া হয়েছে। একা এসেছ, না-?

বিবিকেও আমি সাথে নিয়ে এসেছি। মনে করলাম, হয়তো আমার দামেস্ক যেতে হবে।'

'দামেস্ক? না দূত হয়তো তোমায় ভুল খবর দিয়েছে। দামেস্কে তোমায় নয়, আমায় ডেকে পাঠান হয়েছে। নয়া খলিফার কেবল আমারই মস্তকের প্রয়োজন।'

'তাহলে তো আমিও যাওয়া জরুরী মনে করছি।'

'নয়ীম!' কুতায়বা সাদরে তাঁর কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'আমার বদলে তুমি দামেস্কে যাবে, এজন্য তো আমি তোমায় ডাকিনি। তোমার জান আমার কাছে আমার নিজের জানের চাইতেও প্রিয়। বরং আমি আমার প্রত্যেক সিপাহীর জান আমার নিজের জানের চাইতে মূল্যবান মনে করি। তুমি অনেকখানি বিচক্ষণ বলেই আমি তোমায় ডেকে এনেছি। আমায় কি করতে হবে, তাই আমি তোমার ও অন্যান্য অভিজ্ঞ দোস্তদের কাছে জিজ্ঞেস করতে চাই। আমীরুল মুমেনিন আমার রক্তের পিয়াসী।'

নয়ীম স্থির কণ্ঠে জওয়াব দিলেন, 'খলিফার হুকুম অমান্য করা কোন মুসলিম সিপাহীর পক্ষে শোভন নয়।'

'তুমি মুহাম্মদ বিন কাসিমের পরিণাম জেনেও আমায় দামেস্ক গিয়ে নিজ হাতে নিজের মস্তক খলিফার সামনে পেশ করতে বলছো?'

'আমার মনে হয়, খলিফাতুল মুসলেমিন আপনার সাথে হয়তো অতোটা খারাপ ব্যবহার করবেন না, কিন্তু যদি কোনো সম্ভাবনা আসেও, তথাপি তুর্কিস্তানের সব চাইতে বড়ো সিপাহ্সালারকে প্রমাণ করতে হবে যে, আমীরের আনুগত্যে তিনি কারুর পেছনে নন।'

কুতায়বা বললেন, 'মওতের ভয়ে আমি ঘাবরাই না, কিন্তু আমি অনুভব করছি যে, ইসলামী দুনিয়ায় আমার প্রয়োজন রয়েছে। চীন জয়ের আগে আমি নিজেকে মৃত্যুর মুখে সমর্পণ করে দিতে চাই না। আমি বন্দীর মৃত্যু চাই না, চাই মুজাহিদের মৃত্যু।'

'দরবারে খিলাফতের হয়তো আপনার সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকবে। খুবই সম্ভব, তা দূর হয়ে যাবে। আপাততঃ আপনি এখানেই থাকুন এবং আমায় দামেস্ক যাবার এজাযত দিন।'

কুতায়বা বললেন, 'এও কি হতে পারে যে, আমি নিজের জান বাঁচাতে গিয়ে তোমার জান বিপদের মুখে ঠেলে দেবো? তুমি আমায় কি মনে করো?'

'হাঁ' তাহলে আপনি কি করতে চান?'

'আমি এখানেই থাকবো। আমীরুল মুমেনিন যদি অকারণে আমার সাথে মুহাম্মদ বিন কাসিমের অনুরূপ আচরণ করতে চান, তা'হলে আমার তলোয়ারই আমায় হেফাযত করবে।'

'এ তলোয়ার আপনাকে দরবারে খিলাফত থেকে দেওয়া হয়েছিলো। একে খলিফার বিরুদ্ধে লাগানোর খেয়াল মনেও আনবেন না। আমায় ওখানে যাবার এযাযত দিন। আমার বিশ্বাস, খলিফা আমার কথা শুনবেন এবং আমি তাঁর ধারণা দূর করতে পারবো। আমার সম্পর্কে কোনো আশংকা মনে আনবে না। দামেস্কে আমার পরিচিত লোক কমই রয়েছে। ওখানে কোনো দুশমন নেই আমার। এক মামুলি সিপাহী হিসাবে আমি যাবো ওখানে।'

'নয়ীম, আমার জন্য কোন বিপদে পড়বার এযাযত আমি তোমায় দেবো না।'

'এ আপনার জন্য নয়। আমি অনুভব করছি, আমীরুল মুমেনিনের কার্যকলাপে ইসলামী জামা'আতের ক্ষতির আশংকা রয়েছে। আমার কর্তব্য, আমি তাঁকে এ বিপদ-সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত করে দিই। আপনি আমায় এযাযত দিন।'

কুতায়বা অন্যান্য সালারের দিকে তাকিয়ে তাঁদের মত জানতে চাইলেন। হুবায়রা বললেন, 'তামাম জিন্দেগীর কোরবানীর পর যিন্দেগীর শেষ অধ্যায়ে এসে আমরা বিদ্রোহীর তালিকায় নাম লিখাতে পারি না। নয়ীমের যবান থেকে আমরা সব কিছুই জেনেছি। আপনি ওঁকে দামেস্ক যাবার এযাযত দিন।'

কুতায়বা খানিকক্ষণ পেশানীতে হাত রেখে চিন্তা করে বললেন, 'আচ্ছা নয়ীম, তুমি যাও। দরবারে খিলাফতে আমার তরফ থেকে আরয করবে যে, আমি চীন জয়ের পরেই এসে হাযির হবো।'

'কাল ভোরেই আমি এখান থেকে রওয়ানা হবো।'

'কিন্তু তুমি এই মাত্র বললে, তোমার বিবিকে তুমি সাথে নিয়ে এসেছো। ওঁকে তুমি......'।

'ওঁকে সাথেই নিয়ে যাবো আমি।' কথার মাঝখানে নয়ীম জওয়াব দিলেন, 'দামেস্কে আমার কর্তব্য শেষ করে আমি ওঁকে ঘরে পৌছে দিয়ে আপনার খেদমতে হাযির হবো।'

পরদিন নয়ীম ও নার্গিস আরও দশজন সিপাহী সাথে নিয়ে রওয়ানা হলেন দামেস্কের পথে। বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে বার্‌মাককেও তাঁরা নিলেন সাথে করে।

দামেস্কে পৌছে নয়ীম তাঁর সাথীদের থাকার ব্যবস্থা করলেন এক সরাইখানায়। নিজের জন্য এক বাড়ি ভাড়া নিয়ে নার্গিসের হেফাযত করবার জন্য বার্‌মাককে নিযুক্ত করে খলিফার মহলে গিয়ে মোলাকাতের আবেদন জানালেন। সেখানে তাঁরএকদিন ইনতেযার করবার হুকুম হলো। পরদিন দরবারে খিলাফতে হাযির হবার আগে তিনি বার্‌মাককে বললেন, 'যদি কোনো কারণে দরবারে খিলাফতে আমার দেরী হয়ে যায় তাহলে ঘরের হেফাযত করবার ও নার্গিসের খেয়াল রাখবার ভার রইলো তোমার উপর।'

নার্গিসকেও তিনি আশ্বাস দিলেন, যাতে তাঁর অনুপস্থিতিতে তিনি ঘাবড়ে না যান। ওখানে কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই বলে তিনি বিদায় চাইলেন।

নার্গিস স্থিরকণ্ঠে জওয়াব দিলেন, 'আপনার ফিরে আসা পর্যন্ত আমি ওই উঁচু উঁচু বাড়িগুলো গুণতে থাকবো।'

নয়ীমকে কিছুক্ষণ খলিফার প্রসাদ দ্বারে প্রতীক্ষা করতে হলো। অবশেষে দারোয়ানের ইসারায় তিনি দরবারে হাযির হয়ে খলিফাকে সালাম করে দাঁড়ালেন আদবের সাথে। খলিফার ডানে বাঁয়ে কতিপয় বিশিষ্ট সভাসদ উপবিষ্ট। কিন্তু কারুর দিকেই তিনি লক্ষ্য করে দেখলেন না। খলিফা সুলায়মান বিন আবদুল মালিকের মুখে

এমন এক তেজের দীপ্তি ফুটে বেরুতো যে, অতি বড় বাহাদুর লোকও তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলবার সাহস করতেন না।

খলিফা নয়ীমের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি তুর্কিস্তান থেকে এসেছো?'

'জি হাঁ, আমীরুল মুমেনিন।'

'কুতায়বা তোমায় পাঠিয়েছেন?'

এ প্রশ্ন নয়ীমকে হয়রান করে তুললো। 'আমীরুল মুমেনিন, আমি নিজের মরযীতেই এসেছি।' তিনি জওয়াব দিলেন।

'বলো, কি বলবার আছে তোমার?'

'আমীরুল মুমেনিন, আমি আপনার কাছে আরয করতে এসেছি যে, কুতায়বা আপনার এক ওফাদার সিপাহী। হয়তো মুহাম্মদ বিন কাসিমের মতো তাঁর সম্পর্কেও আপনার মনে কোনো ভুল ধারণা হয়ে থাকবে।

সুলায়মান তাঁর কথা শুনে কুরসী থেকে খানিকটা উঁচু হয়ে উঠে ক্রোধে ঠোঁট কামড়ে আবার বসে পড়লেন। 'তুমি জানো?' খলিফা আপনার কণ্ঠস্বর বদল করে বললেন, 'তোমার মতো বেআদবের সাথে আমি কেমন করে থাকি, জানো তুমি?'

দরবারে খিলাফত থেকে একটি লোক উঠে বললো, 'আমীরুল মুমেনিন? এ মুহাম্মদ বিন কাসিমের পুরানো দোস্ত। দরবারে খিলাফতের চাইতে এর বেশী সম্পর্ক সেই অভিশপ্ত খান্দানের সাথে।'

নয়ীম বক্তার দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। সেই ইব্‌নে সাদেক!

অবজ্ঞা-মিশ্রিত হাসি সহকারে সে তাকালো নয়ীমের দিকে। নয়ীম অনুভব করলেন যে, আজদাহা আবার মুখ খুলে দাঁড়িয়েছে। এবার আজদাহা আরও তীক্ষ্ণ দাঁত বের করে এগিয়ে আসছে। নায়ীম ইবনে সাদেকের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে সুলায়মানের দিকে তাকিয়ে বললেন, ' আপনার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি আমায় সত্যভাষণে বিরত করবে না। মুহাম্মদ বিন কাসিমের মতো সিপাহী আরব মাতা বারংবার জন্ম দেবে না। হ্যাঁ, তিনি ছিলেন আমার দোস্ত, কিন্তু আমারও চাইতে বেশি তিনি ছিলেন আপনার দোস্ত। কিন্তু তাঁকে ভুল বুঝলেন আপনি। আপনি হাজ্জাজের প্রতিশোধ নিলেন তাঁর নিরপরাধ ভাতিজার উপর। আর এখন আপনি ইব্‌নে সাদেরকের মতো জঘন্য শয়তানদের ফাঁদে পড়ে কুতায়বা বিন মুসলিমের সাথেও সেই একই আচরণ করতে চাচ্ছেন। আমিরুল মুমেনিন, আপনি মুসলমানদের ভবিষ্যতকে ঠেলে দিচ্ছেন বিপদের মুখে। শুধু মুসলমানদের ভবিষ্যতই আপনি বিপন্ন করছেন না, আপনি নিজেও এক যবরদস্ত বিপদ ডেকে নিয়ে আসছেন। এ লোকটি ইসলামের পুরানো দুশমন। ওর কবল থেকে বাঁচবার চেষ্টা করুন।'

'খামোশ।' খলিফা নয়ীমের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে তালি বাজালেন। এক কোতোয়াল আর কয়েকজন সিপাহী নাংগা তলোয়ার হাতে এসে দেখা দিলো।

'নওজোয়ান, আমি কুতায়বার চাইতে বেশী করে সন্ধান করছি মুহাম্মদ বিন কাসিমের দোস্তদের। খুব ভাল হলো যে, তুমি নিজে এসে ধরা দিয়েছো। ওকে নিয়ে যাও আর ভাল করে ওর দেখাশুনা করো গে।'

সিপাহী নাংগা তলোয়ারের পাহারায় নয়ীমকে বাইরে নিয়ে গেলো। তখনো দরজায় তাঁর কয়েকজন সাথী তাঁর ইনতেযার করছে। নয়ীমকে বন্দী হতে দেখে তারা পেরেশান হলো। নয়ীম তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা জলদি ফিরে চলে যাও। বারমাককে বলবে, সে যেনো নার্গিসের কাছেই থাকে, আর কুতায়বাকে আমার তরফ থেকে বলবে তিনি যেনো বিদ্রোহ না করেন।'

কোতোয়াল বললো, 'আফসোস, আমরা আপনাদেরকে বেশি সময় কথা বলবার এজাযত দিতে পারছি না'।

'বহুত আচ্ছা।' নয়ীম কোতোয়ালের দিকে তাকিয়ে হেসে জওয়াব দিয়ে এগিয়ে চললেন।

তেরো

সুলায়মান খলিফার মসনদে সমাসীন। তাঁর মুখের উপর চিন্তার রেখা সুপরিস্ফুট। তিনি ইব্‌নে সাদেকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখনো তুর্কিস্তান থেকে কোনো খবর এলো না।'

'আমীরুল মুমেনিন! নিশ্চিন্ত থাকুন। ইনশাআল্লাহ্ তুর্কিস্তান থেকে প্রথম খবরের সাথেই কুতায়বার শির আপনার সামনে হাযির করা হবে।'

'দেখা যাক।' সুলায়মান দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন।

খানিক্ষণ পরেই এক দারোয়ান এসে আরয করলো, 'স্পেন থেকে আবদুল্লাহ্ নামে এক সালার এসে হাযির হয়েছেন।'

'হ্যাঁ, তাকে নিয়ে এসো।' খলিফা বললেন।

দারোয়ান চলে গেলে আবদুল্লাহ্ এসে হাযির হলেন।

খানিকটা উচুঁ হয়ে বসে খলিফা ডান হাতটি বাড়িয়ে দিলেন। আবদুল্লাহ্ এগিয়ে এসে খলিফার সাথে মোসাফেহা করে আদব সহকারে দাঁড়িয়ে গেলেন।

'তোমার নাম আবদুল্লাহ্?'

'জি হ্যাঁ, আমীরুল মুমেনিন।'

'স্পেন থেকে আমি তোমার বীরত্বের তারিফ শুনেছি। তোমায় অভিজ্ঞ নওজোয়ান বলে মনে হচ্ছে। স্পেনের ফউজে তুমি কবে ভর্তি হয়েছিলে?'

'আমীরুল মুমেনিন, তারিকের সাথে আমি গিয়েছিলাম স্পেনের উপকূলে। তারপর থেকে আমি ওখানেই ছিলাম এতদিন।'

'বেশ। তারিক সম্পর্কে তোমার ধারণা কি?'

'আমীরুল মুমেনিন, তিনি এক সত্যিকার মুজাহিদ।'

'আর মূসা সম্পর্কে তোমার মত?'

'আমীরুল মুনেনিন, এক সিপাহী অপর সিপাহী সম্পর্কে কোনো খারাপ মত পোষণ করতে পারে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি মুসার সমর্থক এবং তাঁর সম্পর্কে কোন খারাপ মত মুখ থেকে বের করা আমি গুনাহ্ মনে করি।'

'ইব্‌নে কাসিম সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?'

'আমীরুল মুমেনিন, তিনি এক বাহাদুর সিপাহী, এর বেশি আমি কিছু জানি না।'

'এদের প্রতি আমি কতোটা বিদ্বেষপরায়ণ, তা তুমি জানো?' সুলায়মান বললেন।

'আমীরুল মুমেনিন, আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু আমি মুনাফেক নই। আপনি আমার ব্যক্তিগত মত জানতে চেয়েছেন। তা আমি প্রকাশ করেছি।'

'আমি তোমার কথার কদর করছি। তুমি কখনো আমার বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্রে অংশ নাওনি, তাই আমি তোমায় বিশ্বাস করি।'

'আমীরুল মুমেনিন, আমায় বিশ্বাসের যোগ্যই পাবেন।'

'বহুত আচ্ছা! কস্তানতুনিয়া অভিযানের জন্য একজন অভিজ্ঞ সালারের প্রয়োজন আমাদের। ওখানে আমাদের ফউজ কোনো কামিয়াবি হাসিল করতে পারেনি। সেই জন্যই তোমায় ডেকে আনা হয়েছে স্পেন থেকে। তুমি খুব জলদী এখান থেকে পাঁচ হাজার সিপাহী নিয়ে রওয়ান হয়ে যাও কস্তানতুনিয়ার পথে।'

সুলায়মান এক নকশা নিয়ে আব্দুল্লাহকে কাছে ডেকে তাঁর সামনে খুলে ধরে লম্বা-চওড়া আলোচনা শুরু করে দিলেন।

দারোয়ান এসে এক চিঠি পেশ করলো।

সুলায়মান জলদী করে চিঠিটা পড়ে ইব্‌নে সাদেকের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'কুতায়বা কতল হয়ে গেছে। কয়েকদিনের মধ্যে তার মস্তক এসে পৌছবে এখানে।'

'মোবারক হোক।' ইব্‌নে সাদেক খলিফার হাত থেকে চিঠি নিয়ে পড়তে পড়তে বললো 'ওই নওজোয়ান সম্পর্কে আপনি কি ভেবেছেন?

'কোন নওজোয়ান?'

'কুতায়বার তরফ থেকে কিছুদিন আগে যে এখানে এসেছিলো। খুব বিপজ্জনক লোক বলে মনে হয় ওকে।'

'হ্যাঁ, তাঁর সম্পর্কেও আমি শীগ্‌গিরই ফয়সলা করবো।'

খলিফা আবার আবদুল্লাহ্‌র দিকে মনোযোগ দিলেন।

'তোমার পরামর্শ আমার কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হচ্ছে। তুমি জলদী রওয়ানা হয়ে যাও।'

'আমি কালই রওয়ানা হয়ে যাচ্ছি।' বলে আবদুল্লাহ সালাম করে বেরিয়ে পড়লেন।

আবদুল্লাহ্ দরবারে খিলাফত থেকে বেরিয়ে বেশি দূর যান নি। পেছন থেকে একটি লোক তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে তাঁকে দাঁড় করালেন। আবদুল্লাহ্ পেছনে ফিরে দেখলেন, এক সুদর্শন নওজোয়ান তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসছেন। আবদুল্লাহ তাঁকে বুকে চেপে ধরলেন।

'ইউসুফ, তুমি এখানে কি করে এলে? তুমি স্পেন থেকে এমনি করে গায়েব হয়ে গেলে যে, আর তোমার চেহারা দেখা গেল না কোনদিন।'

'এখানে আমায় কোতায়ালের চাকুরী দেওয়া হয়েছে। তোমায় দেখে খুব খুশী হয়েছি। আবদুল্লাহ্ তুমিই প্রথম ব্যক্তি, যার স্পষ্ট কথায় খলিফা রেগে যান নি।'

'কেন না আমাকে তাঁর প্রয়োজন।' আব্দুল্লাহ্ হাসিমুখে জওয়াব দিলেন, 'তুমি ওখানেই ছিলে?'

'আমি এক দিকে দাঁড়িয়েছিলাম। তুমি লক্ষ্য করোনি।' ভোরেই তুমি চলে যাচ্ছো?'

'তুমিতো শুনেছো।'

'আজ রাত্রে আমার কাছে থাকবে না?'

'তোমার কাছে থাকতে পারলে আমি খুশী হতাম, কিন্তু ভোরেই লশকরকে এগিয়ে যাবার হুকুম দিতে হবে। তাই আমার সেনাবাসে থাকাই ভালো হবে।'

'আব্দুল্লাহ, চলো। তোমার ফউজকে তৈরী থাকার হুকুম দিয়ে আসবে। আমিও তোমার সাথে যাচ্ছি। খনিক্ষণ পরেই আমরা ফিরে আসবো। এতদিন পর দেখা। অনেক কথা বলা যাবে।'

'আচ্ছা চলো।'

আব্দুল্লাহ্ ও ইউসুফ কথা বলতে বলতে সেনাবাসে প্রবেশ করলেন। আব্দুল্লাহ্ আমীরে লশ্‌করের কাছে খলিফার হুকুমনামা দিয়ে ভোরে পাঁচ হাজার সিপাহী তৈরী রাখবার নির্দেশ দিলেন। তারপর তিনি ইউসুফের সাথে ফিরে চলে এলেন শহরের দিকে।

রাতের বেলায় ইউসুফের গৃহে খানা খেয়ে আব্দুল্লাহ ও ইউসুফ কথাবার্তায় মশগুল হলেন। তাঁরা কুতায়বা বিন বাহেলীর বিজয় অভিযান সম্পর্কে আলোচনা করে মর্মান্তিক পরিণামে আফসোস প্রকাশ করলেন।

আব্দুল্লাহ প্রশ্ন করলেন, 'কুতায়বার কতলের খবরে আমীরুল মুমেনিনকে মোবারকবাদ জানালো যে লোকটি, সে কে?'

ইউসুফ জওয়াব দিলেন, 'এ লোকটি তামাম দামেস্কের কাছে এক রহস্য। ওর নাম ইব্‌নে সাদেক, এবং খলিফা ওয়ালিদ ওর মস্তকের মূল্য এক হাজার আশরাফী নির্ধারণ করেছিলেন, ওর সম্পর্কে এর বেশী আর কিছু জানা নেই আমার। খলিফার ওফাতের পর সে কোনো গোপন আবাস থেকে বেরিয়ে এসেছে সুলায়মানের কাছে। নয়া খলিফা ওকে যথেষ্ট খাতির করেন এবং বর্তমান অবস্থায় খলিফা ওর চইতে বেশী আমল দেন না আর কারুর কথায়।'

আব্দুল্লাহ্ বললেন, 'বহুদিন আগে আমি কিছু শুনেছিলাম ওর সম্পর্কে। দরবারে খিলাফতে ওর আধিপত্য মুসলমানদের জন্য বিপদের কারণ হবে। বর্তমান অবস্থায় বোঝা যাচ্ছে যে, আমাদের সামনে এক দুঃসময় আসন্ন।'

ইউসুফ বললেন, 'আমি ওর চাইতে কঠিন-হৃদয় নীচ প্রকৃতির লোক এ যাবত দেখিনি। মুহাম্মদ বিন কাসিমের মর্মান্তিক পরিণতিতে চোখের পানি না ফেলেছে, এমন লোক দেখিনি। সুলায়মান কঠিন-হৃদয় হয়েও কয়েকদিন কারুর সাথে কথা বলেন নি, কিন্তু এই লোকটিই সেদিন ছিলো যার পর নাই খুশী। আমার হাতে ক্ষমতা এলে আমি ওকে কুকুর দিয়ে খাওয়াতাম। এই লোকটি কারুর দিকে আঙ্গুলের ইশারা করলে আমীরুল মুমেনিন তাকে জল্লাদের হাতে সোর্পদ করে দেন। কুতায়বাকে কতল করবার পরামর্শ এই লোকটিই দিয়েছে এবং আজ তুমি শুনেছো সে খলিফাকে আর একজন কয়েদীর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।'

'হ্যাঁ, সে লোকটি কে?'

'তিনি হচ্ছেন কুতায়বার এক জোয়ান সালার। তাঁর কথা মনে পড়লে আমার দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। মুহাম্মদ বিন কাসিমের চাইতে তাঁর পরিণতি আরো মর্মান্তিক হবে বলে আমার ধারণা। আবদুল্লাহ্ আমার মন চায়, এ কাজ ছেড়ে দিয়ে আবার আমি গিয়ে ফউজে শামিল হই। আমার বিবেক আমায় দংশন করছে অনবরত। মুহাম্মদ বিন কাসিমকে নিয়ে আরবের তামাম বাচ্চা-বুড়ো গর্ব করেছে, কিন্তু নিকৃষ্টতম অপরাধীর প্রতিও যে আচরণ করা হয় না, তাই করা হয়েছে তাঁর সাথে। তাঁকে যখন ওয়াসতের কয়েদখানায় পাঠানো হলো, তখন তাঁর দেখাশুনা করবার জন্য আমায় হুকুম দেওয়া হলো সেখানে যেতে। আগে থেকেই ওয়াসতের হাকীম সালেহ ছিলো তাঁর রক্তপিয়াসী। সে মুহাম্মদ বিন কাসিমের উপর চালালো কঠিন নির্যাতন। কয়েকদিন পর ইবনে সাদেকও পৌছলো সেখানে। মুহাম্মদ বিন কাসিমের দীলে ব্যথা দেবার নিত্যনতুন তরিকা সে উদ্ভাবন করতো। সেই মুহূর্তটি আমি ভুলতে পারি না, কতল হবার একদিন আগে যখন মুহাম্মদ বিন কাসিম কয়েদখানার কুঠরীর ভিতরে পায়চারী করছিলেন। আমি লৌহ কপাটের বাইরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করেছিলাম তাঁর প্রতিটি কার্যকলাপ। তাঁর খুবসুরত মুখের ভাবগাম্ভীর্য দেখে আমার মন চাইতো ভিতরে গিয়ে পায়ে চুমু খেতে। রাতের বেলায় কঠিন পাহারার হুকুম ছিলো আমার উপর। আমি তাঁর অন্ধকার কুঠরীতে মোমবাতি জ্বেলে দিলাম। এশার নামাযের পর তিনি ধীরে ধীরে পায়চারী করতে লাগলেন। এক প্রহর রাত কেটে গেলে এই ঘৃণিত কুকুর ইবনে সাদেক কয়েদখানার ফটকে এসে চীৎকার শুরু করলো। পাহারাদার দরযা খুলে দিলে সাদেক আমার কাছে এসে বললো, 'আমি মুহাম্মদ বিন কাসিমের সাথে দেখা করবো।'আমি জওয়াব দিলাম 'সালেহ হুকুম দিয়েছেন তার সাথে কারুর মোলাকাতের এযাযত দেওয়া হবে না।'

সে রাগ করে বললো, 'তুমি জান আমি কে?'

আমি ঘাবড়ে গেলাম। সালেহ কিছু বলবে না বলে সে আমায় আশ্বাস দিলো। আমি বাধ্য হয়ে মুহাম্মদ বিন কাসিমের কুঠরীর দিকে ইশারা করলাম। ইবনে সাদেক এগিয়ে গিয়ে দরযা দিয়ে উঁকি মারতে লাগলো। মুহাম্মদ বিন কাসিম তখন গভীর চিন্তায় মগ্ন। তিনি তার দিকে লক্ষ্য করলেন না। অবজ্ঞার স্বরে ইবনে সাদেক বললো, 'হাজ্জাজের দুলাল, তোমার অবস্থা কি?'

মুহাম্মদ বিন কাসিম চমকে উঠে তাকালেন তার দিকে, কিন্তু মুখে কোনো কথা বললেন না।

'আমায় চিনতে পারো?' ইবনে সাদেক আবার প্রশ্ন করলো।

মুহাম্মদ বিন কাসিম বললেন, 'আপনি কে, আমার মনে পড়ছে না।'

সে বললো, 'দেখলে, তুমি আমায় ভুলে গেছো, কিন্তু আমি তোমায় ভুলিনি।'

মুহাম্মদ বিন কাসিম এগিয়ে এসে দরযার লৌহ-শলাকা ধরে ইবনে সাদেকের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখে বললেন, 'আপনাকে হয়তো কোথাও দেখেছি, কিন্তু মনে পড়ছে না'।

ইবনে সাদেক কোনো কথা না বলে তাঁর হাতের উপর নিজের ছড়ি দিয়ে আঘাত করলো এবং তাঁর মুখের উপর থুথু ফেললো।

কি আশ্চর্য! মুহাম্মদ বিন কাসিমের মুখে বিন্দুমাত্র বিরক্তির চিহ্ন দেখা গেলো না। তিনি তাঁর কামিজের প্রান্ত দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললেন, 'বুড়ো! তোমার বয়সের কোনো লোককে কখনো আমি তকলীফ দেইনি। না জেনে যদি আমি তোমায় কোনো দুঃখ দিয়ে থাকি, তাহলে আর একবার থুথু দিতে আমি তোমায় খুশী মনে অনুমতি দিচ্ছে'।—আমি সত্যি বলছি তখন মহাম্মদ বিন কাসিমের সামনে পাথর থাকলেও তা গলে যেতো। আমার মন চাইছিলো, ইবনে সাদেকের দাড়ি উপড়ে ফেলি, কিন্তু দরবারে খিলাফতের ভয় অথবা আমার বুজদীলি আমায় কিছুই করতে দিলো না। তারপর ইবনে সাদেক তাঁকে গাল দিতে দিতে চলে গেলো। মধ্যরাত্রের কাছাকাছি সময়ে আমি কয়েদখানায় ঘুরতে ঘুরতে দেখলাম, মুহাম্মদ বিন কাসিম দুই জানুর উপর বসে হাত তুলে দো'আ করছেন। আমি আর থাকতে পারলাম না। তালা খুলে আমি ভিতরে গেলাম। দো'আ শেষ করে তিনি আমার দিকে তাকালেন।

'উঠুন।' আমি তাঁকে বললাম।

'কেন ?' তিনি হয়রান হয়ে প্রশ্ন করলেন।

আমি বললাম , এ গুনাহ করবার কাজে আমি হিংসা দিতে চাই না। আমি আপনার জান বাঁচাতে চাই।'

তিনি বসতে বসতে হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার হাত ধরলেন। আমায় কাছে বসিয়ে তিনি বললেন, একে তো আমার বিশ্বাস হচ্ছে না যে, আমীরুল মুমেনিন আমায় কতল করবার হুকুম দেবেন। আর যদি তা হয়, তাহলেও কি আমি জান বাঁচাতে তোমায় বিপদের মুখে ঠেলে দেবো?'

আমি বললাম, 'আমার জানের উপর কোনো বিপদ আসবে না। আমিও আপনার সাথে চলে যাবো। আমার কাছে দু'টি অত্যন্ত দ্রুতগামী ঘোড়া রয়েছে। আমরা শিগ্‌গীরই চলে যাবো বহুদূরে। আমরা গিয়ে কুফা ও বসরার লোকদের কাছে আশ্রয় নেবো। তারা আপনার জন্য শেষ রক্তবিন্দু দিতেও প্রস্তুত। ইস্‌লামী দুনিয়ার সব বড় বড় শহর আপনার আওয়াজে সাড়া দেবে।'

তিনি হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার ধারণা আমি বিদ্রোহের আগুন জেলে দিয়ে মুসলমানদের ধ্বংসের দৃশ্য দেখতে থাকবো? না, তা হতে পারে না। এ হবে কাপুরুষতা। বাহাদুর লোকদের বাহাদুরের মৃত্যু কামনা করাই উচিত। আমি নিজের জান বাঁচাতে গিয়ে হাজারো মুসলমানের জান বিপদের মুখে ঠেলে দেবো না। তুমি কি চাও, দুনিয়া মুহাম্মদ বিন্ কাসিমকে মুজাহিদ হিসাবে স্বরণ না করে বিদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করুক?'

আমি বললাম, 'কিন্তু মুসলমানদের তো আপনার মতো বাহাদুর সিপাহীর প্রয়োজন রয়েছে।'

তিনি বললেন, 'মুসলমানদের মধ্যে তোমাদের মতো সিপাহীর অভাব হবে না। ইস্‌লামকে যারা কমবেশী করে বুঝেছে, তাদের ভিতরে শ্রেষ্ঠ সিপাহীর গুণরাজি পয়দা করে তোলা কিছু কঠিন নয়।'

আমার মুখে কথা যোগালো না। আমি উঠতে উঠতে বললাম, 'মাফ করবেন। আপনি আমার কল্পনার চাইতেও বহু উর্ধ্বে।' তিনি উঠে আমার সাথে হাত মিলিয়ে বললেন, 'দরবারে খিলাফত হচ্ছে মুসলমানদের শক্তিকেন্দ্র। তার সাথে বিশ্বাস ভংগের খেয়াল কখনো মনে এনো না।'

ইউসুফের কথা শেষ হলো। আবদুল্লাহ্‌ তার ব্যথাতুর দৃষ্টি লক্ষ্য করে বললেন, 'তিনি ছিলেন এক সত্যিকার মুজাহিদ।'

ইউসুফ বললেন, 'এখন আর একটি ব্যাপার আমার কাছে মর্মপীড়ার কারণ হয়েছে। আমি এখ্‌খুনি তোমায় বলেছিলাম কুতায়বা বিন্ মুসলিম বাহেলীর এক সালারের কথা। তার আকৃতি ও দেহাবয়ব তোমার সাথে অনেকখানি মেলে। উচ্চতায় সে তোমার চাইতে কিছুটা লম্বা। তাঁর সাথে আমার অনেকটা ভাব জন্মেছে। খোদা না করেন, যদি তাঁরও পরিণতি একই হয়, তাহলে আমি বিদ্রোহ করবো। সে বেচারার একমাত্র কসুর, তিনি কয়েকটি ভালো কথা বলেছিলেন মুহাম্মদ বিন্ কাসিম ও কুতায়বা সম্পর্কে। এখন ইব্‌নে সাদেক হর্‌রোয কয়েদখানায় গিয়ে তাঁকে দুঃখ দেয়। আমি বুঝি যে, ইবনে সাদেকের কথায় তাঁর মনে অশেষ বেদনা লাগে। আমার কাছে কতোবার তিনি প্রশ্ন করেছেন, কবে তাঁকে আযাদ করা হবে। আমার ভয় হয়, ইব্‌নে সাদেকের কথামতো খলিফা তাঁকে ছেড়ে দেবার পরিবর্তে কতল করে না ফেলেন। মুহাম্মদ বিন কাসিমের আরো কয়েকজন দোস্ত রয়েছেন কয়েদখানায় বন্দী। তাঁদের সাথে যে ব্যবহার করা হয়, তা খুবই লজ্জাজনক। সেই নওজোয়ান সালারের তাতারী বিবিও এসেছেন তাঁর সাথে। তিনি তাঁর এক আত্মীয়ের সাথে থাকেন শহরে। কয়েকদিন আগে তিনি আমায় তাঁর বিবির খবর দিয়েছেন। তার নাম সম্ভবতঃ নার্গিস। তাঁর বাড়ির কাছেই আমার খালার বাড়ি। তাঁর সাথে আমার খালার খুব ভাব জমেছে। তিনি সারা দিনই ওখানে থাকেন এবং আমায় অনুরোধ করেন তাঁর স্বামীকে বাঁচিয়ে দেবার চেষ্টা করতে। আমি কি করবো আর কি করে তাঁর জান বাঁচাবো, কিছুই ভেবে পাই না।'

আবদুল্লাহ গভীর চিন্তামগ্ন অবস্থায় ইউসুফের কথা শুনলেন। তার দীলের মধ্যে পয়দা হচ্ছে নানারকম ধারণা। তিনি ইউসুফকে প্রশ্ন করলেন, 'তাঁর আকৃতি আমার সাথে মেলে তো?'

'কিন্তু তিনি তোমার চাইতে কিছুটা লম্বা।'

'তাঁর নাম নয়ীম তো নয়?' আবদুল্লাহ্‌ বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন।

'হাঁ নয়ীম। তুমি চেনো তাকে?'

'তিনি আমার ভাই—আমার ছোট ভাই।'

'ওহ, আমি তো তা জানতাম না'!

আবদুল্লাহ মুহূর্তকাল নীরব থেকে বললেন, 'যদি তার নাম হয়ে থাকে নয়ীম, তার পেশানী আমার পেশানীর চাইতে চওড়া, তার নাক আমার নাকের চাইতে কিছুটা পাতলা, চোখ আমার চোখের চাইতে বড়, ঠোঁট আমার ঠোঁটের চাইতে পাতলা ও খুবসুরত, উচ্চতা আমার চাইতে একটু বেশি আর দেহ আমার দেহের চাইতে খানিকটা

পাতলা হয়ে থাকে, তাহলে আমি কসম খেতে পারি যে, লোকটি আমার ভাই ছাড়া আর কেউ নন। তিনি কতোদিন বন্দি রয়েছেন?'

'প্রায় দু'মাস হলো তিনি কয়েদ হয়েছেন। আবদুল্লাহ, এখন ওকে বাঁচাবার পরামর্শ করতে হবে আমাদেরকে।'

'নিজের জান বিপদের মুখে ঠেলে না দিয়ে তুমি তার জন্য কিছু করতে পারো না।' আবদুল্লাহ বললেন।

'আবদুল্লাহ, তোমার মনে পড়ে, কর্ডোভা অবরোধ কালে আমি যখন যখমী হয়ে মরতে চলেছিলাম, তখন তুমি নিজের জীবন বিপন্ন করে আমার জান বাঁচিয়েছিলে এবং তীর বৃষ্টির মাঝখানে লাশের স্তূপের ভিতর দিয়ে তুলে এনেছিলে আমায়?'

'সে ছিলো আমার ফরয। তোমার উপকার আমি করিনি।'

'আমিও একে মনে করছি আমার ফরয। একে তোমার উপকার আমি মনে করছি না।' আবদুল্লাহ খানিকক্ষণ ইউসুফের চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে রইলেন। তিনি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, ইতিমধ্যে ইউসুফের হাবশী গোলাম যেয়াদ এসে খবর দিলো, ইবনে সাদেক তার সাথে দেখা করবার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে। ইউসুফের মুখ পাণ্ডুর হয়ে গেলো। তিনি ঘাবড়ে গিয়ে আবদুল্লাহকে বললেন, 'তুমি আর এক কামরায় চলে যাও। ও যেনো সন্দেহ না করে।'

আবদুল্লাহ জলদী পিছনের কামরায় চলে গেলেন। ইউসুফ কামরার দরযা বন্ধ করে দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। তারপর যেয়াদকে বললেন, 'ওকে ভিতরে নিয়ে এসো।'

যেয়াদ চলে যাবার পরেই ইবনে সাদেক ভিতরে এলো। ইবনে সাদেক কোন রকম সৌজন্য না দেখিয়ে এসেই সরাসরি বললো, 'আপনি আমায় দেখে খুবই হয়রান হয়েছেন, না?'

ইউসুফ মুখের উপর এক অর্থপূর্ণ হাসি টেনে এনে বললো, 'এখানে কেন, যে কোন যায়গায় আপনাকে দেখে আমি হয়রান হই, আপনি তশরীফ রাখুন।'

ইবনে সাদেক কামরার চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করে পিছনের কামরার দরযার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললো, 'আজ আমি খুবই ব্যস্ত। আচ্ছা, আপনার সে দোস্ত কোথায়?'

ইউসুফ পেরেশন হয়ে বললেন, 'কোন্ দোস্ত?'

'কোন্ দোস্তের কথা জিজ্ঞেস করছি, আপনি জানেন।'

'আপনার মতো এলমে গায়েব তো আমার নেই।'

'আমার মতলব নয়ীমের ভাই আবদুল্লাহ কোথায়?'

'আপনি কি করে জানেন যে, আবদুল্লাহ নয়ীমের ভাই?'

'নয়ীমের সব খবর জানতে আমি কয়েক বছর কাটিয়ে দিয়েছি। ওর সাথে আমার কতোখানি জানাজানি, তা আপনি জানেন?'

ইউসুফ তীব্রকণ্ঠে জওয়াব দিলেন, 'তা আমি জানি, কিন্তু আবদুল্লাহর কাছে আপনার কি কাজ আমি জানতে পারি কি?'

ইবনে সাদেক বললো, 'তাও আপনি জানতে পারেন। আগে বলুন সে কোথায়?'

'আমি কি জানি? কারুর সাথে আপনার জানাজানি থাকলে আমি যে তার গোপন খবর নিয়ে বেড়াবো, এ তো জরুরী নয়।'

ইবনে সাদেক বললো, 'দরবারে খিলাফত থেকে যখন সে বেরিয়ে এলো, তখন আপনি তার সাথে ছিলেন। যখন সে সেনাবাসে গেলো, তখন আপনি তার সাথে। যখন সে ফিরে শহরে এলো, তখনো আপনি তার সাথে। আমি ভেবেছিলাম, এখনো সে আপনাদেরই সাথে রয়েছে।'

'এখানে খানা খেয়ে তিনি চলে গেলেন।'

'কখন?'

'এখখুনি।'

'কোন্ দিকে?'

'হয়তো সেনাবাসের দিকে।'

'এও তো হতে পারে যে, কয়েদখানার দিকে গেছে অথবা ভাইয়ের বিধবাকে সান্ত্বনা দিতে গেছে।'

'ভাইয়ের বিধবা? আপনার মতলব...?'

ইবনে সাদেক দাঁড়িতে হাত বুলিয়ে জওয়াব দিলো, 'আমার মতলব, কাল পর্যন্ত সে বিধবা হয়ে যাবে। আমি আপনাকে আমীরুল মুমেনিনের হুকুম শুনাতে এসেছি যে, মুহাম্মদ বিন কাসিমের তামাম দোস্তকে ভালো করে দেখা শুনা করবেন। তাদের সম্পর্কে কালই হুকুম জারী করা হবে। আর নিজের তরফ থেকে আমি আপনার খেদমতে আরয করছি, আপনি নিজের জানকে প্রিয় মনে করলে আবদুল্লাহর সাথে মিলে নয়ীমের মুক্তির ষড়যন্ত্র করবেন না।'

'আমি এরূপ ষড়যন্ত্র করতে পারি, তা আপনি কি করে বললেন? ইউসুফ ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন।

'আমি তা বিশ্বাস করি না, কিন্তু হয়তো আবদুল্লাহর দোস্তির জন্য আপনি বাধ্য হতে পারেন। আচ্ছা, আপনি কয়েদখানার পাহারায় কতো সিপাহী রেখেছেন?'

ইউসুফ জওয়াব দিলেন, 'চল্লিশজন আর আমি নিজেও যাচ্ছি ওখানে।'

'সম্ভব হলে আরো কিছু সিপাহী রাখুন, কেননা শেষ মুহূর্তে সে ফেরার হয়ে যেতে পারে।'

'এত ঘাবড়াচ্ছেন কেন আপনি? এতো একটি সাধারণ লোক। পাঁচ হাজার লোক কয়েদখানার উপর হামলা করেও তাকে ছাড়িয়ে নিতে পারবে না।'

'আমার স্বভাবই আমায় আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সচেতন করে দেয়। আচ্ছা, আমি চলে যাচ্ছি। আরো কিছু সিপাহী আমি পাঠিয়ে দেবো। আপনি তাদেরকে নয়ীমের কুঠরীর পাহারায় লাগিয়ে দিন।'

ইউসুফ আশ্বাসের স্বরে বললেন, 'আপনি আশ্বস্ত থাকুন। নতুন পাহারাদারের প্রয়োজন নেই। আমি নিজে পাহারা দেবো। আপনি এত উদ্বিগ্ন কেন?'

ইবনে সাদেক জওয়াব দিলো, 'আপনি হয়তো জানেন না, ওর মুক্তির অর্থই হচ্ছে আমার মওত। ওর গর্দানে যতোক্ষণ জল্লাদের তলোয়ার না পড়ছে, ততোক্ষণ আমি স্থির হতে পারবো না।'

ইবনে সাদেকের কথা শেষ হতেই অকস্মাত পিছনের কামরার দরযা খুলে গেলো। আবদুল্লাহ বেরিয়ে আসতে আসতে বললেন, 'আর এও তো হতে পারে যে, নয়ীমের মৃত্যুর আগেই তোমায় কবরের মাটিতে শুইয়ে দেওয়া হবে।'

ইবনে সাদেক চমকে উঠে পিছু হটলো। সে পালিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করলো, কিন্তু ইউসুফ এগিয়ে গিয়ে তার পথ রোধ করে খনজর দেখিয়ে বললেন, 'এখন তুমি যেতে পারছো না।'

ইবনে সাদেক বললো, 'তোমরা জানো, আমি কে?'

'তা আমরা ভালো করেই জানি, আর আমরা কে, তাও এখনই তোমায় জানতে হবে।' বলে ইউসুফ তালি বাজালেন। তার গোলাম যেয়াদ ছুটে এসে ঢুকলো কামরায়। তাকে দৈর্ঘ্য প্রস্থে, রূপ ও আকৃতিতে মনে হলো, যেনো এক কালো দৈত্য। তার ভুড়িটি এতো বেড়ে গেছে যে, চলবার সময়ে তার পেট উপরে নীচে থলথল করছে। বিরাট এক মোটা নাক। নীচের ওষ্ঠ এতো মোটা যে, মাড়িশুদ্ধ দাঁতগুলো দেখা যায়, আর উপরের দাঁত ওষ্ঠের তুলনায় অনেকখানি লম্বা। চোখ দুটো ছোট অথচ উজ্জ্বল। সে ইবনে সাদেকের দিকে তাকিয়ে মনিবের হুকুমের ইনতেযার করতে লাগলো।

ইউসুফ একটা রশি নিয়ে আসতে হুকুম দিলেন। যেয়াদ তেমনি তার পেট উপর-নীচে নাচিয়ে-নাচিয়ে বাইরে গিয়ে রশি ছাড়া একটা চাবুকও নিয়ে এলো।

ইউসুফ বললেন, 'যেয়াদ, ওকে রশি দিয়ে জড়িয়ে এই খুটির সাথে বেঁধে ফেলো।'

যেয়াদ আগের চাইতেও ভয়ংকর মূর্তি ধরে এগিয়ে গেলো এবং ইবনে সাদেকের বাযু ধরে ফেললো। ইবনে সাদেক খানিকটা ধস্তাধস্তি করে শক্তিমান প্রতিদ্বন্দ্বীর মুঠোর চাপে অসহায় হয়ে পড়লো। যেয়াদ তার বাযু ধরে এমন করে ঝাঁকুনি দিলো যে, সে বেহুঁশ ও নিঃসাড় হয়ে পড়লো। তারপর বেশ স্বস্তির সাথে সে তার হাতপা এক খুটির সাথে শক্ত করে বেঁধে দিলো। আব্দুল্লাহ্ জিব থেকে রুমাল বের করে তার মুখটা বেঁধে দিলেন মযবুত করে। ইউসুফ আবদুল্লাহর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'এখন আমাদের কি করতে হবে?'

আবদুল্লাহ জওয়াব দিলেন, 'সব কিছুই আমি ভেবে রেখেছি। তুমি তৈরী হয়ে আমার সাথে চলো। নয়ীমের বিবি যে বাড়িতে থাকেন, তা তোমার জানা আছে?'

'জি হ্যাঁ, সে বাড়িটা এখান থেকে কাছেই।'

'বহুত আচ্ছা। ইউসুফ, তুমি এক দীর্ঘ সফরে চলেছো। জলদী তৈরী হয়ে নাও।'

ইউসুফ লেবাস বদলী করতে ব্যস্ত হলেন এবং আবদুল্লাহ কাগজ-কলম নিয়ে জলদী এক চিঠি লিখে জিবের মধ্যে ফেললেন।

'কার কাছে চিঠি লিখছেন?'

'এ ঘৃণিত কুকুরের সামনে তা বলা ঠিক হবে না। বাইরে গিয়ে আমি সব বলবো। তোমার গোলামকে বলে দাও, আমি যা বলি, সে যেনো তেমনি করে। আজ ভোরে আমি ওকে সাথে নিয়ে যাবো।'

'আর ওর কি হবে'? ইউসুফ ইবনে সাদেকের দিকে ইশারা করে বললেন।

আবদুল্লাহ জওয়াবে বললেন, 'ওর জন্য তোমার চিন্তা করতে হবে না। তুমি যেয়াদকে বলে যাও, আমরা ফিরে আসা পর্যন্ত ওর হেফাযত করবে।...তোমার এখানে কোনো বড় কাঠের সিন্দুক আছে, যা এই বিপদজ্জনক ইঁদুরের জন্য পিঁজিরার কাজে লাগতে পারে?'

ইউসুফ আবদুল্লাহর মতলব বুঝে হাসলেন। তিনি বললেন, 'জি হ্যাঁ, পাশের কামরায় একটা বড়ো সিন্দুক পড়ে রয়েছে। তাতে ওর জন্য চমৎকার পিঁজরা হবে। এসো, তোমায় দেখাচ্ছি।'

ইউসুফ আবদুল্লাহকে অপর কামরায় নিয়ে এবং কাঠের এক সিন্দুকের দিকে ইশারা করে বললেন, 'আমার মনে হয়, এটি দিয়ে তোমার প্রয়োজন মিটবে।'

'হ্যাঁ এটি চমৎকার। এটিকে শিগগীর খালি করো।'

ইউসুফ ঢাকনা তুলে ফেলে সিন্দুকটি উলটে দিয়ে জিনিসপত্র মেঝের উপর ঢেলে ফেললেন। আবদুল্লাহ চাকু দিয়ে সিন্দুকের ঢাকনায় দু'তিনটি ছিদ্র করে বললেন, 'ব্যস, এবার ঠিক আছে। যেয়াদকে বলে দাও, এটাকে তুলে কামরায় দিয়ে যাক।'

ইউসুফ যেয়াদকে হুকুম দিলে সে সিন্দুকটি অপর কামরায় নিয়ে গেলো।

আবদুল্লাহ বললেন, 'এখন তুমি যেয়াদকে বলো, সে ভালো করে ওকে দেখাশুনা করবে, আর যদি সে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে, তাহলে ওর গলা টিপে দেয়।'

ইউসুফ যেয়াদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যেয়াদ তোমায় কি করতে হবে, বুঝে নিয়েছো তো?'

যেয়াদ হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লো।

'উনি যা হুকুম করেন, তা আমারই হুকুম মনে করবে।'

যেয়াদ আবার তেমনি ঘাড় নাড়লো।

আবদুল্লাহ বললেন, 'চলো দেরী হয়ে যাচ্ছে।'

ইউসুফ ও আবদুল্লাহ্ বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ ইউসুফ কি যেনো চিন্তা করে থেমে বললেন, 'হয়তো এ লোকটার সাথে আমার আর দেখা হবে না। আমার কিছু কথা আছে ওর সাথে।'

আবদুল্লাহ বললেন, 'এখন কথার সময় নয়।'

'কোনো লম্বা আলাপ নয়।' ইউসুফ বললেন, 'তুমি একটু দাঁড়াও।'

ইউসুফ ইবনে সাদেককে লক্ষ্য করে বললেন, 'আমি আপনার কাছে ঋণী। এখন আমি আপনার কার্য কিছুটা আদায় করে যাচ্ছি। দেখুন, আপনি মুহাম্মদ বিন কাসিমের মুখে থুথু দিয়েছিলেন, তাই আমি আপনার মুখে থুথু দিচ্ছি'—বলে তিনি ইবনে সাদেকের মুখে থুথু দিলেন। 'আপনি তার হাতের উপর ছড়ি মেরেছিলেন, এই নিন—বলে ইউসুফ তাকে এক কোড়া মারলেন। 'মনে পড়ে, আপনি নয়ীমের মুখে চড় মেরেছিলেন? এই

তার জওয়াব— বলে ইউসুফ জোরে চড় মারলেন তার গালে। 'আপনি নয়ীমের মাথার চুল উপড়ে দিয়েছিলেন।' ইউসুফ তার দাড়ি ধরে জোরে জোরে ঝাকুনি দিলেন।

'ইউসুফ, ছেলেমি করো না। জলদী করো।' আবদুল্লাহ ফিরে তার বাযু ধরে টেনে বললেন, 'বাকীটা পরে হবে। যেয়াদ, ওর দিকে ভালো করে খেয়াল করো।'

যেয়াদ আবার তেমনি মাথা নাড়লো। ইউসুফ আবদুল্লাহর সাথে বেরিয়ে গেলেন বাইরে।

পথে ইউসুফ প্রশ্ন করলেন, 'কি মতলব করলে তুমি?'

আবদুল্লাহ বললেন, 'শোনো, তুমি আমায় নয়ীমের বিবির বাড়িতে পেঁওছে দিয়ে কয়েদখানায় চলে যাও। ওখান থেকে নয়ীমকে বের করে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবে। ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে কোনো অসুবিধা হবে না তো?'

'কোনো অসুবিধা নেই।'

'আচ্ছা, তুমি বলেছিলে, তোমার কাছে দুটি ভালো ঘোড়া রয়েছে। আমার ঘোড়া রয়েছে ফউজী আস্তাবলে। তুমি আর একটি ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে পারবে না?'

'দশটি ঘোড়ারও ব্যবস্থা করা যাবে, কিন্তু নয়ীমের তিনটা ঘোড়াও তো তার বাড়িতে মওজুদ রয়েছে।'

'আচ্ছা, তুমি নয়ীমকে ওখান থেকে বের করে নিয়ে নিজের বাড়িতে এসো। এর মধ্যে তার বিবিকে নিয়ে আমি শহরের পশ্চিম দরযার বাইরে ইনতেযার করতে থাকবো। তোমরা দু'জন ঘর থেকে সওয়ার হয়ে এসো ওখানে।'

আবদুল্লাহ তার লেখা চিঠিখানা বের করে ইউসুফের হাতে দিয়ে বললেন, তোমরা এখান থেকে সোজা কায়রোয়ান চলে যাবে। ওখানকার সালারেআলা আমার দোস্ত ও নয়ীমের মকতবের সাথী। তিনি তোমাদেরকে স্পেন পর্যন্ত পৌঁছে দেবার বন্দোবস্ত করে দেবেন। স্পেনে পৌঁছে তেতলার সেনাবাহিনীর অধিনায়ক আবু ওবায়েদের হাতে দেবে এ চিঠি। তিনি তোমাদেরকে ফউজে ভর্তি করে নেবেন। তিনি আমার বিশ্বস্ত দোস্ত। তিনি তোমাদের পূর্ণ হেফাযত করবেন। নয়ীম আমার ভাই, তা তাকে বলবার প্রয়োজন নেই। আমি লিখেছি যে, তোমরা দু'জনই আমার দোস্ত। তোমাদের অবস্থা বলো না আর কারুর কাছে। কস্তানতুনিয়া থেকে ফিরে আমি আমীরুল মুমেনিনের ভুল ধারণা দূর করবার চেষ্টা করবো।'

ইউসুফ চিঠিখানা জিবের মধ্যে রেখে একটি সুন্দর বাড়ির সামনে এসে বললেন যে, নয়ীমের বিবি এখানে থাকেন।

আবদুল্লাহ বললেন, 'আচ্ছা তুমি যাও। হুঁশিয়ার হয়ে কাজ করো।'

'বহুত আচ্ছা, খোদা হাফিয।'

'খোদা হাফিয।'

ইউসুফ কয়েক কদম চলে যাবার পর আবদুল্লাহ বাড়ির দরজায় করাঘাত করলেন। বারমাক ভিতর থেকে দরজা খুলে আবদুল্লাহকে নয়ীম মনে করে খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে তাতারী যবানে বললো, 'আপনি এসেছেন,' আপনি এসেছেন ? নার্গিস! নার্গিস!! উনি এসেছেন।'

আবদুল্লাহ প্রথম জীবনে কিছুকাল তুর্কিস্তানে কাটিয়ে এসেছেন। তাতারী যবান তিনি কমবেশি করে জানেন। বারমাকের মতলব বুঝে তিনি বললেন, 'আমি তার ভাই।'

এর মধ্যে নার্গিস ছুটে এসেছেন। 'কে এসেছেন?' তিনি এসেই প্রশ্ন করলেন।

'ইনি নয়ীমের ভাই।' বারমাক জওয়াব দিলো।

'আমি ভেবেছিলাম, তিনি। নার্গিস আর্তস্বরে বললেন, 'আমি মনে করেছিলাম, বুঝি তিনিই...!' নার্গিসের উচ্ছ্বসিত দীল দমে গেলো। তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না।

'বোন। আমি নয়ীমের পয়গাম নিয়ে এসেছি।' আবদুল্লাহ বাড়ির আঙিনায় প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করতে বললেন।

'তার পয়গাম? আপনি তার সাথে দেখা করে এসেছেন?. বলুন, বলুন। নার্গিস অশ্রু-সজল চোখে বললেন।

'তুমি আমার সাথে যাবার জন্য জলদী তৈরী হয়ে নাও।'

'কোথায়?'

'নয়ীমের সাথে দেখা করতে।'

'তিনি কোথায়?'

'শহরের বইরে তার সাথে দেখা হবে তোমাদের।'

নার্গিস সন্দেহের দৃষ্টিতে আবদুল্লাহর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি তো স্পেনে ছিলেন।'

আবদুল্লাহ বললেন, 'আমি ওখান থেকেই এসেছি। আজই আমি জানলাম যে, নয়ীম কয়েদখানায় পড়ে রয়েছেন। তাকে বের করে আনবার ইনতেযাম আমি করেছি। তুমি জলদী করো।'

বারমাক বললো, 'চলুন কামরার ভিতরে। এখানে অন্ধকার।'

বারমাক, নার্গিস ও আবদুল্লাহ বাড়ির একটি আলোকোজ্জ্বল কামরায় প্রবেশ করলেন। নার্গিস আবদুল্লাহকে দীপালোকে ভালো করে দেখলেন। নয়ীমের সাথে তার আকৃতির অসাধারণ সাদৃশ্য তাকে অনেকখানি আশ্বস্ত করলো।

'আমরা পায়দল যাবো?' তিনি আবদুল্লাহকে প্রশ্ন করলেন।

'না, ঘোড়ায় চড়ে।' বলে আবদুল্লাহ বারমাকের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন 'ঘোড়া কোথায়?'

'সামনের আস্তাবলে রয়েছে।' সে জওয়াব দিলো।

'চলো আমরা ঘোড়া তৈরী করে নিয়ে আসি।'

আবদুল্লাহ ও বারবাক আস্তাবলে গিয়ে ঘোড়ায় জিন লাগালেন। এর মধ্যে নার্গিস তৈরী হয়ে এসেছেন। তাকে একটি ঘোড়ায় সওয়ার করিয়ে দিয়ে বাকী দুটি ঘোড়ায় সওয়ার হলেন আবদুল্লাহ ও বারমাক। শহরের দরজায় পাহারাদাররা বাধা দিলো।

আবদুল্লাহ তাদেরকে বললেন যে, তিনি কন্তানতুনিয়াগামী ফউজের সাথে শামিল হবার জন্য যাচ্ছেন সেনাবাসের দিকে। প্রমাণস্বরূপ তিনি পেশ করলেন খলিফার হুকুমনামা। পাহারাদাররা আদরের সাথে সালাম করে দরজা খুলে দিলো। দরজা থেকে কয়েক কদম দূরে গিয়ে তারা তিনজন ঘোড়া থেকে নামলেন এবং গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ইনতেযার করতে লাগলেন ইউসুফ ও নয়ীমের জন্য।

'উনি কখন আসবেন? নার্গিস বারংবার অস্থির হয়ে প্রশ্ন করেন। আবদুল্লাহ সস্নেহে জওয়াব দেন, বাস্, এখখুনি এসে যাবেন।

তারা আরো কিছুক্ষণ ইনতেযারে কাটালেন এবং দরযার দিক থেকে ঘোড়ার পদধ্বনি শোনা গেলো।

'ওরা আসছেন।' আবদুল্লাহ আওয়াজ শুনে বললেন।

সওয়ারদের আগমনে আবদুল্লাহ ও নার্গিস গাছের ছায়া থেকে বেরিয়ে দাঁড়ালেন সড়কের উপর।

নয়ীম কাছে এসে ঘোড়া থেকে নেমে ভাইয়ের সাথে আলীংগনাবদ্ধ হলেন।

আবদুল্লাহ বললেন, 'আর দেরী করো না ভোর হলো বলে। কায়রোয়ান পৌছবার আগে কোথাও দম নেবে না। বারমাক আমার সাথে যাবে।

নয়ীম ঘোড়ায় সওয়ার হলেন। তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন সামনে। আবদুল্লাহ তার হাতে চুমু খেলেন এবং চোখে স্পর্শ করলেন।

'ভাই, উযরা কেমন আছে?' নয়ীম বিষণ্ন আওয়াযে প্রশ্ন করলেন।

'সে ভালোই আছে। আল্লার মনযুর হলে আমরা স্পেনে তোমাদের সাথে মিলবো আবার।'

আবদুল্লাহ এরপর ইউসুফের সাথে মোসাফেহা করলেন এবং নার্গিসের কাছে গিয়ে হাত বাড়ালেন। নার্গিস তার মতলব বুঝে মাথা নীচু করলেন। আবদুল্লাহ সস্নেহে তার মস্তকে হাত বুলিয়ে দিলেন।

নার্গিস বললেন, 'ভাইজান, উযরাকে আমার সালাম বলবেন।'

'আচ্ছা খোদা হাফিয।' আবদুল্লাহ বললেন।

তিনজন সমস্বরে তার জওয়াবে 'খোদা হাফিয' বলে ঘোড়ার বাগ ঢিলা করে দিলেন। আবদুল্লাহ ও বারমাক খানিকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। নয়ীম আর তার সাথীরা রাতের অন্ধকারে গায়েব হয়ে গেলে তারা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে চলে গেলেন সেনাবাসে।

পাহারাদাররা আবদুল্লাহকে চিনতে পেরে সালাম করলো। আবদুল্লাহ বারমাকের ঘোড়া এক সিপাহীর হাতে সঁপে দিয়ে তার সওয়ারীর জন্য উটের ইনতেযাম করে আবার ফিরে গেলেন শহরের দিকে।

য়েয়াদ তার মালিকের হুকুম পেয়েছে ইবনে সাদেকের দিকে পুরোপুরি খেয়াল রাখবার। সে এতটা খেয়াল রেখেছে ইবনে সাদেকের দিকে যে, তার মুখের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়নি আর কোনোদিকে। ঘুম পেলে সে উঠে সেই খুঁটির চারদিকে ঘুরতে থাকে। এ নিঃসঙ্গতা তার আর ভালো লাগে না। আচানক এক খেয়াল এলো তার মাথায়। সে ইবনে সাদেকের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো এবং তাকে ভালো করে দেখতে লাগলো। তার মুখে আচানক এক ভয়ংকর হাসি দেখা দিলো। সে ইবনে সাদেকের চিবুকের নীচে হাত দিয়ে তার মুখ নিজের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে থুথু দিতে লাগলো তার মুখে। তারপর সে পূর্ণ শক্তি দিয়ে কয়েকটা কোড়া মারলো ইবনে সাদেকের পিঠে এবং এমন জোরে তার মুখে মারলো এক চড় যে সে বেহুঁশ হয়ে পড়ে রইলো কিছুক্ষণ। তার হুঁশ ফিরে এলে য়েয়াদ তার দাঁড়ি ধরে টানতে লাগলো। ইবনে সাদেক যখন অসহায়ভাবে গর্দান ঢিলা করে দিলো, তখন য়েয়াদও তাকে ছেড়ে দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য ঘুরতে থাকলো তার আশপাশে।

ইবনে সাদেকের হুঁশ হলে যখন সে চোখ খুললো, য়েয়াদ তখন আবার তেমনি উত্তম মধ্যম লাগালো। কয়েকবার এমনি করে যখন সে বুঝলো যে তার আর কোড়া খাবার মতো তাকৎ নেই, তখন সে বিড়বিড় করে খুঁটির আশপাশে ঘুরলো এবং মাঝে মাঝে ইবনে সাদেকের দাঁড়ি ধরে এক আধটা টান মারলো। কখনো কখনো সে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে, আবার খানিকক্ষণ পর খানিকটা তামাশা করে।

ভোরের আযানের সময়ে য়েয়াদ দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলো, আবদুল্লাহ ও বারমাক আসছেন। সে শেষবার থুথু দিতে, কোড়া ও চড় মারতে এবং দাড়ি ধরে টানতে চাইলো। তখনো ইবনে সাদেকের দাড়ি ধরে ঝাকুনি দেওয়া শেষ হয়নি। এর মধ্যে আবদুল্লাহ ও বারমাক এসে পৌছলেন।

আবদুল্লাহ বললেন, বেঅকুফ, কি করছো তুমি? ওকে জলদী সিন্দুকে ঢুকাও।' য়েয়াদ তখখুনি তার হুকুম তামিল করে আধমরা আজদাহাকে ঢুকালো সিন্দুকের মধ্যে।

সূর্যোদয়ের পরক্ষণেই আবদুল্লাহ ফউজ নিয়ে চললেন কন্তানতুনিয়ার পথে। রসদ-বোঝাই উটগুলোর মধ্যে একটির পিঠে চাপানো হয়েছে একটি সিন্দুক। য়েয়াদের উটটি তার পাশে। লশকরের মধ্যে আবদুল্লাহ, বারমাক ও য়েয়াদ ছাড়া আর কেউ জানে না, সিন্দুকের মধ্যে কি রয়েছে।

আবদুল্লাহর হুকুমে বারমাকও ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে চললো। সিন্দুকওয়ালা উটের পাশে পাশে।

নয়ীম নার্গিস ও ইউসুফকে সাথে নিয়ে কায়রোয়ান পৌছলেন। সেখান থেকে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তারা গেলেন কর্ডোভায়। কর্ডোভা থেকে ধরলেন তেতলার পথ। সেখানে পৌছে নার্গিসকে এক সরাইখানায় রেখে তিনি ইউসুফকে সাথে নিয়ে সেনাবাহিনীর অধিনায়ক আবু ওবায়েদের খেদমতে হাযির হয়ে পেশ করলেন আবদুল্লাহর চিঠি।

আবু ওবায়েদ চিঠি পড়ে ইউসুফ ও নয়ীমের দিকে ভালো করে মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে নিয়ে বললেন, 'আপনারা আবদুল্লাহর দোস্ত। আজ থেকে আমাকেও আপনারা দোস্ত মনে করবেন। আবদুল্লাহ নিজে ফিরে আসবেন না?'

নয়ীম জওয়াব দিলেন, 'আমীরুল মুমেনিন তাকে পাঠিয়েছেন কস্তানতুনিয়া অভিযানে।'

'কস্তানতুনিয়ার চাইতে এখানেই তার প্রয়োজন ছিলো বেশী। তারিক ও মুসার স্থান নেবার মতো আর কেউ নেই। আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি এবং পূর্ণ উদ্যম সহকারে কর্তব্য পালন করতে পারছি না আমি। আপনারা জানেন, শাম ও আরব থেকে এদেশ অনেকখানি আলাদা। এখানকার পাহাড়ী লোকদের যুদ্ধের তরিকাও আমাদের থেকে স্বতন্ত্র। পরে এখানে আপনাদেরকে ফউজের কোনো উঁচু পদ দেওয়া যাবে। আপাততঃ মামুলী সিপাহী হিসেবে অভিজ্ঞতা হাসিল করতে হবে বেশ কিছুদিন। তারপর আপনাদের হেফাযতের সওয়াল। সে সম্পর্কে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। যদি আমীরুল মুমেনিন এখান পর্যন্ত আপনাদের তালাশ করেন, তাহলে আপনাদেরকে পৌছে দেওয়া যাবে কোনো নিরাপদ জায়গায়। কিন্ত আমার নীতি হচ্ছে, কোনো ব্যক্তির যোগ্যতার পরীক্ষা না নিয়ে আমি তার উপর কোনো জিম্মাদারী দেই না।'

নয়ীম সিপাহসালারের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি কুতায়বা বিন মুসলিম ও মুহাম্মদ বিন কাসিমের ডান পাশে থেকে যতোটা আনন্দ লাভ করেছি, সিপাহীদের পিছনের কাতারে দাঁড়িয়েও আমি অনুরূপ আনন্দই পাবো।'

'আপনার মতলব হচ্ছে যে আপনি...।'

আবু ওবায়েদের কথা শেষ হবার আগেই ইউসুফ বলে উঠলেন, 'ইনি ছিলেন কুতায়বা ও ইবনে কাসিমের নামযাদা সালার।'

'মাফ করবেন। আমি জানতাম না যে, আমি আমার চাইতে যোগ্যতর ও অধিকতর অভিজ্ঞ সালারের সামনে দাঁড়িয়ে আছি।' আবু ওবায়েদ আর একবার নয়ীমের সাথে মোসাফেহা করলেন।

'এবার আমি বুঝেছি, কেন আমীরুল মুমেনিনের বিষ নযরে আপনি পড়েছেন। এখানে কোন বিপদ নেই আপনার। তবু সতর্কতার খাতিরে আজ থেকে আপনার নাম যোবায়ের ও আপনার দোস্তের নাম হবে আবদুল আযীয। আপনার সাথে কেউ আছেন?'

নয়ীম বললেন, 'জি হাঁ, আমার বিবিও সাথে আছেন। তাকে আমি রেখে এসেছি এক সরাইখানায়।'

'ওহো, তার জন্যও আমি একটা বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।' আবু ওবায়েদ আওয়ায দিয়ে এক নওকরকে ডেকে হুকুম দিলেন শহরে একটা ভালো বাড়ি খুঁজে দিতে।

চারমাস পর একদিন নয়ীম বর্মপরিহিত হয়ে নার্গিসের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, যে রাত্রে ভাই আবদুল্লাহ ও উযরার শাদী হলো, সেই রাত্রেই তিনি রওয়ানা হয়ে গেলেন জিহাদের ময়দানে। আমি নিজের চোখে দেখেছি, উযরার মুখে চিন্তা ও দুঃখের মামুলী রেখাটিও নেই।

'আপনার মতলব আমি বুঝেছি।' নার্গিস হাসবার চেষ্টা করে বললেন, 'আপনি কতোবার বলেছেন, তাতারী মেয়েরা আরব মেয়েদের মোকাবিলায় বহুত কমযোর, কিন্তু আমি আপনার ধারণা ভুল প্রমাণ করে দেবো।'

নয়ীম বললেন, 'পর্তুগাল বিজয়ে আমার প্রায় ছয় মাস লেগে যাবে। আমি চেষ্টা করবো এরই মধ্যে একবার এসে তোমায় দেখে যেতে। আমি না আসতে পারলেও ঘাবড়ে যেয়ো না। আবু ওবায়েদ আজ এক পরিচারিকাকে পাঠাবেন তোমার কাছে।'

'আমি আপনাকে...।' নার্গিস দৃষ্টি অবনত করে বললেন, 'একটা নতুন খবর শোনাতে চাই।'

'শোনাও।' নয়ীম নার্গিসের চিবুক স্নেহে উপরে তুলে বললেন।

'আপনি যখন ফিরে আসবেন'...

'হাঁ হাঁ, বলো।'

'আপনি জানেন না?' নার্গিস নয়ীমের হাত ধরে মৃদু চাপ দিতে দিতে বললেন।

'আমি জানি। তোমার মতলব, শিগগিরই আমি বাচ্চার বাপ হতে চলেছি। এই তো?' এর জওয়াবে নার্গিস তার মস্তক নয়ীমের সিনার সাথে লাগালেন।

'নার্গিস, আমি তার নাম বলে যাবো?....তার নাম হবে আবদুল্লাহ। আমার ভাইয়ের নাম।'

'আর যদি মেয়ে হয়, তবে?'

'না, ছেলেই হবে। আমার চাই এমন বেটা, যে তীরবৃষ্টি ও তলোয়ারের ঝংকারের ভিতরে খেলে বেড়াবে। আমি তাকে তীরন্দাযী, নেযাহবাযি, শাহসওয়ারীর শিক্ষা দেবো। পূর্বপুরুষের তলোয়ার দীপ্তি অব্যাহত রাখবার জন্য পয়দা করতে হবে তার বাযুতে তাকৎ ও দীলে হিম্মৎ'।

ওফাতের কিছুকাল আগে খলিফা ওয়ালিদ কস্তানতুনিয়া বিজয়ের জন্য প্রেরণ করেছিলেন জঙ্গী জাহাজের এক বহর এবং এক ফউজ পাঠিয়েছিলেন এশিয়া মাইনরের পথে, কিন্তু সে হামলায় মুসলমানরা কঠিন ব্যর্থতার মোকাবিলা করলো। কস্তানতুনিয়ার মজবুত পাঁচিল জয় করবার আগেই মুসলমানদের রসদ গেলো ফুরিয়ে। আর এক মুসীবৎ হলো এই যে, শীতের মওসুম শুরু হতেই লশকরের ভিতর মহামারীর প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়ে হাজারো মুসলমানের প্রাণ বিনষ্ট হলো। এসব মুসীবতের ভিতর দিয়ে এক বছর অবরোধের পর মুসলিম সেনাবাহিনীকে ফিরে আসতে হলো।

মুহাম্মদ বিন কাসিম ও কুতায়বা বিন মুসলিম বাহেলীর মর্মান্তিক পরিণতির পর সিন্ধু ও তুর্কিস্তানে ইসলামী বিজয় অভিযানের গতি প্রায় শেষ হয়ে এলো। সুলায়মান এ অখ্যাতির কলংক অপসারণের জন্য চাইলেন কস্তানতুনিয়া জয় করতে। তার ধারণা ছিলো যে, কস্তানতুনিয়া জয় করতে পারলে তিনি বিজয় গৌরবে খলিফা ওয়ালিদকে ছাড়িয়ে যাবেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এ বিজয় অভিযানের জন্য তিনি বাছাই করলেন এমন সব লোক, সিপাহীর যিন্দেগীর সাথে যাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তার সিপাহসালার যখন পায়ে পায়ে ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে লাগলেন তখন তিনি আন্দালুসের ওয়ালীকে হুকুম দিলেন একজন বাহাদুর ও অভিজ্ঞ সালারকে পাঠিয়ে দিতে। সেই হুকুম অনুযায়ী আবদুল্লাহ হাযির হয়ে দামেস্ক থেকে পাঁচ হাজার সিপাহী নিয়ে রওয়ানা হলেন কস্তানতুনিয়ার পথে। যাতে কস্তানতুনিয়ার উপর হামলাকারী ফউজের দেখাশুনা করা যায়, তারই জন্য সুলায়মান নিজেও দামেস্ক ছেড়ে রমলায় বানালেন তার দারুল খিলাফত। কয়েকবার তিনি হামলাকারী ফউজ পরিচালনা করলেন, কিন্তু কোনো সাফল্যই লাভ হলো না। সুলায়মানের বেশীর ভাগ নির্দেশের সাথে আবদুল্লাহ একমত হতেন না। তিনি চাইতেন যে, তুর্কিস্তান ও সিন্ধুর যেসব মশহুর সালার কুতায়বা বিন মুসলিম ও মুহাম্মদ বিন কাসিমের অনুরক্ত বলে পদচ্যুত হয়েছেন, তাদেরকে আবার ফউজের শামিল করে নেওয়া হোক। কিন্তু খলিফা তাদের বদলে ভর্তি করে দিলেন তার কতিপয় অযোগ্য দোস্তকে।

সুলায়মানের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে ঘৃণার মনোভাব পয়দা হলো। নিজের কমযোরী সম্পর্কে তিনিও ছিলেন সচেতন। কেবল খলিফার তুষ্টির জন্য খোদার রাহে জান-মাল উৎসর্গকারী সিপাহীরা রক্তপাত পছন্দ করতো না। তাই ইসলামের পথে আত্মোৎসর্গের সে পুরানো মনোভাব ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে এলো। ইবনে সাদেক গায়েব হয়ে যাওয়ায় খলিফার পেরেশানি গেলো বেড়ে। মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে আসন্ন মুসীবৎ সম্পর্কে তাকে বেপরোয়া করে তুলবার মতো আর কেউ নেই তখন। মুহাম্মদ বিন কাসিমের মতো বেগুনাহ মানুষকে হত্যা করার ফলে তার বিবেক তাকে কষাঘাত করতে লাগলো। ইবনে সাদেককে খুঁজে বের করবার সব রকম প্রচেষ্টা করা হলো। গুপ্তচররা ছুটে বেড়াতে লাগলো, পুরস্কার ঘোষণা করা হলো, কিন্তু কোথাও মিললো না কোনো সন্ধান।

চৌদ্দ

আবদুল্লাহ জানতেন যে, খলিফা ইবনে সাদেকের সন্ধানের জন্য সর্বপ্রকার সম্ভাব্য চেষ্টাই করবেন। তাই তাকে যিন্দাহ রাখা বিপজ্জনক, কিন্তু তিনি তার মতো নীচু মানুষের রক্তে হাত কলংকিত করা বাহাদুর সিপাহীর পক্ষে শোভন মনে করেন নি। কস্তানতুনিয়ার পথে তার ফউজ যখন কৌনিয়া নামক স্থানে এসে থামলো, তখন আবদুল্লাহ শহরের শাসনকর্তার সাথে দেখা করে তার দামী জিনিসপত্র হেফাত করবার জন্য একটি বাড়ি পাবার ইচ্ছা জানালেন। শহরের শাসনকর্তা আবদুল্লাহকে দিলেন

একটি পুরানো জনহীন বাড়ি। আবদুল্লাহ ইবনে সাদেককে বন্ধ করে রাখলেন সেই বাড়ির গোপন কক্ষে। বারমাক ও যেয়াদের উপর হেফাযতের দায়িত্ব অর্পন করে ফউজ নিয়ে তিনি চলেন কস্তানতুনিয়ার পথে।

যেয়াদের কাছে তার যিন্দেগী আগের চাইতে আনন্দদয়ক হয়ে উঠেছে। আগে সে ছিলো নিছক গোলাম। কিন্তু এখন একটা মানুষের দেহ ও জানের উপর তার পুরো এখতিয়ার। সে যখন চায়, ইবনে সাদেককে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করে। ইবনে সাদেক তার কাছে একটা খেলনার শামিল। এ খেলা নিয়ে খেলতে ক্লান্তি অনুভব করে না সে। তার নিরানন্দ জীবনে ইবনে সাদেক প্রথম ও শেষ আকর্ষণ। তার প্রতি তার বিদ্বেষ, না প্রীতির আকর্ষণ! যে ভাবেই হোক, সে হররোয তাকে চড়-চাপড় মারার, দাড়ি ধরে টানার ও মুখে থুথু দেবার কোনো না কোনো সুবিধা বের করে নেয়। বারমাক তার সামনে করতে দেয় না এসব, কিন্তু যখন সে খাবার সংগ্রহের জন্য বাজারে যায়, তখন যেয়াদ তার খুশীমতো কাজ করে।

আবদুল্লাহর হুকুম মোতাবেক ইবনে সাদেককে দেওয়া হতো ভালো ভালো খানা। তাঁর আরো হুকুম ছিলো যেনো সাদেককে কোনো তকলীফ দেওয়া না হয়। কিন্তু যেয়াদ অতো বেশী জরুরী মনে করতো না এ হুকুম। আরবী যবান কিছুটা জানা থাকলেও যেয়াদ ইবনে সাদেকের সাথে কথা বলতো তার মাতৃভাষায়। গোড়ার দিকে ইবনে সাদেকের অসুবিধা হতো, কিন্তু কয়েক মাস পরে সে বুঝতো যেয়াদের কথা।

একদিন বারমাক চলে গেলো বাজার থেকে খানাপিনার জিনিষপত্র আনতে। যেয়াদ বাড়ির এক কামরায় দাঁড়িয়ে খিড়কি থেকে উঁকি মেরে দেখলো, এক হাবশী গাধায় সওয়ার হয়ে বেরিয়ে আসছে শহর থেকে। দৈত্যাকৃতি হাবশীর বোঝা বয়ে জীর্ণ গাধার কোমর বেঁকে যাচ্ছে। গাধা চলতে চলতে শুয়ে পড়লো আর হাবশী শুরু করলো কোড়া বর্ষণ। গাধা নিরুপায় হয়ে উঠে দাঁড়ালো। হাবশী আবার চাপলো তার পিঠে। খনিকটা পথ চলে গাধা আবার বসে পড়লো। হাবশী আবার মারতে লাগলো কোড়া। যেয়াদ অট্টহাস্য করে কামরা থেকে একটা কোড়া হাতে নিয়ে নামলো নীচে এবং ইবনে সাদেকের কয়েদখানার দরযা খুলে ঢুকলো ভিতরে।

ইবনের সাদেক যেয়াদকে দেখেই তৈরী হলো অভ্যাসমতো দাড়ি টানাতে ও কোড়ার ঘা খেতে, কিন্তু তার প্রত্যাশার বিরুদ্ধে যেয়াদ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো চুপ করে। অবশেষে সে সামনে ঝুঁকে দুহাত যমিনের উপর ভর করে এক চার পেয়ে জানোয়ারের মতো হাত-পা দিয়ে দুতিন গজ চলবার পর ইবনে সাদেককে বললো, 'এসো।'

ইবনে সাদেক তার মতলব বুঝলো না। আজ কোনো নতুন খেলার ভয়ে সে ঘাবড়ে গেলো। ভয়ের আতিশয্যে তার পেশানীতে দেখা দিলো ঘাম।

যেয়াদ বললো, 'এসো, আমার উপর সওয়ার হও।'

ইবনে সাদেক জানতো, তার ভালো-মন্দ যে কোনো হুকুম মেনে চললেই তার ভালাই। তার হুকুম অমান্য করার শাস্তি হবে তার পক্ষে অসহনীয়। তাই ভয়ে ভয়ে সে সওয়ার হলো যেয়াদের পিঠে। যেয়াদ গোপন কক্ষের দেওয়ালের চারিদিকে দুতিন

চক্কর লাগিয়ে ইবনে সাদেককে নীচে নামিয়ে দিলো। যেয়াদকে খুশী করতে গিয়ে সে খোশমুদীর স্বরে বললো, 'আপনি বেশ শক্তিমান।'

কিন্তু যেয়াদ তার কথায় কান না দিয়ে উঠেই হাত ঝেড়ে ইবনে সাদেককে ধরে নীচে ঝুকিয়ে বললো, 'এবার আমার পালা।'

ইবনে সাদেক জানতো, এ দৈত্যের বোঝা পিঠে নিয়ে সে পিষে যাবে, কিন্তু নিরুপায় হয়ে সে নিজেকে তকদীরের উপরে ছেড়ে দিলো।

যেয়াদ কোড়া হাতে ইবনে সাদেকের পিঠে সওয়ার হলো। ইবনে সাদেকের কোমর বেঁকে গেলো। এত ভারী বোঝা বয়ে চলা তার পক্ষে অসম্ভব। বহু কষ্টে দুতিন কদম চলে সে পড়ে গেলো। যেয়াদ তার উপর কোড়া বর্ষণ করতে শুরু করলো। কোড়ার ঘা খেয়ে ইবনে সাদেক বেহুঁশ হয়ে গেলো। যেয়াদ তাকে দেওয়ালে ভর করে বসিয়ে দিয়ে ছুটে গেলো বাইরে। খানিকক্ষণ পর আবার কয়েদখানার দরযা খুলে সে ঢুকলো এক তশ্‌তরীতে কয়েকটা সেব ও আঙ্গুর নিয়ে। ইবনে সাদেক জ্ঞান ফিরে পেয়ে চোখ খুললো। যেয়াদ আপন হাতে তার মুখে দিলো কয়েকটা আঙ্গুর। তারপর নিজের খনজর দিয়ে একটা সেব কেটে সে তার অর্ধেকটা দিলো ইবনে সাদেককে। ইবনে সাদেক তার হিসসা শেষ করলে যেয়াদ তাকে কেটে দিলো আর একটি সেব।

ইবনে সাদেক জানে, যেয়াদ কখনো কখনো তার প্রতি প্রয়োজনের চাইতে বেশী মেহেরবান হয়ে ওঠে। তাই সে দ্বিতীয় সেবটি শেষ করে নিজেই যেয়াদকে তুলে দিলো তৃতীয় সেবটি। যেয়াদ তার খনজর রেখে দিয়েছে সেব গুলোর মাঝখানে। ইবনে সাদেক বেপরোয়া হয়ে সেটি হাতে তুলে নিয়ে সেবের খোসা ফেলতে শুরু করলো। যেয়াদ সবকিছুই দেখছে মনোযোগ দিয়ে। ইবনে সাদেক সেখানে খনজর রেখে দিয়ে বললো, 'এগুলো খোসাশুদ্ধ খেলে ক্ষতি হয়।'

'হুঁ।' যেয়াদ মাথা নেড়ে আওয়ায করলো এবং একটি সেব তুলে নিজেও ইবনে সাদেকের মতো খোসা ফেলতে লাগলো। যেয়াদের হাত কেমন যেনো নিঃসাড় হয়ে আসছে। সে হাত মুখে দিয়ে ভাবতে লাগলো ঃ

'দিন, আমি খোসা তুলে দিচ্ছি।' ইবনে সাদেক বললো।

যেয়াদ মাথা নেড়ে সেব ও খনজর দিলো তার হাতে। ইবনে সাদেক সেবের খোসা তুলে ফেলে তার হাতে দিয়ে প্রশ্ন করলো, 'আরো খাবেন আপনি?'

যেয়াদ মাথা নাড়লো এবং ইবনে সাদেক আর একটি সেব তুলে তার খোসা ফেলতে লাগলো।

ইবনে সাদেকের হাতে খনজর। তার দীল ধড় ফড় করছে। সে চায়, একবার আবার ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখবে, কিন্তু তার ভয়, হামলা করবার আগেই যেয়াদ তাকে ধরে ফেলবে বজ্রমুষ্ঠিতে। খানিকক্ষণ চিন্তু করে সে দরযার দিকে ফিরে দেখে পেরেশান হবার ভান করে বললো, 'কে যেনো আসছে।' যেয়াদও জলদী ফিরে তাকালো দরযার দিকে। ইবনে সাদেক অমনি অলক্ষ্যে তার সিনায় আমূল বিদ্ধ করে দিলো তার হাতের চকচকে খনজর এবং দ্রুত এক লাফে কয়েক কদম পিছলে গেলো। যেয়াদ রাগে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দুহাত প্রসারিত করে এগিয়ে গেলো ইবনে সাদেকের গলা টিপে দিতে। ইবনে সাদেক তার সামনে অনকখানি হালকা। দ্রুত গতিতে সে চলে গেলো তার নাগালের বাইরে গোপন কক্ষের এক কোণে। যেয়াদ সেদিকে এগুলো সে গেলো আর এক কোণে। যেয়াদ চারদিক দিয়ে তাকে ধরবার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না।

যেয়াদের পা ক্রমে নিঃসাড় হয়ে এলো। যখমের রক্তধারা কাপড়-চোপড় ভিজিয়ে গড়িয়ে পড়ছে জমিনের উপর। তার শক্তি নিঃশেষ হয়ে এসেছে। দুহাতে সিনা চেপে সে গড়িয়ে পড়লো যমিনের উপর। ইবনে সাদেক এক কোণে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলো। সে যখন বুঝলো যে, যেয়াদ মরে গেছে অথবা বেহুঁশ হয়ে গেছে তখন সে এগিয়ে তার জেব থেকে চাবি নিয়ে দরযা খুলে বেরিয়ে গেলো।

বারমাক তখনো বাজার থেকে ফেরেনি। ইবনে সাদেক মুক্তি পেয়ে খানিকটা দৌড়ে ছুটে চললো। তারপর সে ভাবলো, শহরে কোনো বিপদ নেই তার। এবার সে নিশ্চিন্ত হয়ে চলতে লাগলো। শহরের লোকের কাছ থেকে বইরের দুনিয়ার খবর নিয়ে সে এবার চললো রমলার পথে খলিফাকে তার কাহিনী শুনাতে।

ইবনে সাদেকের মুক্তির কয়েকদিন পর শোনা গেলো, খলিফা আব্দুল্লাহকে সরিয়ে দিয়েছেন সিপাহসালারের পদ থেকে এবং তাঁকে শৃংখলাবদ্ধ করে নেওয়া হচ্ছে রমলার দিকে। ইবনে সাদেক সম্পর্কে খবর রটলো যে, তাকে স্পেনে পাঠানো হয়েছে মুফতিয়ে আযমের পদে নিযুক্ত করে।

❦

হিজরী ৯৯ সালে খলিফা সুলায়মান ফউজের নেতৃত্ব নিজের হাতে নিয়ে কস্তানতুনিয়ার উপর হামলা চালালেন, কিন্তু পূর্ণ বিজয় লাভের আগেই তিনি বিদায় নিলেন দুনিয়া থেকে। উমর বিন আবদুল আযীয খিলাফতের তখতে আসীন হলেন। উমর বিন আবদুল আযীয স্বভাব ও চালচলনে ছিলেন বনু উম্মিয়ার তামাম খলিফা থেকে স্বতন্ত্র। তার খিলাফত আমল ছিলো বনু উম্মিয়া খিলাফতের গৌরবদীপ্ত অধ্যায়। মযলুম মানুষের প্রতি যুলুমের প্রতিকার হলো নয়া খলিফার প্রথম কর্তব্য। যেসব বড় বড় মুজাহিদ সুলায়মান বিন আবদুল মালিকের রোষের শিকার হয়ে কয়েদ খানার অন্ধকার কুঠরীতে দিন যাপন করছিলেন, তাঁদেরকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হলো। অত্যাচারী বিচারকদেরকে পদচ্যুত করে তাঁদের স্থলাভিষিক্ত করা হলো নেক-দীল ও ন্যায়নিষ্ঠ হাকীমদের। রমলার কয়েদখানায় বন্দী আবদুল্লাহকে মুক্তি দিয়ে ডেকে আনা হলো দরবারে খিলাফতে।

আবদুল্লাহ দরবারে খিলাফতে হাযির হয়ে তাঁর মুক্তির জন্য জানালেন শোকরিয়া। আমিরুল মুমেনিন প্রশ্ন করলেন, 'এখন কোথায় যাবে?'

'আমীরুল মুমেনিন! বহুদিন হয় আমি ঘরে ছেড়ে এসেছি। এখন আমি ঘরেই ফিরে যেতে চাই।'

'তোমার সম্পর্কে আমি এক হুকুম জারী করেছি।'

'আমি খুশীর সাথে আপনার হুকুম তামিল করবো।'

দ্বিতীয় উমর এক টুকরা কাগজ আবদুল্লাহর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি তোমায় খোরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছি। তুমি একমাস ঘরে থেকে ফিরে এসে খোরাসানে পৌছে যাবে।'

আবদুল্লাহ সালাম করে কয়েক কদম গিয়ে আবার থেমে দাঁড়িয়ে আমীরুল মুমেনিনের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'তুমি আরো কিছু বলবে?' আমীরুল মুমেনিন প্রশ্ন করলেন।

'আমীরুল মুমেনিন, আমি আমার ভাইয়ের সম্পর্কে আরয করতে চাচ্ছি। আমি তাঁকে দামেস্কের কয়েদখানা থেকে মুক্ত করবার চক্রান্ত করেছিলাম। তিনি বেকসুর। তাঁর একমাত্র কসুর, তিনি কুতায়বা বিন মুসলিম ও মুহাম্মদ বিন কাসিমের ঘনিষ্ঠ দোস্ত ছিলেন এবং দরবারে খিলাফতে হাযির হয়ে তিনি আমীরুল মুমেনিনকে কুতায়বাকে হত্যার ইরাদা থেকে বিরত করবার চেষ্টা করেছিলেন।

দ্বিতীয় উমর প্রশ্ন করলেন, 'তুমি নয়ীম বিন আবদুর রহমানের কথা বলছো?'

'জি হাঁ, আমিরুল মুমেনিন! তিনি আমার ছোট ভাই।'

'এখন তিনি কোথায়।?'

'স্পেনে। আমি তাঁকে আবু ওবায়দের কাছে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, আগের খলিফা ইবনে সাদেককে ওখানকার মুফতিয়ে আযম নিযুক্ত করেছেন এবং সে নয়ীমের খুনের পিয়াসী।'

আমীরুল মুমেনিন বললেন, 'ইবনে সাদেক সম্পর্কে আজই আমি স্পেনের ওয়ালীকে লিখে হুকুম দিচ্ছি, তার পায়ে শিকল বেঁধে দামেস্কে পাঠাবেন। তোমার ভাইয়ের দিকেও আমার খেয়াল থাকবে।'

'আমীরুল মুমেনিন! নয়ীমের সাথে তাঁর এক দোস্ত রয়েছে। তিনিও আপনার সদয় দৃষ্টি লাভের যোগ্য।'

আমীরুল মুমেনিন স্পেনের ওয়ালীর কাছে চিঠি লিখলেন এবং এক সিপাহীর হাতে দিয়ে বললেন, 'এবার তুমি খুশী হয়েছো? তোমার ভাইকে আমি দক্ষিণ পর্তুগালের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছি এবং তার দোস্তকে ফউজে উচ্চপদে নিযুক্ত করবার সুপারিশ করেছি। ইবনে সাদেক সম্পর্কেও আমি লিখে দিয়েছি।'

আবদুল্লাহ আদব সহকারে সালাম করে বিদায় নিলেন।

❦

আন্দালুসের ওয়ালী থাকতেন কর্ডোভায়। তিনি দক্ষিণ পর্তুগাল থেকে যোবায়ের নামক এক নয়া সিপাহসালারের বিজয়ের খবর শুনে অত্যন্ত খুশী। তিনি আবু ওবায়েদকে চিঠি লিখলেন এবং যোবায়েরের সাথে মোলাকাত করবার ইচ্ছা জানালেন। নয়ীম কর্ডোভায় পৌছে আন্দালুসের ওয়ালীর খেদমতে হাযির হলেন। ওয়ালী তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা করে গ্রহণ করলেন।

ওয়ালী বললেন, 'আপনার মোলাকাত পেয়ে আমি খুশী হয়েছে। আবু ওবায়েদ তাঁর চিঠিতে আপনার যথেষ্ট তারিফ করেছেন। কয়েকদিন আগে আমি খবর পেয়েছি, উত্তর এলাকার পাহাড়ী লোকেরা বিদ্রোহ করছে। আমি তাদেরকে দমন করবার জন্য আপনাকে পাঠাতে চাই। কাল পর্যন্ত আপনি তৈরী হবেন।'

'বিদ্রোহ হয়ে থাকলে তো আমার আজই যাওয়া দরকার। বিদ্রোহের আগুন ছড়ানোর সুযোগ দেওয়া ঠিক হবে না।'

'বহুত আচ্ছা। এখখুনি আমি সেনাবাহিনীর অধিনায়ককে ডাকাচ্ছি পরামর্শের জন্য।'

নয়ীম ও আন্দালুসের ওয়ালী পরস্পর আলাপ আলোচনা করতে লাগলেন। এক সিপাহী এসে বললো, 'মুফতিয়ে আযম আপনার সাথে দেখা করতে চান।'

ওয়ালী বললেন, 'তাঁকে তশরীফ আনতে বলো।'

'আপনার সাথে হয়তো তাঁর দেখা হয়নি। নয়ীমকে লক্ষ্য করে ওয়ালী বললেন, 'এক মাসের বেশি হয়নি তিনি এখানে এসেছেন। তাঁকে আমীরুল মোমেনিনের প্রিয়পাত্র মনে হচ্ছে। কিন্তু আমার আফসোস, এ পদের যোগ্য নন তিনি।'

'তাঁর নাম কি?'

'ইবনে সাদেক।' ওয়ালী জওয়াব দিলেন।

নয়ীম চমকে উঠে বললেন, 'ইবনে সাদেক'!

'আপনি তাঁকে চেনেন?'

এরই মধ্যে ইবনে সাদেক ভিতরে প্রবেশ করলো। তাকে দেখে নয়ীমের মনে হলো যেনো এক নতুন মুসীবৎ আসন্ন।

ইবনে সাদেকও তার পুরানো প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখে অন্তর্জ্বালা অনুভব করলো।

'আপনি এঁকে জানেন না?' ওয়ালী বললেন ইবনে সাদেককে লক্ষ্য করে, 'এর নাম যোবায়ের। আমাদের ফউজের সব চাইতে বাহাদুর সালার।'

'বে-শ'। বলে ইবনে সাদেক নয়ীমের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো, কিন্তু নয়ীম মোসাফেহা করলেন না।

নয়ীম ইবনে সাদেককে আমল না দিয়ে ওয়ালীকে বললেন, 'আপনি আমায় এযাযত দিন।'

'একটু দেরী করুন। আমি সিপাহসালারকে হুকুমনামা লিখে দিচ্ছি। আপনার সাথে যতো ফউজের দরকার, তিনি রওয়ানা করে দেবেন। আর আপনিও তশরীফ রাখুন।' তিনি ইবনে সাদেককে হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন। ইবনে সাদেক তাঁর পাশে বসলে তিনি কাগজ নিয়ে হুকুমনামা লিখে নয়ীমের হাতে দেবার জন্য হাত বাড়ালেন।

'আমি একবার দেখতে পারি কি?' ইবনে সাদেক বললেন।

'খুশীর সাথে।' বলে ওয়ালী হুকুমনামা ইবনে সাদেকের হাতে দিলেন।

ইবনে সাদেক তা পড়ে ওয়ালীর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললো,' এখন আর এ ব্যক্তির খেদমতের প্রয়োজন নেই। এঁর জায়গায় আর কোনো লোককে পাঠিয়ে দিন।'

ওয়ালী হয়রান হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'এঁর সম্পর্কে আপনার সন্দেহ হলো কি করে? উনি হচ্ছেন আমাদের ফউজের সবচাইতে যোগ্য সালার।'

'কিন্তু আপনি জানেন না, এ লোকটি আমীরুল মুমেনিনের নিকৃষ্টতম দুশমন, আর এঁর নাম যোবায়ের নয়,নয়ীম। ইনি দামেস্কের কয়েদখানা থেকে ফেরার হয়ে এখানে তাশরীফ এনেছেন।'

'এ কথা সত্যি?' ওয়ালী পেরেশান হয়ে প্রশ্ন করলেন।

নয়ীম নীরব রইলেন।

ইবনে সাদেক বললো, 'আপনি এখখুনি ওকে গেরেফতার করে আমার আদালতে পেশ করুন।'

'আমি বিনা সাক্ষ্য প্রমাণে একজন সালারকে গ্রেফতার করতে পারি না। প্রথম মোলাকাতেই আপনারা পরস্পরের সাথে এমন আচরণ করেছেন, যাতে মনে হচ্ছে যে, আপনাদের মধ্যে রয়েছে পুরানো বিদ্বেষ এবং এ অবস্থায় ইনি অপরাধী হলেও এঁর ভাগ্য নির্ধারণের ভার আমি আপনার উপর সোপর্দ করবো না।'

'আপনার জানা উচিত যে, আপনি স্পেনের মুফতিয়ে আযমের সাথে কথা বলছেন।'

'আর আপনার জানা উচিত ছিলো যে, আমি স্পেনের শাসনকর্তা।'

'ঠিক, কিন্তু আপনি জানেন না যে, আমি স্পেনের মুফতিয়ে আযমের চাইতে বেশী আরো কিছু।'

নয়ীম বললেন, 'উনি জানেন না। আমি বলে দিচ্ছি। আপনি আমীরুল মুমেনিনের দোস্ত এবং কুতায়বা বিন মুসলিম, মুহাম্মদ বিন কাসিম ও ইবনে আমেরের হত্যাকারী, তুর্কিস্তানের বিদ্রোহের মূলে ছিলো আপনার অনুগ্রহ। আর আপনি সেই নির্মম নিষ্ঠুর লোকটি, যিনি আপন ভাই ও ভাতিজীকে কতল করতে দ্বিধা করেননি। এখন আপনি আমার কাছে অপরাধী।' নয়ীম বিজলী চমকের মতো কোষ থেকে তলোয়ার বের করলেন এবং তার অগ্রভাগ ইবনে সাদেকের সিনার উপর রেখে বললেন, 'আমি বহুত খুঁজেছি তোমায়, কিন্তু পাইনি। আজ কুদরৎ তোমায় এনেছেন এখানে। আমীরুল মুমেনিনের দোস্ত তুমি। তোমার পরিণাম তাঁর খুবই মর্মবেদনার কারণ হবে, কিন্তু আমার কাছে ইসলামের ভবিষ্যৎ খলিফার খুশীর চাইতে অধিকতর প্রিয়।'

নয়ীম তলোয়ার উচুঁ করলেন। ইবনে সাদেক কাঁপতে লাগলো বেতসের মতো। মৃত্যুকে মাথার উপর দেখে সে চোখ বন্ধ করলো। নয়ীম তার অবস্থা দেখে তলোয়ার নীচু করে বললেন, 'না, তা হয় না। এ তলোয়ার দিয়ে আমি সিন্ধু ও তুর্কিস্তানের ময়দানে কতো উদ্ধত শাহযাদার গর্দান উড়িয়ে দিয়েছি। তোমার মতো নীচু ভীরু বুযদীলের খুনে আমি তলোয়ার রঞ্জিত করবো না।' নয়ীম তাঁর তলোয়ার কোষবদ্ধ করলেন। কামরায় ছেয়ে গেলো এক গভীর নিস্তব্ধতা।

এক ফউজী অফিসার এসে ভাঙলেন কামরার নিস্তব্ধতা। তিনি এসেই একটা চিঠি দিলেন আন্দালুসের ওয়ালীর হাতে। ওয়ালী চিঠিখানা বিস্ফারিত চোখে দুতিনবার পড়ে নয়ীমের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যদি আপনার নাম যোবায়ের না হয়ে নয়ীম হয়ে থাকে, তাহলে আপনার জন্যও খবর আছে এ চিঠিতে।' বলতে বলতে তিনি চিঠিখানা বাড়িয়ে দিলেন নয়ীমের দিকে। নয়ীম চিঠি নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। আমীরুল মুমেনিন উমর বিন আবদুল আযীযের তরফ থেকে চিঠি।

আন্দালুসের ওয়ালী তালি বাজালেন। অমনি কয়েকজন সিপাহী এসে দেখা দিলো।

'ওকে গ্রেফতার করো।' ইবনে সাদেকের দিকে ইশারা করে তিনি বললেন।

ইবনে সাদেকের ধারণাই হয়নি যে, তার তকদীরের সিতারা উদয়ের সাথে সাথেই ঢেকে যাবে এমনি কালো মেঘে।

একদিকে নয়ীম দক্ষিণ পর্তুগালের দিকে চলে যাচ্ছেন শাসনকর্তার পদ গ্রহণের জন্য, অপর দিকে কয়েকজন সিপাহী ইবনে সাদেকের পা শিকলে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে দামেস্কের পথে।

কয়েকদিন পর নয়ীম জানালেন যে, ইবনে সাদেক দামেস্ক পৌছবার আগেই পথে বিষ খেয়ে তার যিন্দেগী শেষ করে দিয়েছে।

আব্দুল্লাহকে চিঠি লিখে নয়ীম ঘরের খবর জানবার চেষ্টা করলেন। বহুদিন সে চিঠির জওয়াব মিললো না। নয়ীম ইনতেযার করতে করতে অধীর হয়ে তিন মাসের ছুটি নিয়ে গেলেন বসরার দিকে। নার্গিস তখনো তাঁর সাথে। তাই সফরে বিলম্ব হলো। ঘরে পৌছে তিনি জানলন, আবদুল্লাহ খোরাসানে চলে গেছেন।' উযরাকেও নিয়ে গেছেন সাথে। নয়ীম খোরাসান যেতে চাইলেন, কিন্তু স্পেনের উত্তর দিকে ইসলামী ফউজের অগ্রগতির কারণে তিনি নিজের ইরাদা মুলতবী রেখে ফিরে গেলেন নিরুপায় হয়ে।

পনেরো

দিন আসে, দিন যায়..............।

এমনি করে কতো মাসের পর মাস, বছরের পর বছর মিশে যায় অতীতের কোলে। নয়ীম দক্ষিণ পর্তুগালের শাসনকর্তার পদ গ্রহণের পর কেটে যায় আঠারো বছর। তাঁর যৌবন চলে গিয়ে আসে বার্ধক্য। কালো দাড়ি সাদা হয়ে আসে। নার্গিসের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, কিন্তু তাঁর দেহ-সৌন্দর্যে তেমন কোনো পরিবর্তন নেই।

তাঁদের বড় ছেলে আবদুল্লাহ বিন নয়ীম পনেরো বছরে পা দিয়ে ভর্তি হয়েছেন স্পেনের ফউজে। তিন বছরের মধ্যেই তাঁর খ্যাতি এমন করে ছড়িয়ে পড়েছে যে, বাহাদুর পুত্ররত্নের গর্বে ফুলে ওঠে নার্গিস ও নয়ীমের বুক। দ্বিতীয় পুত্র হোসেন বড়ো ভাইয়ের চাইতে আট বছরের ছোট।

একদিন হোসেন বিন নয়ীম বাড়ির আঙিনায় এক কাঠের ফলককে লক্ষ্যস্থল বানিয়ে তীরন্দাযীর অভ্যাস করছে। নার্গিস ও নয়ীম বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছেন তাঁদের জিগরের টুকরার দিকে। হোসেনের কয়েকটি তীর নিশানায় লাগলো না। নয়ীম হাসিমুখে হোসেনের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। হোসেন লক্ষ্য স্থির করে বাপের দিকে তাকিয়ে নিশানা করলো।

'বেটা, তোমার হাত কাঁপছে আর তোমার গর্দান উঁচু করে রেখেছো।'

'আব্বাজান, আপনি যখন আমার মতো ছিলেন, তখন আপনার হাত কাঁপতো না?'

'তোমার বয়সে আমি উড়ন্ত পাখীকে যমিনে ফেলে দিয়েছি, আর যখন আমি এর চাইতে চার বছরের বড় ছিলাম, তখন আমি বসরার ছেলেদের মধ্যে সবচাইতে বড়ো তীরন্দায বলে নাম করেছিলাম।'

'আব্বাজান, আপনি নিশানা লাগিয়ে দেখুন না।'

নয়ীম তাঁর হাত থেকে ধনুক নিয়ে তীর চালালে তীরটি গিয়ে লাগলো লক্ষ্যের ঠিক মাঝখানে। তারপর তিনি পুত্রকে নিশানা লাগাবার তরিকা বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। নার্গিসও এসে দাঁড়ালেন তাঁদের কাছে।

এক নওজোয়ান ঘোড়া ছুটিয়ে এসে দাঁড়ালেন বাড়ির ফটকে। নওকর ফটক খুললো। সওয়ার ঘোড়ার বাগ নওকরের হাতে দিয়ে ছুটে গিয়ে ঢুকলেন বাড়ির আঙিনায়।

নয়ীম পুত্র আবদুল্লাহকে দেখে তাঁকে বুকে চেপে ধরলেন। নার্গিস হাজারো দোআ-ভরা দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে কাছে এসে বললেন, 'বেটা, তুমি এসেছো? আলহামদুলিল্লাহ।'

নয়ীম জিজ্ঞেস করলেন, 'কি খবর নিয়ে এলো বেটা?'

আবদুল্লাহ বিন নয়ীম মাথা নত করে বিষণ্ণ মুখে বললেন, 'আব্বাজান, কোনো ভালো খবর নেই। ফ্রান্সের লড়াইয়ে কঠিন ক্ষতির স্বীকার করে ফিরে এসেছি আমরা। ফ্রান্সের অনকগুলো এলাকা আমরা জয় করে প্যারী নগরীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন খবর পেলাম, ফ্রান্সের রাজা একলাখ ফউজ নিয়ে মোকাবেলা করতে আসছেন আমাদের। আমাদের ফউজ আঠারো হাজারের বেশী ছিলো না। আমাদের সিপাহসালার ওকবা কর্ডোভা থেকে সাহায্য চেয়ে পাঠালেন, কিন্তু সেখান থেকে খবর এলো যে, মারাকেশে বিদ্রোহ শুরু হয়েছে এবং ফ্রান্সের দিকে বেশি সংখ্যক ফউজ পাঠানো যাবে না। নিরুপায় হয়ে আমরা ফ্রান্সের রাজকীয় বাহিনীর মোকাবিলা করলাম এবং আমাদের অর্ধেকের বেশি সিপাহী ময়দানে ভূপাতিত হলো।'

'আর ওকবা এখন কোথায়?' নয়ীম প্রশ্ন করলেন।

'তিনি কর্ডোভায় পৌঁছে গেছেন এবং শিগগীরই মারাকেশের দিকে অগ্রসর হবেন। বিদ্রোহের আগুন মারাকেশ থেকে ছড়িয়ে পড়ছে তিউনিসের দিকে। বার্বার বাহিনী তামাম মুসলমান হাকীমকে কতল করে ফেলেছে। জানা গেছে যে, এ বিদ্রোহে খারেজী ও রোমীয়দের হাত আছে।'

নয়ীম বললেন, 'ওকবা এক বাহাদুর সিপাহী বটে, কিন্তু যোগ্য সিপাহসালার নয়। আমায় ফউজে নেবার জন্য আমি স্পেনের ওয়ালীকে লিখেছিলাম, কিন্তু তিনি মানলেন না।'

'আচ্ছা আব্বাজান, আমায় এযাযত দিন।'

'এযাযত! কোথায় যাবে তুমি?' নার্গিস প্রশ্ন করলেন।

'আম্মিজান, আপনাকে ও আব্বাজানকে দেখে যেতেই শুধু এসেছিলাম। ফউজের সাথে আমায় যেতে হবে মারাকাশের দিকে।'

'আচ্ছা খোদা তোমার হেফাযত করুন।' নয়ীম বললেন।

'আচ্ছা আম্মি, খোদা হাফিয!' বলে আবদুল্লাহ হোসেনকে একবার বুকের সাথে লাগিয়ে তেমনি দ্রুতগতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে চলে গেলেন।

বার্বারদের বিদ্রোহে হাজার হাজার মুসলমানের প্রাণহানি হলো। তারা মুসলমান হাকীমদের হত্যা করে স্বাধীনতা ঘোষণা করলো।

ওকবা মারাকেশের উপকূলে অবতরণ করলেন এবং ১২৩ হিজরীতে শাম থেকে কিছুসংখ্যক ফউজ পৌছলো তাঁর সাহায্যের জন্য। মারাকেশে ঘোরতর লড়াই হলো। বার্বার সেনাবাহিনী চারদিক থেকে বেরিয়ে এলো সয়লাভের মতো। হিস্পানিয়া ও শামের সেনাবাহিনী ভীষণভাবে তাদের মোকাবিল করলো, কিন্তু অগণিত প্রতিদ্বন্দ্বী ফউজের সামনে তারা টিকতে পারলেন না। ওকবা লড়াইয়ের ময়দানে শহীদ হলেন এবং মুসলিম ফউজের মধ্যে দেখা দিলো বিশৃংখলা। বার্বাররা চারদিক থেকে বেষ্টন করে তাদেরকে কতল করতে লাগলো।

নয়ীমের বেটা আবদুল্লাহ দুশমনদের সারি ভেদ করে এগিয়ে গেলেন বহুত দূরে এবং যখমী হয়ে যখন তিনি ঘোড়া থেকে পড়ে যাচ্ছিলেন, তখন এক আরবী সালার তাঁর কোমরে হাত দিয়ে তাঁকে তুলে বসালেন ঘোড়ার উপর এবং তাকে নিয়ে পৌছে দিলেন ময়দানের বাইরে এক নিরাপদ জায়গায়।

হিস্পানিয়া ও শামের সেনাবাহিনীর প্রায় তিন-চতুর্থাংশ নিহত হলো, বাকী সিপাহীরা সরে যেতে লাগলো এক দিকে। বার্বাররা তাদেরকে পিছপা হতে দেখে অনুসরণ করলো কয়েক মাইল। পরাজিত ফউজ আলজাযায়ের গিয়ে দম ফেললো।

স্পেনের ওয়ালীর কাছে এ পরাজয়ের খবর পৌছলে তিনি হিস্পানিয়ার সব প্রদেশ থেকে নয়া ফউজ সংগ্রহের চেষ্টা করলেন এবং এই নয়া লশকরের নিতৃত্ব নেবার জন্য নির্বাচন করলেন নয়ীমকে। নয়ীম তাঁর বেটার চিঠিতে তাঁর যখমী হবার ও এক আরব সালারের ত্যাগ স্বীকারের ফলে জানে বেঁচে যাবার খবর পেয়েছেন আগেই। ১২৫ হিজরীতে যখন বার্বার বাহিনী তামাম উত্তর আফ্রিকায় যুলুমের তান্ডব-নৃত্য চালিয়ে যাচ্ছিলো, তখন নয়ীম আচানক দশ হাজার সিপাহী নিয়ে অবতরণ করলেন আফ্রিকার উপকূলে। বার্বাররা তাদের আগমন সম্পর্কে ছিলো বেখবর! নয়ীম তাদেরকে বারংবার পরাজিত করে এগিয়ে চললেন পূর্ব দিকে।

ওদিকে আলজাযায়ের থেকে পরাজিত সৈনিকরাও শুরু করলো অগ্রগতি। বার্বারদের দমন করা হতে লাগলো দুদিক থেকে। এক মাসের মধ্যে ঠান্ডা হয়ে গেলো মারাকেশের বিদ্রোহের আগুন, কিন্তু আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব এলাকার কোথাও কোথাও তখনো পাওয়া যাচ্ছে এ বিপদের আভাস। খারেজী ও বার্বাররা মারাকেশ থেকে সরে গিয়ে তিউনিসকে করলো তাদের কর্মকেন্দ্র। নয়ীম তখন মারাকেশের ব্যবস্থাপনা নিয়ে ব্যস্ত। তাই তিন তিউনিসের দিকে যেতে পারলেন না। তিনি ফউজের বাছাই করা অফিসারদের নিজের খিমায় একত্র করে এক তেজোব্যঞ্জক বক্তৃতা করে বললেন,

www.banglabookpdf.blogspot.com

'তিউনিসের উপর হামলা করবার জন্য একজন জীবন পণকারী সালারের প্রয়োজন। আপনাদের মধ্যে কে আছেন এ খেদমতের যিম্মা নিতে তৈরী?'

নয়ীমের কথা শেষ না হতেই তিনজন মুজাহিদ উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁদের মধ্যে একজন তাঁর পুরানো দোস্ত ইউসুফ, দ্বিতীয় তাঁর নওজোয়ান বেটা আবদুল্লাহ, আর তৃতীয় নওজোয়ানের চেহারা-আকৃতি আবদুল্লাহর সাথে অনেকটা মেলে, কিন্তু নয়ীম তাঁকে চেনেন না।

'তোমার নাম কি?' নয়ীম প্রশ্ন করলেন।

'আমার নাম নয়ীম।' নওজোয়ান জওয়াব দিলেন।

'নয়ীম বিন?'

'নয়ীম বিন আবদুল্লাহ।' নওজোয়ান জওয়াব দিলেন।

'আবদুল্লাহ? আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান?' নয়ীম প্রশ্ন করলেন।

'জি হ্যাঁ।

নয়ীম এগিয়ে এসে নওজোনাকে বুকে চেপে ধরলেন। তারপর বললেন, 'আমায় চেনো তুমি?'

'জি হ্যাঁ, আপনি আমাদের সিপাহসালার।'

'তাছাড়া আমি আরো কিছু।' নওজোয়ানের দিকে সন্দেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে নয়ীম বললেন, 'আমি তোমার চাচা। আবদুল্লাহ, এ তোমার ভাই।'

'আব্বাজান! ইনিই আমার জান বাঁচিয়েছিলেন মারাকেশের লড়াইয়ের সময়।'

'ভাইজান কেমন আছেন?' নয়ীম প্রশ্ন করলেন।

'দু বছর হলো, তিনি শহীদ হয়েছেন। এক খারেজী তাঁকে কতল করেছিলো।'

নয়ীমের দীল ধড় ফড় করে উঠলো। খানিকক্ষণ তিনি নীরব রইলেন। হাত তুলে তিনি মাগফেরাতের জন্য দোআ করে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার ওয়ালিদা?'

'তিনি ভালো আছেন।'

'তোমার ভাই কটি'?

'এক ভাই আর একটি ছোট বোন।'

নয়ীম বাকি অফিসারদের বিদায় করে তাদের যাবার পর নিজের কোমর থেকে তলোয়ার খুলে নয়ীম বিন আবদুল্লাহকে দিতে দিতে বললেন, 'তুমি এ আমানতের হকদার, আর তুমি এখানেই থাক। আমি নিজেই যাব তিউনিসের দিকে।'

'চাচাজান, আমায় কেন পাঠাচ্ছেন না।?'

'বেটা, তুমি জোয়ান। তোমরা দুনিয়ার প্রয়োজনে আসবে। আজ থেকে তুমি এখানকার সেনাবাহিনীর সিপাহসালার।.....আবদুল্লাহ ইনি তোমার বড় ভাই। এঁর হুকুম দীল-জান দিয়ে মেনে নেবে।'

নয়ীম বিন আবদুল্লাহ বললেন, 'চাচাজান, আপনার কাছে কিছু বলবার আছে আমার।'

'বলো বেটা।'

'আপনি ঘরে যাবেন না।?'

'বেটা, তিউনিস অভিযানের পর আমি শিগগীরই যাবো।'

'চাচাজান, আপনি অবশ্যি যাবেন। আম্মিজান প্রায়ই আপনাকে মনে করেন। আমার ছোট বোন আর ভাইও আপনার কথা বলে বারবার।'

'তিনি কি জানেন যে, আমি যিন্দাহ রয়েছি?'

'আম্মিজানের বিশ্বাস ছিলো যে, আপনি যিন্দাহ রয়েছেন। তিনি আমায় মারাকেশ অভিযানের পর স্পেনে গিয়ে আপনাকে তালাশ করবার তাকিদ করেছেন এবং চাচীজানকে নিয়ে আপনাকে ঘরে তশরীফ নিতে বলেছেন।'

'আমি খুব শিগগীরই ওখানে পৌছে যাবো। আবদুল্লাহ্ তুমি আন্দালুস চলে যাও। ওখান থেকে তোমার মাকে নিয়ে খুব শিগগীরই ঘরে পৌছে যাবে। তিউনিস থেকে কর্তব্য শেষ করে আমি আসবো। আমি আন্দালুসের ওয়ালীকে চিঠি লিখছি। তিনি তোমাদের সাগর-পথে সফরের ইনতেযাম করে দেবেন।

তিউনিসে বিদ্রোহীদের মোকাবিলা করতে গিয়ে নয়ীমকে বহুবিধ অপ্রত্যাশিত অসুবিধার সম্মুখীন হতে হলো। বারবার বিদ্রোহীরা এক জায়গায় পরাজয় স্বীকার করে অপর জায়গায় গিয়ে লুট-পাট করতে লাগলো। কয়েক মাসের মধ্যে কয়েকটি সংঘর্ষের পর তিনি তিউনিসের বিদ্রোহ দমন করলেন। তিউনিস থেকে বিদ্রোহী দল পিছপা হয়ে ছড়িয়ে পড়লো পূর্ব দিকে। নয়ীম বিদ্রোহীদের দমন করবার সিদ্ধান্ত স্থির করে এগিয়ে চললেন সামনের দিকে। তিউনিস ও কায়রোয়ানদের মাঝখানে বিদ্রোহীরা কয়েকবার মোকাবিলা করলো নয়ীমের ফউজের সাথে কিন্তু তাদেরকে পরাজয় বরণ করতে হলো। কায়রোয়ানের কাছে যে শেষ লড়াই হলো, তাতে নয়ীম যখমী হলেন গুরুতররূপে। অজ্ঞান অবস্থায় তাঁকে নেয়া হলো কায়রোয়ানে। সেখানকার শাসনকর্তা তাকে নিজের কাছে রেখে তার এলাজ করাবার জন্য ডাকলেন এক অভিজ্ঞ চিকিৎসককে। বহুক্ষণ পর নয়ীমের হুঁশ ফিরে এলো, কিন্তু বহু পরিমাণ রক্ত ক্ষয় হবার ফলে তিনি এতটা কমজোর হয়ে পড়লেন যে, তিনি দিনের মধ্যে কয়েকবার মূর্ছা যেতে লাগলেন। এক হফতা কাল নয়ীম জীবন-মৃত্যুর সংঘাতের ভিতরে বিছানায় পড়ে রইলেন। তাঁর অবস্থা দেখে কায়রোয়ানদের ওয়ালী ফুসতাত থেকে এক মশহুর হাকীমকে ডেকে পাঠালেন। হাকীম নয়ীমের যখম পরীক্ষা করে তাঁকে আশ্বাস দিলেন, কিন্তু এও বললেন যে, তাঁকে দীর্ঘকাল শুয়ে শুয়ে কাটাতে হবে।

তিন হফতা পর নয়ীমের অবস্থা কিছুটা ভালো হলে তিনি ঘরে ফিরে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, কিন্তু হাকীম বললেন, 'যখম এখনো সারেনি। সফরে ওগুলো ফেটে যাবার আশংকা রয়েছে। তাই আপনাকে কম-সে-কম আরো এক মাস এলাজ করাতে হবে। আমার ভয় হচ্ছে, কোন বিষাক্ত হাতিয়ার থেকে এসব আঘাত লেগেছে, হয়তো রক্ত বিষাক্ত হয়ে আবার খারাপ কিছু হতে পারে।'

নয়ীম আর এক হফতা দেরী করলেন, কিন্তু ঘরে ফিরে যাবার জন্য তাঁর বেকারারী বেড়ে চললো প্রতি মুহূর্তে। বিছানায় পড়ে এ পাশ ওপাশ করে তিনি কাটিয়ে দেন সারা রাত। মন চায়, আর একবার তিনি উড়ে যান তার দুনিয়ার বেহেশতে।

তাঁর বিশ্বাস, নার্গিস পৌঁছে গেছেন সেখানে। উযরার সাথে বালুর টিবির উপর দাঁড়িয়ে তিনি দেখছেন তাঁর পথ চেয়ে।

আরো বিশ দিন চলে গেলো। যে যখম কতকটা সেরে এসেছিলো, তা আবার খারাপ হতে লাগলো। আর হালকা হালকা জ্বরও হতে লাগলো। হাকীম তাঁকে বললেন যে, এসব বিষাক্ত হাতিয়ারের যখমের ফল। তাঁর শিরা-উপশিরায় বিষ-ক্রিয়া হয়ে গেছে। বেশ কিছুদিন সেখানে থেকে এলাজ করাতে হবে।

একদিন মধ্যরাত্রের কাছাকাছি সময়ে বিছানায় শুয়ে চিন্তা করছেন, ঘরে ফিরে তিনি উযরাকে কি অবস্থায় দেখবেন। সময় তাঁর নিষ্পাপ মুখে কতোটা পরিবর্তন এনেছে। তাঁর বিষাদক্লিষ্ট রূপ দেখে কি ভাবের উদয় হবে তাঁর মনে। তাঁর মনে আরো খেয়াল জাগে, হয়তো এখনো তাঁর ঘরে ফিরে যাওয়া কুদরতের মনযুর নয়। তিনি আগেও কত বার যখমী হয়েছেন। কিন্তু এবারকার যখমের অবস্থা অন্য রকম। তিনি মনে মনে বলেন, 'এই যখমের ফলেই হয়তো আমি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বো, কিন্তু নার্গিস ও উযরার কাছে কত কথা আছে বলবার, নিজের ছেলে ও ভাতিজাদেরকে কত উপদেশ দেওয়া দরকার। মৃত্যুর ভয় নেই আমার। মৃত্যুকে নিয়ে তো হামেশা আমি খেলেছি, কিন্তু, এখানে শুয়ে শুয়ে মওতের ইনতেযার আমি করবো না। 'উযরা আমায় ঘরে ফিরে যাবার পয়গাম পাঠিয়েছে।... সেই 'উযরা—যাঁর মামুলী ইচ্ছার জন্য আমি জীবন বাজি রাখা সহজ মনে করেছি। তাছাড়া নার্গিসের অবস্থাই বা কি হবে? আমি অবশ্যি চলে যাবো, কেউ আমায় ফিরাতে পারবে না।'

বলতে বলতে নয়ীম বিছানায় উঠে বসলেন। মুজাহিদের দৃঢ় সংকল্প শারীরিক কমযোরীর উপর হলো জয়ী। মানসিক প্রেরণার বলে তিনি উঠে টহল দিতে লাগলেন কামরার মধ্যে। তিনি যখমী, তা তাঁর মনে নেই। তার শারীরিক অবস্থা দীর্ঘ সফরের উপযোগী নয়, তা তিনি ভুলে গেছেন বিলকুল। তখন তার কল্পনায় ভেসে বেড়াচ্ছে শুধু নার্গিস, 'উযরা, আবদুল্লার ছোট ছোট বাচ্চা আর বস্তির সুদৃশ্য বাগ-বাগিচার রূপ। 'আমি নিশ্চয়ই চলে যাবো' এই হলো তাঁর শেষ সিদ্ধান্ত।

তিনি কামরার ভিতর টহল দিতে দিতে আচানক থেমে গেলেন। মেযবানের নওকরকে তিনি আওয়ায দিলেন। নওকর ছুটে এসে কামরায় ঢুকে নয়ীমকে শুয়ে না থেকে পায়চারী করতে দেখে হতভম্ব হয়ে গেলো।

'হাকীম সাহেবের হুকুম, আপনি চলা-ফের করবেন না।' সে বললো।

'তুমি আমার ঘোরা তৈরী করে দাও।'

'আপনি কোথায় যাবেন?'

'তুমি ঘোড়া তৈরী করোগে।'

'কিন্তু এখন?'

'এখখুনি।' নয়ীম কঠোর স্বরে বললেন।

'রাতের বেলা আপনি কোথায় যাবেন?'

'যা তোমায় বলেছি তাই করো। কোনো বাজে প্রশ্নের জওয়াব নেই আমার কাছে।'

নওকর ঘাবড়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলো।

নয়ীম আবার বিছানার উপর বসে ভাবনার দুনিয়ায় হারিয়ে ফেললেন আপনাকে।

খানিকক্ষণ পর নওকর ফিরে এসে বললো 'ঘোড়া তৈরী, কিন্তু.....'

নয়ীম তার কথার মাঝখানে জওয়াব দিলেন, 'তুমি কি বলতে চাও, তা আমি জানি। আমার একটা জরুরী কাজ রয়েছে। তোমার মালিককে বলবে, তাঁর এযাযত হাসিল করবার জন্য এত রাত্রে তাঁকে জাগানো আমি ঠিক মনে করিনি।'

ভোর হবার আগেই নয়ীম কায়রোয়ান থেকে দুই মনযিল আগে চলে গেছেন। এতটা পথ তিনি বেশ হুঁশিয়ার হয়ে চলেছেন। ঘোড়া তিনি জোরে হাঁকান নি। এক এক মনযিলের পর খানিকটা বিশ্রাম করেছেন। ফুসতাতে গিয়ে তিনি দুদিন সেখানে থাকলেন। সেখানকার শাসনকর্তা নয়ীমকে তাঁর কাছে থাকতে অনুরোধ করলেন, কিন্তু নয়ীম যখন কিছুতেই রাযী হলেন না, তখন তিনি পথের সব চৌকিকে জানিয়ে দিলেন তাঁর আগমন-সংবাদ। তাঁর সফরে যাবতীয় স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তিনি হুকুম জারী করলেন।

নয়ীম যতোই এগিয়ে যান মনযিলে মুকসুদের দিকে, ততোই ভালো বোধ করেন তাঁর শরীরের অবস্থা। কয়েকদিন পর তিনি এক মরু-প্রান্তর অতিক্রম করে চলেছেন। কয়েক ক্রোশ পরেই তাঁর বস্তি। প্রতি পদক্ষেপে তার মনে জাগে নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষা। আনন্দ-সাগরে ভেসে চলে তাঁর মন। আচানক ধূলি-রাশি দেখা গেলো। পূর্ব-দিগন্তে খানিকক্ষণ পর অন্ধকার ধূলিঝড় ছেয়ে ফেললো চারদিক। চারদিক ধূলোর অন্ধকার। মরুভূমির তুফানের খবর নয়ীম জানেন ভালো করে। তিনি চাইলেন মরুঝড়ের মুসীবতে পড়বার আগেই ঘরে পৌঁছতে। ঘোড়ার গতি দ্রুতত হয়ে উঠলো। প্রথম ঝাপটা তিনি ঘোড়া ছুটিয়েছেন পূর্ণ গতিতে। হাওয়ার তেয আর চারদিকের অন্ধকার বেড়ে চলেছে। ঘোড়া ছুটানোর ফলে নয়ীমের সিনার যখম ফেটে রক্তধারা গড়িয়ে পড়ছে। সেই অবস্থায় তিনি অতিক্রম করেছেন দুই ক্রোশ। তুফানের হামলা চলছে পূর্ণবিক্রমে, ঝলসে-ওঠা বালু ছুটে আসছে তাঁর দিকে। ঘোড়া চলবার পথ না পেয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। নিরুপায় হয়ে নয়ীম ঘোড়া থেকে নেমে ঝড়ের দিকে পিছ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। ঘোড়াও মালিকেরই মতো মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নয়ীম তাঁর মুখ ছুটে আসা বালু থেকে বাঁচাবার জন্য মুখ-ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়েছেন। বাবলা কাঁটা আর ডালপালা হাওয়ার বেগে ছুটে এসে তাঁর গায়ে লেগে চলে যাচ্ছে। নয়ীম এক হাতে ঘোড়ার বাগ ধরে অপর হাতে নিজের কাপড়-চোপড় থেকে কাঁটা-ডাল ছাড়াচ্ছিলেন। ঘোড়ার বাগের উপর তাঁর হাতের চাপ ঢিলা হয়ে এসেছে। হঠাৎ বাবলার একটা শুকনো ডাল উড়ে এসে ঘোড়ার পিঠে লাগলো বেশ জোরে। ঘোড়াটা এক লাফে নয়ীমের হাত ছাড়িয়ে গিয়ে দাঁড়ালো কিছুটা দূরে। আর একটা কাঁটার ডাল এসে ঘোড়ার কানে কাঁটা ফুটিয়ে চলে গেলে ঘোড়াটা একদিকে ছুটে পালালো। নয়ীম বেশ কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন অসহায় অবস্থায়। সিনার যখম ফেটে তাঁর কামিয রক্তধারায় প্লাবিত হয়ে গেছে

আর মুহূর্তে মুহূর্তে নিঃশেষ হয়ে আসছে তার দেহের শক্তি। ভয়ে তিনি উঠে কাপড় ঝাড়েন, আবার বসে পড়েন। কিছুক্ষণ পর রাত্রির নিকষ কালো আবরণ আরো বাড়িয়ে তুললো ঝড়ের অন্ধকার। রাত্রি এক প্রহর কেটে যাবার পর হাওয়ার বেগ হলো শেষ। ধীরে ধীরে আসমান সাফ হলে হেসে উঠলো দীপ্তিমান সিতারারাজি।

নয়ীমের বস্তি আট ক্রোশ দূরে। ঘোড়াটি কোথায় চলে গেছে। পায়ে নেই চলবার তাকৎ। পিপাসায় তাঁর গলা শুকিয়ে এসেছে। তার মনে খেয়াল এলো, ভোর হবার আগে এ বালুর সমুদ্র পাড়ি দিয়ে কোন নিরাপদ জায়গায় না পৌছলে দিনের প্রখর রৌদ্রে তাঁকে মরতে হবে ধুঁকে ধুঁকে।

নক্ষত্রের স্তিমিত আলোয় পথ দেখে নিয়ে তিনি চলতে লাগলেন পায়ে হেঁটে। এক ক্রোশ গিয়ে তাঁর পা আর চলে না। হতাশ হয়ে তিনি শুয়ে পড়লেন বালুর উপর। মনযিলের এতো কাছে এসে হিম্মৎ হারানো মুজাহিদের সংকল্প ও সহিষ্ণুতার খেলাফ। তিনি আর একবার কাঁপতে কাঁপতে উঠে পা বাড়ালেন মনজিলে মকসুদের দিকে। বালুর মধ্যে পা বসে যায়। চলতে চলতে তিনবার তিনি পড়ে গেলেন। আবার সংকল্প দৃঢ় করে উঠে তিনি এগিয়ে চলবার চেষ্টা করলেন। পিপাসায় গলা শুকিয়ে আসছে আর কমযোরীর দরুন তাঁর চোখে ছেয়ে আসছে অন্ধকার। মাথা ঘুরছে ভীষণভাবে। বস্তি এখনো চারক্রোশ দূরে। তিনি জানেন, বস্তির দিকে প্রবহমান নদীটি এখান থেকে কাছে। তিনি কাঁপতে কাঁপতে একবার পড়ে আবার উঠে আরো এক ক্রোশ গেলে তার নযরে পড়লো তাঁর বহু পরিচিত নদীটি।

নদীর পানি ঝড়ের ধূলোবালুতে ময়লা হয়ে গেছে। নদীর পানিতে ভাসছে বেশুমার ডালপালা। নয়ীম সাধ মিটিয়ে পান করলেন নদীর পানি। নদীর কিনারে খানিক্ষণ শুয়ে থেকে তাঁর দীলে এসেছে কিছুটা শান্তি। তাই তিনি আবার শুরু করলেন পথ চলা।

নদী পার হলে তাঁর নযরে পড়লো বস্তির পাশের বাগ-বাগিচা। ক্লান্তি ও দৈহিক কমযোরীর অনুভূতি কমে এলো অনেকখানি। প্রতি পদক্ষেপে বেড়ে যাচ্ছে তাঁর চলার বেগ। খানিকক্ষণ পরেই তিনি পার হতে লাগলেন বালুর টিবি—যেখানে ছেলেবেলায় তিনি খেলা করতেন উযরাকে নিয়ে, গড়ে তুলতেন ছোট ছোট বালুর ঘর। তারপর উচুঁ খেজুর গাছগুলোর ভিতর দিয়ে এগিয়ে গেলেন নিজের ঘরের দিকে। কম্পিত বুক চেপে ধরে কিছুক্ষণ তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন দরযায়। তারপর সাহস করে দরযায় করাঘাত করলেন। ঘরের বাসিন্দারা একে অন্যকে জাগাতে লাগলেন। এক যুবতী এসে দরযা খুললো। নয়ীম হয়রান হয়ে যুবতীর দিকে তাকালেন। এযে হুবহু উযরারই চেহারা। নয়ীমকে দেখে মেয়েটি ফিরে গেলো ঘরের ভিতরে। একটু পরেই তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ ও নার্গিস এসে হাযির হলেন অভ্যর্থনা জানাতে। আবদুল্লাহ ও নার্গিসের পিছনে কম্পিত পদে এসে দাঁড়ালেন উযরা।

চাঁদের রোশনীতে নয়ীম দেখলেন, সৃষ্টির সৌন্দর্য-রাণীর যৌবনের দীপ্তিতে ভাটা এলেও তাঁর মুখের যে মোহময় আকর্ষণ, আজো তা অব্যাহত রয়েছে।

'বোন!' নয়ীম বেদনার্ত আওয়াজে ডাকলেন।

'ভাই!' উযরা অশ্রুসজল চোখে জওয়াব দিলেন।

নার্গিস এগিয়ে ভালো করে তাকালেন নয়ীমের দিকে। তার কামিযে রক্তের দাগ দেখে ঘাবড়ে বললেন, 'আপনি যখমী!'

'যখমী!' উযরা সন্ত্রস্ত মুখে বললেন।

এতক্ষণ যে দৃঢ় সংকল্প তার দৈহিক শক্তিকে অটুট রেখেছিলো, তা মুহূর্তে ভেঙে পড়লো।

তিনি বললেন, 'আবদুল্লাহ—বেটা, আমায় ধরো।'

আবদুল্লাহ্ তাঁকে ধরে ভিতরে নিয়ে গেলেন।

ভোর বেলায় নয়ীম বিছানায় শুয়ে রয়েছেন। নার্গিস, উযরা, আবদুল্লাহ্ বিন্ নয়ীম, হোসেন বিন্ নয়ীম, উযরার ছোট ছেলে খালেদ ও মেয়ে আমিনা তাঁর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়িয়ে। নয়ীম চোখ খুলে সবার দিকে তাকালেন। ইশারায় খালেদ ও আমিনাকে ডেকে তিনি কাছে বসালেন।

'বেটা, তোমার নাম কি?'

'খালেদ।'

'আর তোমার?' মেয়েটিকে লক্ষ্য করে নয়ীম প্রশ্ন করলেন।

'আমিনা।' সে জওয়াব দিলো। খালেদের বয়স সতেরো বছরের কাছাকাছি মনে হয়। আমিনার চেহারা দেখে বয়স চৌদ্দ পনেরো অনুমান করা যায়।

নয়ীম খালেদকে লক্ষ্য করে বললেন, 'বেটা, আমায় কোরআন পাক পড়ে শোনাও।'

খালেদ শিরীণ আওয়াযে সুরায়ে ইয়াসীন তেলাওয়াত শুরু করলেন।

পরদিন ফেটে যাওয়া যখম আরো বেশী কষ্টদায়ক হয়ে উঠলো। নয়ীমের ভীষণ জ্বর দেখা দিলো। সিনার যখম থেকে ক্রমাগত রক্ত ঝরছে। রক্ত কমে যাওয়ায় তিনি মূর্ছা যাচ্ছেন বারংবার। এমনি করে এক হফ্‌তা কেটে গেলো। আবদুল্লাহ্ বসরা থেকে এক হাকীম নিয়ে এলেন। তিনি প্রলেপ পট্টি বেঁধে দিয়ে চলে গেলেন, কিন্তু তাতে কোনো ফায়দা হলো না।

নয়ীম একদিন খালেদকে প্রশ্ন করলেন, ' বেটা, তুমি এখনো জিহাদে যাওনি?'

'চাচাজান, আমি ছুটি নিয়ে এসেছি।' খালেদ জওয়াব দিলেন, 'আমার চলে যাবার কথা ছিলো কিন্তু' ....।

'তুমি চলে যাবে তো গেলে না কেন?'

'চাচাজান, আপনাকে এই অবস্থায় ফেলে .....।

'বেটা, জিহাদের জন্য মুসলমানকে ছেড়ে যেতে হয় দুনিয়ার সব চাইতে প্রিয় বস্তুকে। আমার জন্য চিন্তা করো না তুমি। তোমার ফরয তুমি পূর্ণ করো। তোমার ওয়ালেদা কি তোমায় শেখাননি যে, মুসলমানের সব চাইতে বড়ো ফরয হচ্ছে জিহাদ।'

'চাচাজান, আম্মিজান আমাদেরকে ছেলেবেলা থেকেই শিখিয়েছেন এ সবক। আমি একটা দিন শুধু আপনার শুশ্রূষার জন্য থেকে গেছি। আমার ভয় ছিলো, যদি আমি আপনাকে এই অবস্থায় ফেলে যাই, তাতে আপনি হয়তো রাগ করবেন।'

'আমার মাওলার খুশীতেই আমারও খুশী। যাও, আবদুল্লাহকে ডেকে নিয়ে এসো।'

খালেদ আর এক কামরা থেকে আবদুল্লাহকে ডেকে আনলেন। নয়ীম প্রশ্ন করলেন, 'বেটা, তোমার ছুটি এখনো শেষ হয়নি?'

'আব্বাজান, পাঁচ দিন আগে আমার ছুটি শেষ হয়ে গেছে।'

'তুমি কেন গেলে না, বেটা?'

'আব্বাজান, আমি আপনার হুকুমের ইনতেযার করছিলাম।'

নয়ীম বললেন, 'বেটা খোদা ও রসূলের হুকুমের পর আর কারুর হুকুমের প্রয়োজন নেই। যাও বেটা, যাও।'

'আব্বাজান! আপনার তবিয়ৎ কেমন?'

'আমি ভালোই আছি, বেটা!' নয়ীম মুখের উপর আনন্দের দীপ্তি টেনে আনবার চেষ্টা করে বললেন 'তুমি যাও।'

'আব্বাজান, আমরা তৈরী।'

খালেদ ও আবদুল্লাহ্ নিজ নিজ ঘোড়ায় যিন লাগাচ্ছেন। তাঁদের মায়েরা দু'জন কাছে দাঁড়ানো। নয়ীম তাঁদের চলে যাবার দৃশ্য চোখে দেখবার জন্য তাঁর কামরার দরজা খুলে রাখবার হুকুম দিলেন। তিনি বিছানায় শুয়ে শুয়ে আঙিনার দিকে তাকিয়ে দেখছেন। আমিনা প্রথমে তলোয়ার বেঁধে দিলো তার ভাই খালেদের কোমরে, তারপর লাজকুণ্ঠিতভাবে আবদুল্লাহ্র কোমরে। নয়ীম উঠে কামরার বাইরে যেতে চাইলেন, কিন্তু দু তিন কদম গিয়েই মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। আবদুল্লাহ্ ও খালেদ তাঁকে তুলবার জন্য ছুটে এলেন। কিন্তু তাঁদের আসার আগেই নয়ীম উঠে দাঁড়ালেন।

তিনি বললেন, 'আমি বিলকুল্ ঠিকই আছি। একটু পানি দাও।'

আমিনা পানির পিয়ালা এনে দিলো। নয়ীম পানি পান করে আঙিনায় এসে দাঁড়ালেন।

'বেটা, তোমরা ঘোড়া ছুটিয়ে যাবে, তাই আমি দেখবো এখানে দাঁড়িয়ে। তোমরা জলদী সওয়ার হও।'

খালেদ ও আবদুল্লাহ্ সওয়ার হয়ে বাড়ির বাইরে বেরুলেন। নয়ীমও ধীরে ধীরে পা ফেলে গেলেন বাড়ির বাইরে।

নার্গিস বললেন, 'আপনি আরাম করুন। বিছানা ছেড়ে ওঠা আপনার ঠিক নয়।'

নয়ীম তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'নার্গিস! আমি ভালো আছি। তুমি চিন্তা করো না।'

বাগিচার বাইরে গিয়ে খালেদ ও আবদুল্লাহ 'খোদা হাফিয' বলে ঘোড়া ছুটালেন দ্রুতগতিতে। নয়ীম দূর পর্যন্ত তাঁদেরকে দেখবার জন্য চড়লেন বালুর টিবির উপর। নার্গিস ও উযরা তাঁকে মানা করলেন, কিন্তু নয়ীম পরোয়া করলেন না। তাই তাঁরাও টিবির উপর চড়লেন নয়ীমের সাথে। দুই তরুণ মুজাহিদ ঘোড়া ছুটিয়ে যতক্ষণ না মিলিয়ে গেলেন বহু দূর দিগন্তে, ততোক্ষণ নয়ীম সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁরা অদৃশ্য হয়ে গেলে তিনি যমিনের উপর বসে সিজদায় মাথা নত করলেন।

নয়ীমকে দীর্ঘসময় সেজদায় পড়ে থাকতে দেখে উযরা ঘাবড়ে গিয়ে কাছে এসে 'ভাই' বলে তাঁকে ডাকলেন ধরা গলায়, কিন্তু নয়ীম মাথা তুললেন না। নার্গিস ভয় পেয়ে

নয়ীমের বাযু ধরে নাড়া দিলেন। নয়ীমের দেহ নড়ছে না। নার্গিস তাঁর মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে অলক্ষ্যে বলে উঠলেন, 'আমার স্বামি! স্বামি আমার!!'

উযরা তাঁর নাড়ির উপর হাত রেখে আমিনাকে বললেন, 'বেটি' উনি বেহুঁশ হয়ে পড়েছেন। যাও জলদী পানি নিয়ে এসো।'

আমিনা ছুটে গিয়ে ঘর থেকে পিয়ালা ভরে পানি আনলো। উযরা নয়ীমের মুখে পানির ঝাপটা দিলেন। নয়ীমের হুঁশ হলে তিনি চোখ খুলে পিয়ালা মুখে নিলেন।

উযরা বললেন, 'হোসেন, যাও, বস্তি থেকে কয়েকটি লোক ডেকে আন। তারা ওঁকে ধরে ঘরে নিয়ে যাবে।'

নয়ীম বললেন, 'না, না, থাম। আমি নিজেই যেতে পারবো।'

নয়ীম উঠতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। বুকে হাত রেখে তিনি আবার শুয়ে পড়লেন।

'আমার স্বামি! আমার মালিক!!' নার্গিস চোখ মুছতে মুছতে বললেন। নয়ীম নার্গিসের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে উযরা, আমিনা ও হোসেনের দিকে তাকালেন। সবারই চোখে পানি ছলছল করছে। ক্ষীণস্বরে তিনি বললেন, 'হোসেন-বেটা, তোমার চোখে আঁসু দেখে বড়োই তক্‌লীফ হচ্ছে আমার। মুজাহিদের বেটা যমিনের উপর চোখের আঁসু ফেলে না, ফেলে বুকের রক্ত। নার্গিস, তুমিও সংযত হও। উযরা, দোয়া করো আমার জন্য।'

যিন্দেগীর তরণী মৃত্যুর তুফানের আঘাতে টলমল্ করছে। নয়ীম কলেমায়ে শাহাদাত পড়বার পর অস্পষ্ট আওয়াযে কয়েকটি কথা বলে নীরব হয়ে গেলেন চিরদিনের জন্য।

#########